মানবাত্মার সন্ধানে

বেদুইন

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

MANABATMAR SANDHANE

by

Bedouin

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯৫২

প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : তাপস সরকার

মুদ্রাকর : দিপালী নাহারায় : বাবা তারকনাথ প্রেস

১৪, নরেন সেন স্কোয়ার : কলিকাতা-৯

অন্তের ইঙ্গিত বহন করে আদি। মৃত্যু যেখানে অন্ত সেখানে জন্মটা আদি যা অন্তের ইঙ্গিত জন্মমাত্র জানিয়ে দেয়। পৃথিবীতে এই একটি-ই মাত্র ধ্রুব সত্য। এটাই এই জগতের স্বতঃসিদ্ধ ধর্ম। যার শুরু আছে তার শেষ আছে। শুরু থেকেই আমি শেষের সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছি। ভেবে দেখেছি আমারও চলার শেষ আছে। বড়ই মহানুভব ইংরেজ, বড়ই পক্ষপাতহীন, যখনই তার স্বার্থ বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখেছে তখনই আমাকে পথের ধুলায় ছেড়ে দিয়ে লিখে দিয়েছে সমগ্র বিশ্বের জমিদারী অথচ তার অনুবর্তীরা এক খানা ভাঙ্গা ঘরের জমিদারী দিতে পারেনি বিগত কয়েক দশকে। তাই চলারও শেষ হয়নি। মানুষের সঙ্গেই সমাপ্তির বন্ধন বোধহয় অচ্ছেদ্য। চলার শেষ হয়েও শেষ হতে চাইছে না, পথের হাতছানি অনুভব করছি অনবরত।

সামনে বিশাল ভারত মহাসাগর।

পান্থশালার দোতলার অলিন্দে বসে সমুদ্রের ঢেউ গুনছি। ভিক্টর হুগোর কথা মনে পড়ল। বিশাল এই সমুদ্র, দেখার যেন শেষ নেই, কিন্তু ভাববার চেয়ে দেখবার চোখ দুটো বড়ই অকৃপণ। অনেক দূরে সাগরের ঢেউগুলো যখন ভেঙ্গে পড়ছিল তখন তার শুভ্র ফেনিল জল যে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করছিল তা লিখে বোঝানো যায় না, বাক্যের সাধ্য কি তার রূপ বর্ণনা করা। মনে হচ্ছিল কয়েক হাজার রাজহংস মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আবার জলের মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সৌন্দর্যের স্রষ্টা যে মহাসাগর তার বুকেই তার বিলয় ঘটছে দর্শকদের মনে অনবদ্য আনন্দের তরঙ্গ তুলে।

আমার পথ পরিক্রমার শুরু সেই হিমালয়ের বুকে স্নিগ্ধ মনোহারী শহর সিমলা থেকে, সেই পরিক্রমা আজও শেষ হয়নি। তুমি চেয়েছিলে ঘর, ঘরণী হবার শাশ্বত প্রবল বাসনা তোমার, যা স্বাভাবিক নারী মাত্রেরই। সেদিনও ভেবেছি দুর্ভাগ্য যাদের ভাগ্য, তাদের পরিণতি ছন্নছাড়া এই জীবন ধারায় লোপ পাওয়া। বিড়ম্বিত ভাগ্যের সূত্রে নিজের ভাগ্য যোজনা করে ঘর চাওয়া অপরাধ। বিশেষ করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়। আমরা চির ঘরছাড়া, ঘরহারা, লক্ষ্মীছাড়া, আমাদের ঘর সে তো ইউটোপিয়ান এমন একটা চিন্তা যা বাস্তবে রূপ পাওয়া বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অসম্ভব। অন্তরের অন্তস্থলে ক্ষোভ থাকলেও আপশোষ নেই।

জান তো, ঈশ্বর বলেছিলেন 'Let there be man' অমনি তাঁর মিস্ত্রিরা লেগে পড়ল মানুষ তৈরি করতে, তৈরি শেষ হতেই স্রষ্টার চক্ষু চড়কগাছ। তিনি কেন যে বুঝলেন না, সৃষ্টির মাহাত্ম্য রক্ষা করতে মানুষের যেমন প্রয়োজন তেমনি মানুষেরও কিছু প্রয়োজন আছে নতুন সৃষ্টি করার। তাঁর সৃষ্টির অন্তরালে আরও সৃষ্টির উন্মাদনা নিয়ে মানুষ জন্মেছিল তাকে অস্বীকার

করতে গিয়েই সর্বনাশ ঘটালেন স্রষ্টা স্বয়ং। প্রয়োজনের তৌলদণ্ডে সৃষ্টির মহিমা তুলে দিয়েই তাঁর শুভ্রকেশদামে হর্ষণ দেখা দিল, তাঁর সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ দেখা দিল। স্রষ্টা বুঝলেন তাঁর সৃষ্টি অসম্পূর্ণ। অমনি আদেশ দিলেন 'Let there be Woman' নিশ্চয় আদম আর ইভের কাহিনী, সত্যাসত্য বিচার পরে হবে কিন্তু তাঁর সৃষ্টির নেশা ভয়ঙ্কর শাস্তি দিল এই দুই শ্রেণীকে। অসাম্য দেখা দিতেই বিধাতা গা ঢাকা দিলেন, আরম্ভ হল চুলোচুলি কিলোকিলি। নর-নারীর এই মাহাত্ম্য সারা বিশ্বেই কমবেশি ছড়িয়ে পড়ল। লজ্জায় বিধাতা নতুন সৃষ্টির কথা ভুলে গেলেন। বিধাতা তারস্বরে চিৎকার করে উঠল, অয়ম্ আরম্ভঃ (অ) শুভায় ভবতু। বলেই ছিন্ন বালাপোষ গায়ে দিয়ে স্রষ্টা শয়ন করলেন যোগনিদ্রায়। এরপর থেকে আর তাঁর অস্তিত্বের কথা শোনা যায় না, চির অদৃশ্য হলেন তিনি। যোগনিদ্রার উপকরণ সর্ষপ তেলের ঘাটতি থাকায় তাঁর নাসিকা গহ্বরে জং ধরে গেছে তাই তাঁর নাসিকা ধ্বনি আর শোনা যায় না।

মানুষ বাদে প্রকৃতির বুকে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে যুগ যুগান্ত থেকে তা অনিমেষ নয়নে অবলোকন করে অভাজনরা বিধাতাকে আজও বিস্মৃত হতে পারে নি। ডজন নয়, শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে তাঁর সৃষ্টজীবরা বসে বসে পুঁথি রচনা করছে, করেছে ও করবে। তারা গভীর ভাবে বিবেচনা করছে, পাত্রাধার তৈল অথবা তৈলাধার পাত্র, ওদিকে তেল গড়ালো অনেক দূরে, সমাধান আর হল না। স্রষ্টা মুখ না তুলেই আমেন আমেন ধ্বনি দিয়ে আবার নিশ্চুপ।

স্রষ্টার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট জীবের একাংশ কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর করুণালাভে সচেষ্ট আরেকদল মেরী নন্দনের ভজনার মাঝ দিয়ে চির শান্তিময় স্বর্গের পথের সন্ধান করছে, আর আমাদের মত হিন্দু, বৌদ্ধ অভাজনরা দর্শন ও প্রদর্শনের জাঁকজমকে তোলপাড় করছে, স্রষ্টা বোধহয় মুচকি হাসছেন। যখন তাঁর সৃষ্ট এই নরপুঙ্গব নরাধম তাঁকে ভুলে তাঁর সৃষ্টি ভুলে কখনো মিথ্যা আচার ব্যবস্থা কায়েম রাখতে পরস্পরের মস্তক ছেদন করছে এতে হাস্যোদ্রেগ বিনা আর কি হতে পারে। ঈশ্বরের সৃষ্টিকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে ঈশ্বরের নামে পশুবৃত্তিকে যারা প্রশ্রয় দেয়, দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতে দেবে তাদের জন্য কেউ অনুকম্পা বোধ করে না।

শুরু হয়েছিল তাণ্ডব।

সেই তাণ্ডবের সাক্ষী আজও আছে। ভুক্তভোগী কোটি মানব সন্তান।

সবাই বলল শান্তি চাই।

আমিও বলেছি, তুমিও বলেছ, আরও অনেকে বলেছে। কিন্তু শান্তি শব্দটাই ভয়ঙ্কর অশান্তির ইঙ্গিত। অশান্তির পশ্চাতে খুঁড়িয়ে চলে শান্তি। দেখেও দেখা যায় না। হায় ভগবান, শান্তির প্রথম বর্ণের সাক্ষাৎ পেলাম না আজও। বোধহয় ভয় পেয়ে সামনে আসছে না, এলে যুক্ত বর্ণটিতে জুড়ে দিতাম 'অ' কার দিয়ে। অবশেষে আমিও ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে চলতাম, শান্তি

তখন থাকত অনেক দূরে। আজ ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে ভাবছি, হায় রে, একটা একটা ক্র্যাচ্‌ও যদি থাকত তা হলে কিছুটা আরামে চলতে পারতাম। তা আর হল না।

স্রষ্টা যাদের সৃষ্টি করলেন তারা নিজেদের মধ্যে বনিবনা ঘটাতে পারল না।

কেন পারল না!

গুরুতর প্রশ্ন!

তুমি বললে Compromise কর।

বললাম, কার সঙ্গে?

যারা ওপরে বসে আছে।

হেসে বললাম ওকে Compromise বলে না ওকে Surrender বলে, যাকে বলে আত্মবিক্রয়। তা আমার সইবে না। জান তো, বড়র পিরিতি বালির বাঁধ, ধাক্কা সইবে না। ওটা সহ্য হবে না শ্রীমতী।

আজ অনেক কথা মনে পড়ছে। অতীত বর্তমান কেমন তালগোল পাকিয়ে দিচ্ছে!

সামনে ভারত মহাসাগর। মহাসাগরের বিরাট বিরাট ঢেউগুলো নান সৌন্দর্য সৃষ্টি করে। হুর-মুর করে ভেঙে পড়ছে একে অন্যের ঘাড়ে। আর শেষ ধাক্কাটা এসে দিচ্ছে বালির চড়ায়। এই মহামানবের সাগর তীরে। আমার মনে যে অতীতের তিক্ত মধুর স্মৃতিগুলো সাগরের ঢেউয়ের মত উথাল পাথাল করে আমাকে বিব্রত করছে, তারও শেষ কঠিন বাস্তবে, যা আমি উপলব্ধি করছি অনুক্ষণ।

আজ যেখানে বসে লিখতে বসেছি তা হল ভারতের শেষ ভূমি সীমানা। এর পর আর ভারতের ভূমিখণ্ড নেই মূল দেশের সঙ্গে। এটাই বোধহয় উপযুক্ত স্থান স্মৃতিচারণ করার।

একটু ভাবালু হয়ে পড়েছিলাম। যা বলছিলাম, তা আজ না বললে আর হয়ত বলা হবে না। রাত পেরিয়ে ভোরের আলো রোজই জানিয়ে দেয়, তোমার আয়ুর একটি দিন কমল, একদিন এগিয়ে চলেছ মৃত্যুর দিকে। তারপর নিঃশেষ। তাই যা বলার তা বলতে চেষ্টা করছি

সেদিন আমার কথা শুনে তুমি বলেছিলে, তা হলে এই কৃচ্ছ্রতা, আর কষ্ট সহ্য করব কি চিরকাল?

বললাম কালের শেষ আছে প্রেয়সী। ইংরেজ গেছে গোটা দেশের সমৃদ্ধি ঘটছে। এটাই ওরা বলে থাকে। কিন্তু কার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা ইংরেজের তাঁবেদার ছিল, যারা ইংরেজের সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে মস্তানি করেছে তারাই স্বচ্ছন্দে আছে, সুখে আছে। আর যারা দালালি না করে ইংরেজের খয়রাতি পেয়েছে কয়েদখানায় তারা বাইরের খোলা আকাশের তলায় আর কোন খয়রাতির দাবীদার হতে পারেনি। কেন পারেনি? যদি কিছু খয়রাতি পায় তাহলে এই সব ক্লিষ্ট লাঞ্ছিত অত্যাচারিত নরপুঙ্গবরা অকর্মণ্য হয়ে পড়বে। তাই

ইংরেজ সরকারের অনুগৃহীতরা সততার সঙ্গে ন্যায় সঙ্গত পথে চলছে। তাদের সদিচ্ছার কোন অভাব নেই, অভাব আমাদের যোগ্যতার। সেদিন ওরাই বলেছিল ছাত্রগণ, কিশোরগণ, যুবকগণ, দেশমাতৃকা উদ্ধার করতে দৌড়ে এস। দেশ স্বাধীন হলে কোন কিছুরই অভাব থাকবে না, বুকের রক্ত দাও, তোমাদের রক্তে লেখা হবে আগামী দিনের ভারতের ইতিহাস। তারপর?

লেখাপড়া ছেড়ে ছুটল দেশের জওয়ান-কিশোর-তরুণ-তরুণীরা।

কে মরল, কে কয়েদখানায় পচল, কে ঘরছাড়া হল, কে সর্বস্ব হারাল তার হিসাব আর লেখা হল না, কিন্তু ইংরেজ তল্পীতল্পা নিয়ে ফিরে যেতেই ইংরেজের অনুবর্তীরা বলল, তোমাদের কাজ পাওয়ার যোগ্যতা নেই। ইংরেজ যে সর্বনিম্ন .চাকরি. পাওয়ার মাপকাঠি দিয়ে গেছে উত্তরপুরুষদের, সে মাপ কাঠিতে তোমরা ন্যূন। তোমরা নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়ে তোল।

ওদের মত, আমার মত হাজার হাজার রাজনীতির বলি তখন পথে পথে হা-হুতাশ করতে থাকে, অভিশাপ দেয়। ইংরেজ যাদের ঘরছাড়া করেছিল তাদের কিছু সান্ত্বনা থাকলেও ইংরেজের উত্তরপুরুষ ধর্মের ভিত্তিতে আবার যাদের ঘরছাড়া করল তাদের আর কোন সান্ত্বনা রইল না। অতএব ধর্মের ভিত্তিতে দেশ খণ্ডিত হল। সেই ধর্ম রক্ষা কর। আসবে আসুক দুঃখ নব নব। নব দুঃখকে আপন করেই আমার মত ওরাও ছুটছে বাঁচার পথ খুঁজতে।

তুমি বললে, নতুন জীবিকার সন্ধান কর।

হেসে বলেছিলাম. ছিঁড়ে গেছে আমার বীণার তার। এখন যা বাজাবে তা হবে বেসুরো। মানুষের কাছে পরম জীবিকা দারিদ্র। সে জীবিকাচ্যুত হইনি। চিরকাল গাঁট ছড়া বেঁধে রইব এর সাথে। নতুন জীবিকার স্বপ্ন আমি দেখি না। এটা হতাশা সৃষ্ট মনোভাব নয়, ঘৃণার বহিপ্রকাশ।

আমার ক্ষমতা আর নেই এভাবে বলার।

আছে। জান শ্রীমতী বুর্জোয়া কাকে বলে। যারা অপরের উপার্জনের সিংহভাগ গ্রহণ করে অথচ নিজে পরিশ্রম করে না, শোষণ করে। ওরা বিনা মেহনতে বাস করে তাই বুর্জোয়া। ভারতের সব চেয়ে বড় বুর্জোয়া কারা জান, না না টাটা বিড়লা নয়। বড় বুর্জোয়া হল রাস্তার ভিখিরীরা। তারা অপরের উপার্জনে ভাগ বসায়, দিব্য বাস করে মেহনত না করে, ওদের কপালের ঘাম পায়ে ফেলতে হয় না। দারিদ্র আমাদের সঙ্গী তাই এখনও বুর্জোয়া হতে হয়নি, এটাই যথেষ্ট। ক্ষমতা তোমার আছে। তোমার ক্ষমতাই তো আমার মূলধন। ভিক্ষাপাত্র হাতে করে নয়।

ছাই।

রাগ কর না শ্রীমতী। তোমার ক্ষমতা অসীম, চোখ বুঁজবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এ ক্ষমতা অটুট রইবে। আমরা হলাম দুঃখ নামক অতিথি-শালার অতিথি। সামনে ঘটভর্তি ফুটন্ত জল, চাল এখনও সরকারী অথবা বেসরকারী গুদামে। ক্রয় মূল্য পকেটে নেই। তা অপরের পকেটে এবং প্রভুত।

আমরা দাবীদার নই। তাই ঘাটের জল বাষ্পীভূত হোক, আমাদের দেহ দ্রবীভূত হোক। আর দেহের শেষাংশ কারও করুণায় ভস্মীভূত হোক। তাতেও দুঃখ নেই। এস আমরা এতগুলো ভূতের সমাগমে নিশ্চিন্তে স্রষ্টার জয়গান করি। তার জন্য শূন্য উদরে মহাশূন্যের তলায় বিলুপ্তি ঘটুক তাতেও চিন্তা নেই। আমরা নিরানন্দকে আপন করে নেব।

গৃহিনী চোখ মুছলেন।

গৃহহীনের গৃহিনী। এ যেন সোনার পাথরের বাটি।

সারা জীবনটা যেন গিল্টিকরা, তাই চাকচিক্য অপরকে বাঁধায়।

ভুলের মাশুল অনেক দিয়েছি আরও হয়ত দিতে হবে কিন্তু এবার চলার পথে চোখ আমাকে ভুল করতে দেয়নি।

ট্রেন ছুটছিল বঙ্গোপাসাগরের কিনারা ধরে। বাঁ দিকে সমুদ্র, ডানে মূলভূমি।

কত শহর কত গ্রাম পেরিয়ে এলাম। কখন যে চিলকা পেরিয়ে এসেছি তা জানতেও পারিনি।

দেখলাম রাস্তার দু পাশে ঝুপড়ি আর ঝুপড়ি। সেই ঝুপড়িও বিশেষ কায়দায় তৈরি। সঙ্গী ভদ্রলোক বলল, আমরা তেলেগুদের রাজ্য দিয়ে চলেছি ডান পাশেই তেলেঙ্গানার বিশাল অঞ্চল। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বোধহয় ভারতের দরিদ্রতম নাগরিক। এরই একটি বিরাট অংশে থাকে আদিবাসী, ডান দিকের ওই অংশ ছিল নিজামরাজ্য, নিজামরাজ্য শাসন করত রাজাকররা। রাজাকরদের অত্যাচারে এরা পৌঁছে গিয়েছিল দারিদ্রের শেষ সীমায়। এমন কি যুবতী কন্যা ও স্ত্রী নিয়ে মর্যাদার সঙ্গে এরা বাস করতে পারত না।

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকাতেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বললেন, ইয়ে সাচ্।

কিন্তু!

কিন্তু নেই জনাব। আমিও নিজামরাজ্যের লোক ছিলাম। দেশ স্বাধীন হবার সঙ্গে সঙ্গে তেলেঙ্গানা বিদ্রোহের যে ঘটনা ঘটেছিল তা হল এই অঞ্চলের অধিবাসীদের কয়েক শতকের বঞ্চনা লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের পরিণতি।

এখন তো নিজামরাজ্য ভারতের অংশ। নিজামরাজ্য যুক্ত হয়ে নতুন রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশ গড়েছে। এখন তো এই সব অত্যাচারের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

না জনাব। বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটেনি। রাজাকররা নেই কিন্তু নিজামসৃষ্ট রাজাকর সমর্থিত জমির মালিকরা এখনও কায়েম রয়েছে। আগে রাজাকররা এদের সাহায্য করত এখন গণতন্ত্রী সরকারের পুলিশের ছাতার তলায় মাথা রেখে ওরা একই ভাবে শোষণ করে চলেছে। তাই এখানে আর শান্তি নেই।

ভদ্রলোক থামলেন।

আমার জিজ্ঞাস্য আর কিছুই ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না।

আমার মন তখন ছুটে গেছে অনেক পেছনে।

একদিন তোমাকে বলেছিলাম, ঘরের প্রয়োজন আমার ফুরিয়েছে। বেঁচে থাকার প্রয়োজন যে কতটা তাও আজও স্থির করতে পারি নি। তবে এইটুকু বুঝেছি, মৃত্যুকে ব্যঙ্গ করে আমাদের বাঁচার প্রয়োজন আছে। আমি আর তুমি এই বিশাল ভারতে কণিকা মাত্র। কোনদিন যদি আরও অনু ও পরমানুকে পাও তখন তাদের দিকে তাকিয়ে তোমার বঞ্চিত জীবনের দুঃখ আপনা থেকেই সোজাপথে ছুটবে। কুরবানী করা লাশ একপাশে গড়াচ্ছে, পাশে জিল্লুর রহমান চাকুতে শান দিচ্ছে, অপর পাশে ঘোঁতন টাঙ্গি হাতে নির্বিচারে নরহত্যায় এগিয়ে আসছে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতির দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনা লাভ করতে পার —তবুও আমরা বেঁচে আছি। জাত ও ধর্মকে রক্ষা করতে আমরা অভিশপ্ত হয়েছি।

চলতি পথে দেখার আর শেষ নেই। দেখতে হয় তাই দেখি, এটাই সান্ত্বনা, চক্ষু আছে তাই দেখি, কর্ণ আছে তাই শুনি, নাসিকা আছে তাই ঘ্রাণ নিতে হয়। নইলে যা দেখেছি যা শুনেছি, যার ঘ্রাণ পেয়েছি তার বেশি কিছুর প্রয়োজন নেই, এতেই মোক্ষলাভ ঘটতে চলেছে।

চলার পথে দূরকে আপন করে নেবার কেমন একটা নেশা জাগে তবে তার স্থায়িত্ব খুব বেশি নয়।

বর্তমান আমাকে আচ্ছন্ন করে না কিন্তু অতীত আমাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে। সেদিনও রামেশ্বরমের সমুদ্র তীরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকিয়ে দেখছিলাম কয়েক মাইল দূরেই সিংহল। বর্তমানের শ্রীলঙ্কা। সিংহলের তীরবর্তী গাছপালা ঝাপসা ঝাপসা, দেখতে দেখতে মনে পড়ছিল কত উপকথা। কোন এক কালে বাংলার বীর বিজয় সিংহ এই দ্বীপ জয় করে রাজ্য স্থাপন করে রামায়ণ বর্ণিত লঙ্কা দেশের নাম রেখেছিল সিংহল। সে যুগের কোন ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে কিনা তা জানি না, রামায়ণে কথিত রাবন রাজা ওখানে রাজত্ব করতেন কি-না তাও বলা সুকঠিন। তবে মহামতি অশোক তাঁর পুত্র ও কন্যাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য এই দ্বীপরাজ্যে পাঠিয়েছিলেন এর প্রমান আছে, আর আছে সিংহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রতিষ্ঠা। সামনে ছায়া ঢাকা সেই সিংহল, বর্তমানের শ্রীলঙ্কা।

শোনা যায় রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় তাঁর নবরত্নের এক রত্ন বারহের পুত্রবধূ খনা ছিলেন এই রাজ্যেরই মেয়ে। কিম্বদন্তী হল, বরাহ তাঁর পুত্র মিহিরকে জন্মমাত্র সাগর জলে ভাসিয়ে দেন। সেই পুত্র মিহির লঙ্কায় বড় হয়েছিলেন। তিনি জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শী হন যৌবনে। খনাকে বিয়ে করে ফিরে আসেন স্বদেশে।

ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর দেশ সিংহলকে দূর থেকে দেখতে পেয়ে কেমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। সমুদ্রের কিনারায় বসে স্বপ্নের জগতে বিচরণ করতে থাকি, আমার ধ্যান ভঙ্গ হল একজন মুণ্ডিতমস্তক ব্রাহ্মণের ডাকে। তামিল ব্রাহ্মণ আমার বেশভূষায় বুঝেছিল আমি তার স্বদেশী নয়। আমাকে ভাঙা

ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কি দেবাদিদেব রামেশ্বরকে দেখবে না ?

আমি কোন উত্তর না দিয়ে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে অপলকে চেয়ে দেখছিলাম। আমার বক্তব্য আমার চাহনিতে স্পষ্ট হলেও ব্রাহ্মণপুঙ্গব আমাকে বুঝতে ভুল করেনি, বলল, রামেশ্বরমের মন্দির অলিন্দ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব-বৃহৎ, সেটাই দেখবে এস।

রামেশ্বরম একটি ছোট দ্বীপ।

ভারতের সঙ্গে অতীতে যুক্ত ছিল নৌকা যোগে। জলযানে চেপেই এসেছিল তামিল উপনিবেশকরা।-

ইংরেজ সরকার সমুদ্রের মাঝ দিয়ে রেলের সেতু নির্মান করে মূল ভূ-খণ্ডের সঙ্গে রামেশ্বরমকে যুক্ত করেছিল। সেই সেতু পেরিয়েই আসতে হয়েছে।

এও অপূর্ব অভিজ্ঞতা। গোটা ভারতের অন্য কোথাও সমুদ্রের বুকে এত বড় রেল সেতু নেই।

সমুদ্রের বুকের ওপর দিয়ে যখন রেল গাড়ি চলছিল তখন জোর বাতাসের সঙ্গে সমুদ্রের জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছিল গাড়ির ওপর। যাত্রীদের অনবরত পরিচ্ছদ ভিজে যাচ্ছিল। তবু আনন্দের উচ্ছ্বাসে এই সামান্য অসুবিধা কেউ গ্রাহ্য করছিল না। আমি জানালার ধারে বসে দেখছিলাম, এই দেখার যেন শেষ নেই। ঢেউ আর ঢেউ, ফেনিল শুভ্র তার রূপ।

ব্রাহ্মণপুঙ্গবের আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারিনি।

পথে যখন সমুদ্রের মাঝ দিয়ে রেলসেতু পেরিয়ে আসছিলাম তখন নানা চিন্তা মাথায় জট পাকাচ্ছিল, সেই রকম নানা চিন্তা ও বিস্ময় রামেশ্বরমের মন্দির অলিন্দে দাঁড়িয়ে আমাকে বাস্তববোধের বাহিরে নিয়ে যেতে যেন সাহায্য করেছিল।

সমুদ্রের ঢেউয়ের ঝাপটা দেখে ভাবছিলাম বৃটিশ প্রযুক্তিবিদদের শ্রেষ্ঠত্ব। এই শ্রেষ্ঠত্বই তাদের এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল উত্তাল সমুদ্রের বুকে এই সেতু বন্ধন করতে। তার চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার যে ভারতীয় প্রযুক্তিবিদরা তা মনে মনে উপলব্ধি করলাম রামেশ্বরম মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। সম্মুখে বিশাল সমুদ্র, উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম জলঘেরা একটা দ্বীপে এই মন্দির। মুসলমান আক্রমণের বহুকাল আগেই দক্ষিণী রাজারা এই মন্দির নির্মান করিয়েছিলেন বেলে পাথরে অথচ এই দ্বীপের আশে পাশে কোথাও কোন পাহাড় পর্বত নেই। সেকালে ছিল না সমুদ্রগামী বিরাট জাহাজের আনাগোনা অথচ এই প্রস্তরস্তূপ মূল ভূখণ্ড থেকে আনতে হয়েছে কারিকরদের। সেই সব বিশাল পাথর কেটে তাকে নানা মনোহারী সজ্জায় খোদিত করে পাথরের ওপর পাথর সাজিয়ে কেবল মাত্র মন্দির নির্মান করেনি, তারা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অলিন্দ নির্মান করে আজও বিশ্ববাসীর চোখে বিস্ময়কর সৃষ্টি বলে পরিচিত করেছে।

দেখছিলাম, দেখার কেন শেষ নেই তবে সময় অতি সংক্ষিপ্ত। রামেশ্বরম থেকে শেষ গাড়িটা ছাড়বে দ্বিপ্রহরে অতএব ভাবালু মনটাকে লাগাম দিয়ে

আহার শেষ করে গাড়িতে ওঠার তাগিদে ছুটে গেলাম স্টেশনে। ছোট লাইনের গাড়ি। বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তখনও ধূম উদগীরণ করছিল, যাত্রার সঙ্কেত তখনও পায় নি।

আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, সেই ব্রাহ্মণপুঙ্গব আমার গাড়ির এক কোণায় স্থান করে নিয়েছেন। আমাকে দেখে মিটি মিটি হাসছিলেন। এগিয়ে গেলাম তাঁর কাছে।

সহাস্যে বললেন, মন্দির দর্শন হল!

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি প্রশ্ন করলাম, আপনিও কি মন্দির দর্শন করতে এসেছিলেন?

আবার হাসি মুখে বললেন, মন্দির দর্শন পনর বছর আগেই শেষ করেছি। এখন আসি দেব দর্শনে। প্রতি মাসের অমাবস্যা তিথিতে আসি দেবাদিদেবের করুণা ভিক্ষা করতে। আপনি বোধহয় জানেন, এই মন্দিরের নির্মাতা হলেন স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্র। তিনি লঙ্কা জয় করে এসে স্থাপন করেছিলেন এই মন্দির। দেবাদিদেব পশুপতিনাথের মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। ক' হাজার বৎসর আগে তার হিসাব করা যায় নি।

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে শুনছিলাম। কত উদ্ভট গল্প কত সময় মানুষ দেবতার মাহাত্ম্যকে প্রচার করতে সৃষ্টি করে তার ইয়ত্তা নেই। রামচন্দ্র ও লঙ্কা জয় এসবের ঐতিহাসিক মূল্য কতটা তা আজও জানা যায় নি। রামচন্দ্র নামে কোন রাজা অযোধ্যার সিংহাসনে বসে দেশ শাসন করেছিলেন, এটা তবুও সহ্য করা যায় কিন্তু তিনি উত্তরভারতের অযোধ্যা থেকে পিতৃসত্য পালনের জন্য নাসিকের গোদাবরী তীরে বনবাসী ছিলেন এটা যতটা সম্ভব তা কোন ক্রমে মেনে নিলেও তিনি যে ভারতের শেষ প্রান্তে এসে সীতা উদ্ধারের জন্য সেতু বন্ধন করে লঙ্কায় গিয়ে যুদ্ধ করে সীতাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন, এটা কতটা যুক্তিসহ তা বলা কঠিন। যুদ্ধ জয় করে শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রামেশ্বরমে তা স্বীকার করলে কয়েক হাজার বছর পর সেই মন্দির এমন অটুট থাকা সম্ভব কি? ইতিহাসবিদরা খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীকেই এই মন্দির স্থাপনের কাল বলে চিহ্নিত করেছেন। তাই সেই ভদ্রলোকের বক্তব্য কৌতুক সৃষ্টি করলেও মনের মনিকোঠায় কোন স্থান করতে পারি নি। আজও এমন গল্প কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

দেবতার মহত্ত্ব প্রচার করতে করতে বোধহয় ক্লান্ত হয়ে ভদ্রলোক থেমেছিলেন অথবা ধর্মের মাহাত্ম্য কতটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তাই জানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। হঠাৎ আমার মুখের দিকে কঠিন দৃষ্টিপাত করে উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার খাওয়া-দাওয়া হয়েছে কি?

বললাম, হ্যাঁ।

কোথায় খেলেন?

স্টেশনে আসার পথে একটা হোটেল দেখে সেখানে খেয়েছিলাম।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, ওসব চুলিয়াদের হোটেল, ওরা সব ছোট জাত। হায় হায় কি করেছেন!

আমি হেসে বললাম, জাত ভক্ষণ করিনি। স্বাদম সম্বরম খেয়েছি।

ভদ্রলোক কেমন হয়ে গেলেন, আমার কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করতে থাকেন।

চুলিয়ারা তামিল মুসলমান। খুবই কৌতুক বোধ করছিলাম।

এমন ঘটনা এই মহাভারতে হামেশাই দেখতে পাই। অনেকেই দুঃখিত হলেও আমি কৌতুক অনুভব করি, কখনও কখনও এ নিয়ে হাস্য পরিহাসও করে থাকি। তবে অনেকদিনের পুরনো কথা মনে পড়ল।

পথের হাতছানিতে দিন কাটছিল ভালোই। স্থিরতা না থাকলেও অস্থিরতার অভাব কখনও ঘটেনি। অস্থিরকে স্থির করার মহান ব্রত গ্রহণ করতে হাতছানি দিয়েছিল আরজু বিবি।

বিবি খুব দিলদরিয়া লোক। বিগত স্বামীর সাতাত্তর বিঘা জমি আর করগেট টিনে ছাওয়া দু'খানা বড় বড় ঘর। একা আর তার মন বসছিল না। সাতান্ন বিঘার ফসল। আহার্যের অভাব নেই, তবে নেই তার কোন সন্তান। চলার পথে পার্টনার চাই। সেই আদিম জিজ্ঞাসা, আদিম প্রয়োজন, যে দিন থেকে ব্যক্তিগত সম্পদের চিন্তা সমাজ দেহে প্রবেশ করেছিল সেদিন থেকে এই অদম্য প্রয়োজনটা নর-নারী উভয়কেই জোট বাঁধার পথ দিয়েছে। একজন অপরজনের সম্পদ ও সম্পত্তি। আরজু বিবি কোন ব্যতিক্রম নয়। পার্টনারের জন্য কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়নি। চাইবার আগেই ক্যানডিডেট ডজন খানেক। বিবি ভজনা করতে তারা উঠে পড়ে লেগেছে, কার ওপর নেক নজর পড়ে তারই অপেক্ষা।

এমন সময় আমার সঙ্গে পরিচয়।

নিকট প্রতিবেশি না হলেও দূর প্রতিবেশি এমন একজনের গৃহে আমি অতিথি। আমার হোস্ট মোটামুটি অগ্রিম কিছু জানিয়ে বলেছিলেন, হুঁশিয়ার।

হোস্ট নিয়ামতের আমন্ত্রণে ভঙ্গ বঙ্গের অপর অংশে যেতে হয়েছিল।

পাশেই মরহুম খোদাবক্সের বাড়ি। তার এন্তেকালের অনেক পরে এসেছি। আরজু বিবির ইদ্দত কাল পেরিয়ে যেতেই প্রার্থীরা বেশ সজাগ হয়ে পড়েছে। কিন্তু বিবি "হ্যাঁ" বলেনি এখনও।

ভাবলাম, আরজু মৃত পতির শোকে মুহ্যমান।

সাংসারিক কোন কাজে অথবা সহায়-সম্পত্তির হেপাজত করার পরামর্শ করতে এসেছিল আরজুবিবি নিয়ামত শেখের বাড়ি। আমিও নিয়ামতের অতিথি। বলা যায় নিজের দেশে পরবাসী হয়ে আমন্ত্রিত অতিথি।

আমাকে ঘরে শুয়ে থাকতে দেখে আরজু দরজায় দাঁড়িয়ে গেল।

আমি তো নিয়ামত নই তাই রিটার্ণ জার্নি।

দেখা হল চোখে চোখে। কথা হল না। এরকম দেখাকে দেখা বলা যায় না।

পঁচিশ তিরিশ বছরের পূর্ণাঙ্গ একটি যুবতী। মাথায় সামান্য ঘোমটা টানা তবে চাহনিতে মনে হল চটুলতা ফেটে পড়ছে।

নিয়ামতের বিবির কাছে বসে পরের দিন হাপুস নয়নে কাঁদছিল আরজু-বিবি। আমাকে ইশারায় ডেকে নিল নছিরণ বিবি, নিয়ামতের স্ত্রী।

গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে যেতেই আরজুর গলার শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। আঁচলে চোখ মুছে পাথরের মত শক্ত হয়ে বসে রইল।

নছিরণ আমার দিকে মুখ করে বসল, আমার সই আরজু। আড়াই মাস আগে এর স্বামী খোদাবক্সের এন্তেকাল হয়েছে। আমার সই একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে ভাইজান।

অতীত কালের বেসুরো একঘেয়ে প্রবোধ বাক্য শুনিয়ে বললাম, আত্মহারা হয়ে কোন লাভ নেই বুবু। হায়াত, বরাত আর মৌত খোদার ফজল। কেঁদে কেঁদে নিজের দেহটাকে যন্ত্রণা দিয়ে কি হবে।

লাভ যে কিছু নেই তা আরজুবিবি যেমন বুঝত তেমনি ভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দিতে মোটে ত্রুটি করেনি।

খবরটা নছিরণই দিয়েছিল।

আরজুবিবির নিকাহ আর ক'দিন বাদেই।

বললাম সে, কি! তিনমাস তো পেরোয়নি।

নছিরণ বলল, সেটা পুষিয়ে যাবে। আরজু একা থাকতে পারে না ভাইজান। অনেক খদ্দের, এক মালদার বেছে নিয়েছে। খদ্দেরও কম সেয়ানা নয়! নিকার পর আরজুর মৃত পতির সহায় সম্পতিগুলো নিজের নামে করে নেবার ফন্দীতে আছে। তারপর মোহর মিটিয়ে তালাক। মানে রাজকন্যা ঘুঁটে কুড়োবে আর ছ'মাসের দালাল হবে বাদশা।

আমি অবিশ্বাসের সঙ্গে বললাম, তা-কি সম্ভব!

আমার দুর্বল প্রতিবাদকে সম্মতির লক্ষণ মনে করে নছিরণ হেসে বলেছিল, তোমার কথা আরও বলছিল। ওর খুব পছন্দ।

সর্বনাশ!

কি ভাবছ ভাইজান?

ভাবছি আরজুর ওপর আল্লার রহম বর্ষিত হোক। আমাকে শ্রী শ্রী ভগবান রক্ষা করুন।

নছিরণ ব্যঙ্গ করে বলল, তুমি একটা নির্মদা। এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। ঘটকালি আমার।

নছিরণের বক্তব্য শেষ হবার আগেই দরজা ঠেলে ঢুকল আরজুবিবি।

আজ তার সাজগোজ অন্য রকম। কাঁচপোকার টিপটা কপালে জ্বল জ্বল

করছে। লাল রং-এর ব্লাউজ গায়ে। শাড়িটা বেশ জড়িয়ে পরণে, রং তার বেগুনী।

কি খবর রে আরজু ?

না, কিছু না। তোর কাছে এলাম দাওয়াত দিতে।

কিসের দাওয়াত ?

এমনি। যাবি তোর মিঞাকে নিয়ে আজ সাঁঝে। তোর মেহমানকেও নিয়ে যাস।

হাত জোড় করে বললাম, একটা আর্জি আছে আরজুবিবি।

বলুন।

দাওয়াত কবুল করতে এই বান্দা অপারগ।

কেন ? ধর্ম নষ্ট হবে, জাত যাবে ?

হেসে বললাম, বিবিসাহেব বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরটা নিশ্চয় পড়েছেন। না পড়লেও কিছু আসে যায় না। জাত আর ধর্ম যাওয়া সহজ কথা নয়। আমার কোন জাতধর্ম নেই আমি একজন ভারতবাসী তারপর একজন পাকাপোক্ত বাঙালী, সবার শেষে বেকার যাযাবর। আমার জাত মারে কে, আমার ধর্ম নষ্ট করে কে! এমন লোক দুনিয়াতে আজও পয়দা হয় নি। শুনলাম আপনার শুভ দ্বিতীয় বিবাহ, আজই বুঝি কলমা পড়া হবে, তাই বুঝি নেমন্তন্ন।

হতেও পারে। দুলহার তালাসে আছি। জুটেও যেতে পারে।

কিন্তু!

কিন্তু নেই। শরীয়ত!

বুঝতে না পেরে বললাম, মানে ?

আল্লা মেহেরবান। যা কিছু ঘটে আল্লার ইচ্ছায়। আজ যে বাদশা কাল সে ফকির হয় সেই আল্লার রহমে। এটা আপনাদের শরীয়তে না থাকলেও আমাদের শরীয়তে আছে। আমি একা মেয়েমানুষ। অনেক সম্পত্তি, একা অভিভাবক বিনা বাস করতে পারব কি ইজ্জত নিয়ে। তার চেয়ে ঘরসংসার করা কি ভাল নয় ?

অবশ্যই ভাল। কিন্তু কাল সকালেই আমাকে নদী পেরিয়ে ওপারের শহরে যেতে হবে। তাই আজ রাতের নেমন্তন্ন গ্রহণ করতে পারছি না।

কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালাম।

তারপরই পলায়ন বিধেয়।

যাবার সময় আরজুবিবির সামনে দাঁড়িয়ে আদাব জানিয়েছিলাম।

বিকেল বেলায় নছিরুণ জিজ্ঞেস করেছিল, জমাতে পারলে না ভাইজান।

বললাম, ওটাও খোদার ইচ্ছা।

তা নয়, তুমি হালে পানি পেলে না।

হয়ত তাই।

কিন্তু নছিরণের জুলুমে আমাকে যেতে হল আরজুবিবির বিবাহ উৎসবে। সে এক বিরাট ব্যাপার।

উঠোনে বড় বড় ডেকচিতে কালো কলাইয়ের ডাল আর সুস্বাদু লাউয়ের সঙ্গে পেঁয়াজ রসুন দিয়ে খিঁচুড়ি রান্না হচ্ছে। একপাশে একটা কুরবানী করা বকরির লাশ পড়ে আছে। অচিরেই তার সদগতি হবে। পাশে জিল্লুর রহমান চাকুতে শান দিচ্ছে। দৃশ্যটা উপভোগ্য, গুটি গুটি পায়ে ভেতরে বাড়িতে ঢুকতেই দেখি কাজি, মওলবী, উকিল আর তাদের অনুচরে ঘরভর্তি। বারান্দায় একটা শাড়ির পর্দা।

সামনের চাটাইতে বসলাম।

পর্দার ওপারে আরজুবিবি। এপারে উঠানে বরযাত্রী আর বর ও তার ধর্মীয় পরামর্শদাতারা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই কতকগুলো মশাল জ্বালানো হল।

এইবার বিয়ের পর্ব।

এপার থেকে প্রশ্ন করা হল, অমুকের ছেলে অমুকের সঙ্গে এত টাকা মোহরে তুমি দুলহান, নিকাতে রাজি?

ওপার থেকে ক্ষীণকণ্ঠে জবাব এল, রাজি।

নিকা কবুল?

তিনবার উভয় পক্ষ কবুল করল। নিকাহ অর্থ বিবাহ। আমরা মনে করতাম দ্বিতীয় বিবাহ, তা নয়। সব বিয়েই নিকাহ।

ওপার থেকে যার গলায় করুণ শব্দ বার বার শুনতে পেলাম তাতে মনে হল ওটা নছিরণের গলা।

কাজিসাহেবের খাতায় চোখ রেখে চমকে উঠলাম। দুলহার বয়স তেইশ আর দুলহানের বয়স আঠাশ। আমার কাছে কেমন বেখাপ্পা মনে হল।

বাড়িতে গিয়ে নছিরণকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তো বার বার কবুল করলে ভাবী। আরজুর গলা শোনা গেল না।

নছিরণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার ঠাকুরদা ছিলেন বামুন, বাবা মুসলমান হলেন, কারণ আর বুঝিয়ে বলব না। সবাই তাকে বলত বামুন মওলবী। বড় হয়ে বুঝলাম, আমাদের সমাজে মেয়েদের স্থান কোথায়। প্রতিবাদ করতে সোচ্চার হতে পারিনে তবুও নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি, ভেবেছি মুসলমান মেয়েদের বিয়েতে মেয়েদের তো সম্মতি নিতে হয়, তালাক দিলে মোহর বুঝিয়ে দিতে হয়।

তাতে লাভ কি? আরজুর সম্মতি তো চিরকাল নছিরণরাই দিয়ে থাকে। পাত্রীরা কি নিজের কথা বলার সুযোগ পায়?

কন্যা নাবালিকা হলে অভিভাবক সম্মতি দেয়। সাবালিকাদের স্বাধীন ভাবে স্বামী নির্বাচনের অধিকার আছে। তোমাদের তা থাকলেও সেটা সীমাবদ্ধ স্বয়ংবরার জমানা আছে কি?

চুপ করে গেলাম। যা জানি না তা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক।

কাজিসাহেব তার বাঁধানো খাতা বের করে লিখতে বসেছিল বিয়ের খতিয়ান। বিবিসাহেবার টিপ নিল। পাত্র ওসমান বিন্ কালিমুদ্দিন হাত জোড় করে দোয়া মাংলো খোদার দরবারে। বিবিসাহেবার বাঁ হাতটা দেখা গিয়েছিল পর্দার ফাঁক দিয়ে, চেহারাটা দেখতে পাই নি আজ। কাজিসাহেব সরকারী খাতায় সব কিছু লিখে দাড়িতে হাত বুলিয়ে বিসামিল্লা স্মরণ করে বলল, ছিলাম ভাল ইংরেজের জমানায়। আজাদী বড়ই মুসিবৎ আমদানী করেছে। তবে পাকিস্তানের নয়া কানুন এবার ইসলাম আর শরীয়তকে রক্ষা করবে, খাঁটি মুসলমান গিজ্ গিজ্ করবে পাকদুনিয়াতে।

আমার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে, আপনাকে তো চিনলাম না।

নছিরণ মাথার ঘোমটা-টা টেনে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমার মেহমান। মিঞার ছোটবেলার দোস্ত। এতদিন হিন্দুস্তানেই ছিল, কদিন হল এসেছে।

ভাল, ভাল। বিয়ে দেখতে এসেছেন। ভাল, ভাল। বিবিজান, পাত্রীর বয়সটা লেখা হয়নি।

তা হবে এককুড়ি দশের মত।

আর পাত্রের।

তা হবে এক কুড়ি তিন চার।

ধুৎ বলেই কাজিসাহেব কলম চালালেন, পাত্রের বয়সটা হল পাত্রীর আর পাত্রীর বয়স পাত্রের বয়স। কলমের একটানে সব কিছু মিটিয়ে দিয়ে কাজিসাহেব বলল, ফি এক দিনার।

এক দিনার, মানে একটি সোনার মোহর।

আমার মাথা খারাপ হবার উপক্রম।

ইংরেজ আমলের পাঁচটা রুপোর টাকা এগিয়ে দিয়ে বরপক্ষ বলল, এখন তো মোহর দিনার পাওয়া যায় না, তার মূল্য ধরে দিলাম।

উঁহু। আরও পাঁচ চাই।

এবার জিন্না ছাপের পাঁচ টাকার নোট এগিয়ে দিল।

আধ ঘণ্টার মধ্যে বিবাহ পর্ব শেষ।

বরপক্ষ আর কন্যাপক্ষ কলাপাতা হাতে করে ছুটল জিয়াপত খেতে।

নছিরণ চুপে আমার হাত ধরে বলল, ভাইজান, ভোজন পর্ব শেষ করতে চাও কি?

অবশ্যই।

দলের মধ্যে বসে পড়লাম একটা খবরের কাগজ পেতে।

নছিরণ বলল অতি মৃদু স্বরে, তোমার জাত যাবে না?

হেসে বললাম, আমার তো কোন জাত নেই, ধর্ম নেই। আমি যে মনুষ্য পরিবারে জন্ম নিয়েছি এটাই আমার পরিচয়। এই পরিচয় নিয়ে আমি বাঁচতে

চাই বিবিসাহেবা।

সে দিনের সেই বিবাহের ছবি আজও আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে।

আমার পাশের ব্রাহ্মণপুঙ্গব যখন আমার পাশ থেকে সরে বসল তখন মনে হল কত করুণার পাত্র এই সব মনুষ্য নামধারী ঈশ্বর সৃষ্ট জীব। যারা নিজেকেই ভালবাসে কখনও অপরকে ভালবাসতে শেখেনি এদের স্রষ্টা কখনও এদের ক্ষমা করবেন কি ?

সেদিনের আরজুবিবির বিয়ের কথা ভাবছিলাম রামেশ্বরম মাদ্রাজ এক্সপ্রেসের কামরায় বসে। সন্ধ্যায় অন্ধকার নামার আগে আমার সেই পথের সাথী উগ্র ব্রাহ্মণ সন্তান উসখুস করছিল তাঁর গন্তব্যস্থলে নামার জন্য। গাড়ি থামতেই তার সবকিছু নিয়ে নেমে পড়ল পরের স্টেশনে। আমার দিকে তাকিয়েও দেখল না।

রাত বাড়তে থাকে।

বাঙ্কে বিছানা করে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম আসছিল না। এপাশ ওপাশ করছিলাম। মন চলে গিয়েছিল পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের সেই সমৃদ্ধিপূর্ণ পল্লীতে যেখানে আরজুর বিয়ের আসরে শোভা বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

নিয়ামত সে রাতে আমার পাশে বসে বসে আরজুর বিষয় আলোচনা করতে করতে বলল, এর শেষ কোথায় বলতে পারিস ভাই ?

বললাম, স্বয়ং ভগবানও তা বলতে পারবেন না। দেশটা ভাগ করা হল ধর্মের ভিত্তিতে। ধর্ম এতে কতটা উপকৃত হয়েছে জানি না, তবে অধর্মটা কায়েমীভাবে শেকড় গেড়ে বসল দুই দেশে। ঘৃণা অবিশ্বাস আর তাণ্ডব স্থান করে নিল একটা সুখী ঐশ্বর্যশালী অখণ্ড ভারতের বুকে। এতে মাঝে মাঝেই রক্তপাত, সম্পদহানি যেমন ঘটবে তেমনি ধর্মের ধুয়া তুলে অনেক মূর্খ তাদের কালোহাত বিছিয়ে দেবে। এ থেকে মুক্তি নেই।

আবার সংযুক্ত ভারত হতে পারে কি না ?

পারে, যদি কোন বিদেশী শক্তি উভয় রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীলদের নির্মূল করতে পারে, তাহলে তারাই সাময়িক ভাবে অখণ্ড ভারত গড়বে। তবে তার আয়ু কতটা তা বলা কঠিন। আরও আয়ের কারণ হল আঞ্চলিকতাবাদ যা ধীরে ধীরে অথচ সুদৃঢ় ভাবে পা ফেলছে, এরই পায়ের শব্দ তুই কি শুনতে পাচ্ছিস না।

নিয়ামত বলল, আর নয়। এবার শুয়ে পড়।

শুয়ে পড়লেও ঘুমোতে পারিনি।

সকাল না হতেই বাইরের গোলমালে দুজনেই উঠে বসলাম।

নিয়ামত বলল, গোলমালটা যেন আরজুর বাড়িতে হচ্ছে। দেখতে হচ্ছে। শেষে আরজুকে কেউ ছিনিয়ে নিতে আসেনি তো। আরজুর অনেক ক্যান্ডিডেট, হতাশায় তাকে ছিনিয়ে নিতে আসতেও পারে।

নিয়ামত যে আশঙ্কার কথা বলল তাতে শুয়ে থাকার চেয়ে অকুস্থলে লগুড় হস্তে যাওয়াই বিধেয়, দুজনেই লাঠি হাতে করে বেরিয়ে পড়লাম।

আরজুর বাড়ির সামনে ততক্ষণে বেশ ভিড় জমেছে। আকাশটায় সবে লাল রং ধরেছে।

ওসমান আর আরজু একদিকে অপর দিকে তাদের প্রতিপক্ষ তিন মিঞা।

শুনলাম।

কাল রাতে ওরা আমেজ করে ঘরের কপাট বন্ধ করেছিল।

সকালে আরজুবিবি খুশ মেজাজে বের হয়েছিল। ওসমান তখন রাতের সুখের আমেজ কাটিয়ে উঠতে পারে নি।

প্রতিপক্ষ তিন মিঞা বলল, ট্যাক্স নিকালো।

গোলমাল শুনে ওসমান বাইরে এসেই ট্যাক্সের কথা শুনে হতভম্ব। কেন ট্যাক্স, কিসের ট্যাক্স, নানা প্রশ্ন উঠল তার মনে কিন্তু তার যে কিছু করার আছে তা ভুলেই গিয়েছিল।

ওসমান ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কিসের ট্যাক্সো?

ওসমানের কথা শেষ না হতেই তিন মিঞা ধমকে উঠল, ট্যাক্সো নিকালো।

কিসের ট্যাক্সো?

বিবির ট্যাক্সো। তোমার এক বিবি বহাল থাকতে থাকতে আরেক বিবি করেছ। হুকমতের কানুনের খেলাপ, তাই দিতে হবে ট্যাক্সো। বুঝলে মিঞা, কর সাদি দুসরা, তিসরা, চোথী। সাদি জায়েজ কিন্তু একটা থাকতে আরেকটা বিয়ে করলেই ট্যাক্সো দিতে হয় তা বুঝি জান না? বিবি বাড়লেই ট্যাক্সো লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠে।

এমন কথা তো শুনিনি।

খাঁটি মুসলমান তুমি। খারিজি নও। টাকা নিকালো। হিসাবে যা হবে তার দুগনো দিতে হবে, আধাআধি খবর। সরকারী ট্রেজারিতে আধা সরকারের খাদেমদের আধা। নইলে হাকিম, পুলিশ, পেয়াদা তোমাকে নাজেহাল হতে হবে মিঞা।

রাতের নেশা ছুটে গেল ওসমান বিন কলিমুদ্দিনের। সামনে পেছনে তাকাতে থাকে যদি কোন মদতদার পাওয়া যায়।

ভেতর থেকে সব শুনেছিল আরজুবিবি। ঘোমটা টেনে ছুটে এল উদ্ধার করতে।

এসেই বলল, দেব না একটা পয়সা।

তিন মিঞা হেসে বলল, নারাজ কেন হও বিবিজান। কানুন খেলাপ হতে পারে না। তুমি তো দুসরী বিবি, ওসমানও তোমার দুসরা স্বামী।

আরজু চোখ পাকিয়ে বলল, তাতে তোমার কি ? খোদাবক্স কবরে শুয়ে রোজ কিয়ামতের দিন গুনছে। আমার বিয়ে করার হক আছে শরীয়ত মতে।

আর ওসমান ?

তার বিয়ে হয়েছিল ইংরেজের জমানায়। তার বউ পালিয়েছে, বিয়ে বাতিল। কিন্তু মিঞা সাহেবরা ট্যাক্সো দেবার কানুন কোথাও নেই, হিন্দুস্তানে এসব জুলুমবাজি চলে না।

তিন মিঞা এক সাথে বলল, সেখানেই যাও বিবিসাহেবা। সেখানে হিন্দু খসম মিলবে। পাক জমানায় বে-কানুনী কিছুই করতে পারবে না।

আরজুবিবিধমকে উঠল।

তোদের কানুন আমি মানি না। হট, হট। এক কানা কড়িও দেব না।

অনেক মাতববর তখন জমায়েত। আরজুবিবির তেজ দেখে তারাও হকচকিয়ে গেল।

নিয়ামত আমার হাত ধরে পাশে ডেকে নিয়ে বলল, মেয়েটার তেজ আছে, চল, আর দেখতে হবে না। ওরাই মীমাংসা করে নেবে।

ট্রেনের বাঙ্কে শুয়ে শুয়ে পুরানো দিনের আরজু আর ওসমানের কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জোর ঝাঁকুনি দিয়ে ট্রেন হঠাৎ দাঁড়িয়ে যেতেই ঘুম ভেঙে গেল। হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তখন দুটো বেজে গেছে। এই সময় চিদামবরম স্টেশনে পৌঁছবার কথা। রাস্তায় কেন দাঁড়িয়ে গেল গাড়ি।

বাঙ্ক থেকে নেমে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম। নিচ্ছিদ্র অন্ধকারের মাঝে রক্তচক্ষু সিগন্যাল ইঙ্গিতে বলে দিয়েছে, তিষ্ঠ। পথ খোলা নেই। অনেকটা দূরে ঝোপঝাড়ের মাঝে একটা আলোর রেখা দেখা গেল। বোধহয় কোন গ্রাম। এই রাতের অন্ধকারে সবাই যখন ঘুমন্ত ওই গ্রামের কোন গৃহে হয়ত বা কেউ আলো হাতে করে কোন কাজে বের হয়েছে। কিছুক্ষণ পরে আলোটা আর দেখা গেল না। গাড়ি তখনও নিশ্চল।

লক্ষ লক্ষ মাইল ট্রেনে, প্লেনে ও জাহাজে পাড়ি দিয়েছি। পথের বিঘ্ন সম্বন্ধে বেশ ভালই অভিজ্ঞতা আছে তাই অকাম্য হলেও এই রকম চলার বিঘ্নে কোনরূপ ক্ষোভ জমে না মনে। মানুষ যদি মনে করত তার জন্ম শুধু কবরে স্থান করে নিতে তা হলে সভ্যতার অগ্রগতি কোন দিনই সম্ভব হত না। মানুষ এগোতে চায়, প্রতিবন্ধক জয় করতে চায়। কোথাও বাধা এলে কোন ক্রমেই সে ক্ষুব্ধ না হয়ে পথ খোঁজে বিঘ্ন জয় করতে।

আজও ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছি এমন সময় নড়ে উঠল গাড়ি।

যারা জেগেছিলেন তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

মিটার গেজের গাড়ি কিন্তু মন্থর নয়।

মিটার গেজ রেলপথে গাড়ি যখন দুরন্ত বেগে ছোটে তখন তার একটা বিশেষ ছন্দ থাকে তার শব্দে। সেই ছন্দের পতন যখন ঘটে কোন স্টেশনে এসে গাড়ি

দাঁড়ালে তখন কেমন ক্লান্তি আমার মনটা ও দেহটাকে আচ্ছন্ন করে। মনে হয় সঙ্গীতের মূর্ছনায় তালভঙ্গ ঘটল, ছেদ টানল আমার শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের গহ্বরে। আবার যখন ছুটতে থাকে গাড়ি তখন আবার নিজেকে ফিরে পাই। আবার ছন্দের তালে তালে মনটা নেচে ওঠে। এই অনুভূতি ব্যক্তি কেন্দ্রিক। কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না।

মাদুরায় নেমে পড়লাম।

দক্ষিণীরা মাদুরাকে মাদুরাই বলে পরিচয় দেয়। আর মাদুরাইয়ের গরিমা প্রচার করে মীণাক্ষীদেবীর নামে। আরজু আর নছিরাকে সাময়িকভাবে ভুলে গেলাম মীণাক্ষীমন্দিরের গোপুরমের সামনে দাঁড়িয়ে।

দক্ষিণ ভারতের প্রায় সব বিখ্যাত মন্দিরের সামনে বিশাল সুউচ্চ প্রবেশ দ্বার, তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় গোপুরম। তামিল, তেলেগু, মালয়ালাম ও কানাড়ী ভাষা ভাষী অঞ্চলের সব মন্দিরের এই বৈশিষ্ট সবার চোখে পড়ে।

মীণাক্ষী মন্দিরের বাইরে পাদুকা জমা দিয়ে প্রবেশ করলাম। প্রস্তর প্রাকার পরিবেষ্টিত বিরাট প্রাঙ্গণ। তার মাঝেই মীণাক্ষীদেবীর বিশাল প্রস্তর নির্মিত মন্দির। দক্ষিণী ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন গোপুরম পেরিয়ে এসে মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল, বাইরের আলো বাতাস এখানে কেন বা বন্ধ হয়ে গেছে। খোলামেলা ভাবটা নেই।

আমার সঙ্গী কেউ নেই। ইতিহাসের গালগল্প তৈরি করার লোকও পেলাম না।

হোটেলে খেতে বসে জানার ইচ্ছাটা কেমন উস্‌খুস করছিল মনটায়। আমার সামনে কেতা দুরস্ত একজন দক্ষিণী ভদ্রলোক বসে কেবলমাত্র স্বাদম্ (ভাত) মুখে তুলছিলেন এমন সময় রবাহূতের মত প্রশ্ন করলাম আপনি কি মাদুরাইতে থাকেন।

না। এসেছি দেবীদর্শণে। আপনি?

আমিও।

দুজনেই খাবারের দিকে মনঃসংযোগ করেছিলাম।

ভদ্রলোক বললেন, দেবীদর্শণ করেছেন?

করেছি তবে খুশি হতে পারিনি।

কেন?

উঃ, এত অন্ধকার তারপর ধূপের ধোঁয়াতে অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে রেখেছে। চোখ যেন ফেটে পড়তে চাইছিল দেবীদর্শন করতে। আপনি তো এদেশের লোক, বলতে পারবেন মন্দিরটাকে দুর্গের মত সুরক্ষিত কেন করা হয়েছে।

হেসে বললেন, আলাউদ্দিন খিলজীর নাম শুনেছেন তো। আলাউদ্দিনের আগে আর কোন মুসলমান রাজা বাদশা বিন্ধ্য পেরিয়ে দক্ষিণে আসতে পারেনি। পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে থাকত দেবগিরির রাজা। আলাউদ্দিনের

অর্থের লিপ্সা আর নারীদের ভোগ করার লালসা দিল্লি থেকে ঘোড় দৌড় করিয়েছিল মেবারে। সেখানে বিশেষ সুবিধা না করতে পারলেও গুজরাতের রাণী কমলাকে নিজে জোর করে বিয়ে আর বড়ছেলে খিজিরের সাথে কমলার কন্যা দেবলাদেবীর বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। গুজরাতরাজ এসে আশ্রয় নিয়েছিল দেবগিরিতে।

আলাউদ্দিনের নজর পড়ল দেবগিরির ওপর।

আমি তাকে থামিয়ে দিলাম। বললাম, দেবগিরি দেখে এসেছি। সব চেয়ে ভাল করে দেখেছি সেই দুর্গকে দুর্ভেদ্য করার প্রযুক্তি। যেকালে কামান বন্দুক ছিল না সেকালে এরকম দুর্ভেদ্য দুর্গ দখল করা প্রকৃতপক্ষে ছিল অসম্ভব ব্যাপার।

ভদ্রলোক হেসে বলল, ভারতবর্ষে সবই সম্ভব। আমরা ঝগড়া করি নিজেদের মধ্যে সামান্য স্বার্থের জন্য, বিশ্বাসঘাতকতা করি ভবিষ্যত না ভেবে। সেদিনও এই ঐতিহ্যকে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি আজও সেই ঐতিহ্য একান্তভাবে মেনে চলেছি। ঐতিহ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি।

বিশ্বাসঘাতক গোপন পথ দেখিয়ে দিয়েছিল?

নিশ্চয়ই। এই তো সেদিনের কথা। আপনাদের দেশে উধুয়ানালা দুর্গের গোপনপথ দেখিয়ে দিয়ে যেমন মীরকাশিমের পতন ঘটিয়ে ইংরেজ রাজ্য কায়েম করার পথ প্রশস্ত করা হয়েছিল তেমনি দেবগিরির জ শঙ্করের বিশ্বস্ত অনুচর গোপন পথ দেখিয়ে দক্ষিণে মুসলমান রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করেছিল। এসবই ইতিহাসের অপ্রিয় সত্য কাহিনী। এতে কোন মন্তব্য অথবা টিকার প্রয়োজন হয় না।

চুপ করে শুনছিলাম। টেবিল থেকে ভাত আর মুখে উঠছিল না।

কিন্তু দক্ষিণেও কি এর ঝড় ঝাপটা এসেছিল?

অবশ্যই। জানেন তো, ব্রাহ্মণরা যেমন সমাজশাসন করে আজও তেমনি তারা মন্দির ও দেবতার মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণ দিতে কার্পণ্য করেনি সে যুগেও।

বললাম, মন্দির বিগ্রহ রক্ষা করতেই বুঝি এইভাবে দুর্গাভ্যন্তরে মন্দির স্থাপন করা হয়েছিল।

না, আগে মন্দির তৈরি হয়েছিল। পরে মুসলমান আক্রমণের আশঙ্কায় দুর্গ তৈরি করতে হয়েছিল। অবশ্য মুসলমানরা মণ্ডপথ অবধি এগিয়ে আর রামেশ্বরম পৌঁছাতে পারেনি। কয়েক হাজার মন্দির তো লুট করেছে মুসলিম লুটেরার দল যার সূত্রপাত সোমনাথ থেকে, শেষ আজও হয়নি। সুযোগ পেলে আজও তারা মন্দির ভাঙতে কসুর করে না। মন্দির ভাঙলেই ঈশ্বরের অবলুপ্তি ঘটবে এমন বিশ্বাস যারা করে তারা মূর্খ। মসজিদ মন্দির ভাঙলে ঈশ্বরের অমর্যাদা করা হয় না। অবমানিত হয় মনুষ্যত্ব। মানুষের ভক্তি-শ্রদ্ধা -বিশ্বাস তো ইঁট,পাথরে গাঁথা থাকে না।

বললাম, ঠিক বলেছেন। একটি পরম সত্য আমরা ভুলে গেছি। ঈশ্বর

বা আল্লার সাক্ষাৎ আজ পর্যন্ত কেউ পেয়েছে কি-না তা বলা কঠিন। যারা সাক্ষাৎ পাওয়ার দাবীদার তারাও কখনও অপর জনকে সেই সাক্ষাতের সাক্ষী রাখেনি। তবে ঈশ্বর আল্লার নামে যে অনাচারগুলো ঘটে চলেছে আজও তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর আল্লা কেউ নয়। মানবপ্রেমী মহাপুরুষরা ঈশ্বর আল্লারনামে যে শিক্ষা দিয়ে গেছেন তা মানুষের মঙ্গলের জন্য করে গেছেন। সৎ-জীবন, সদাচার, সৎকর্ম, প্রেম, শান্তির বাণী তাঁরা শুনিয়েছেন। তাঁদের সেই শিক্ষা গ্রহন করলে মন্দির মসজিদের ঝগড়া কোন কালেই হোত না। একদল লুঠেরা এসেছিল সম্পদ লুঠ করতে, ভোগ করতে। ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করতে নয়, অপরদল তাদের যারা বাধা দিয়েছিল, তাদের মনে জন্মেছিল ঘৃণা। সেই ঘৃণার অবসান আজও হয়নি।

কথা বলতে বলতে কেমন বেমনা হয়ে গেলাম।

ভদ্রলোক আমার দিকে অপলকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনি অসুস্থ-বোধ করছেন?

বললাম, না। পুরানো দিনের অনেক কথা মনের কোণায় উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে মিস্টার শেখরণ।

ও। বলেই ভদ্রলোক উঠে গেলেন।

ধীরে ধীরে আমিও উঠে রওনা দিলাম স্টেশনের দিকে।

কোথায় যাব তখনও স্থির করতে না পেরে স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসে ফেলে আসা দিনের কথা ভাবতে থাকি।

আরজুকে বেশ শক্ত মহিলাই মনে হয়েছিল।

নারী চরিত্র জানার সুযোগ খুব পাইনি। কোয়েটাতে প্রভাকে দেখেছিলাম। তাকে ঘৃণা করতে পারিনি কিন্তু অনুকম্পাও সে চায়নি। সে ছিল মূর্তিমতী একটা প্রতিবাদ। অন্যায়কে মাথা পেতে নিতে চায়নি, তার মত কতশত প্রভা যবনিকার অন্তরালে ঢেকে গেছে সামান্য একটু স্নেহ-মায়া-মমতা আর নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে তার হিসাব পাইনি। যে সমাজ প্রভাকে সৃষ্টি করেছিল আরজু সে সমাজের লোক নয় তাই আচরণেও প্রভেদ রয়েছে। পার্থক্য বোধহয় আকাশ-পাতাল।

আমার ঘরে ফেরার সময় আসন্ন।

নিয়ামতের বাড়িতেই এসেছিল আরজু। নব বিবাহিত লজ্জানত বধূর মত নয়, বেশ বিক্রম সহকারে পা ফেলতে ফেলতে এসেছিল। তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, সালাম আলেকুম বিবিসাহেবা।

বিবিসাহেবা ওয়ালেকুম সালাম বলে প্রত্যুত্তর দিয়ে আমার খাটিয়ার এক পাশে বসল।

কেমন আছ, ওসমান কেমন আছে?

সব ভাল। ভাইজান তো আমার ঘরে একবারও গেলে না।

সময় পাইনি। তোমার নতুন সংসার। সাজানো গোছানো শেষ হলে

যাব একদিন।

আরজু ফিক করে হেসে বলল, কচু, নছি বলল দুএকদিনের মধ্যেই তুমি রওনা হবে। কি, কথা বলছ না কেন? যা মনে করছ তা নয়। ওসমান হল হালের বলদ আমি হলাম রাখাল। আমার ঘরে যেতে ভয় পাও? ভয় নেই ভাইজান, লড়াই করার লোক চুপসে গেছে।

বললাম, ভয় তো আছেই বিবিসাহেবা। সেদিন যে ভাবে তিন মিঞাকে ঘায়েল করেছিলে তাতে ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আমার মত অতি সামান্য খোদার মাল পয়মাল হতে এক লহমারও দরকার হবে না।

আরজু হেসে এগিয়ে আমার হাত ধরে বলল, চিরকেলে নির্মদা।

ওটা আমার মাথার মুকুট, ঠিক বুঝেছো।

আরজুর হাসি আর দেখা গেল না ঠোঁটের আগায়।

তবে যেদিন ফিরে যাওয়াটা স্থির করে আরজুর অনুরোধ রক্ষা করতে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম সেদিন বিদায় নিতে গিয়ে বলেছিলাম, বিবিসাহেবা। কাল ফজরে আমি সোজা বাড়ি যাব।

আরজুর কণ্ঠস্বরে কেমন একটা ব্যথার রেশ। বলল, কেন?

অনেকদিন নিজের ঘরে পরবাসী, ভাল লাগছে না। ওসমান সাহেব কোথায়?

কাল থেকে ওসমান ঘরে আসেনি। তার দেশের বাড়িতে গেছে পুরনো বিবি সামলাতে। বোধ হয় আর আসবে না, ভেবেছিল আমি হব হালের গরু আর ও হবে রাখাল। নিরাশ হয়েছে বাছাধন। তাই ফেরার আশা ছেড়ে দিয়েছি। ওসমান তালাক দেবার ফন্দী খুঁজছে।

অবাক হয়ে বললাম, বিয়ে হতে না হতেই তালাক।

অবশ্য সে এখনও খোলসা কিছু বলেনি, তবে ভাবেভঙ্গীতে তাই মনে হচ্ছে। এত বড় সম্পত্তিটা হাত করতে না পারলে কার না দুঃখ হয়!

তোমরা তো নিজেরা দেখেশুনে ভালবেসে বিয়ে করেছিলে।

ভালবাসাটা আমাদের কুষ্ঠিতে কোন কালেই লেখা হয়নি। ওর প্রয়োজন ছিল মেয়েমানুষের, আমার ছিল একটা শক্ত সমর্থ পুরুষ অভিভাবকের কিন্তু আমাদের সব ভালবাসা ঠুনকো করে দিয়েছে আমার সম্পত্তি। ওটা হাতে না পেয়ে ওসমান বিবাগী হয়েছে। ভালবাসার অভিনয়টা মন্দ করেনি

আরজু কেমন পাগলের মত হাসতে থাকে।

আমি কোন কথা না বলে দরজার দিকে এগোতেই আরজু ডাকল, দাঁড়াও ভাইজান।

দাঁড়াতে হল।

শোন মিঞা আমাদের মওলবী সাহেব বলেছে, বিয়েটা মেয়ে পুরুষে সহবাস করার চুক্তি, ফলাফল হল সন্তান সৃষ্টি। বিবি তালাক হলে সে সন্তানের ওপর স্ত্রীর কোন অধিকার থাকে না। মাকে মা বলার অধিকা

হারায় সন্তান। আমরা যেন পণ্য। পুরুষ ইচ্ছামত বিয়ে করে, তালাক দেয়। নারী আবার ঘর বাঁধে অপর পুরুষের সঙ্গে অবশ্য তাতে সামাজিক মর্যাদা নষ্ট হয় না কিন্তু মনের দিক থেকে আমরা গরিব। ওসমান এসব জানে তাই সে যার ধান্দায় ঘর বাঁধতে চেয়েছিল তা পূর্ণ হবার আশা নেই দেখে নিজের পথ দেখেছে।

স্টেশনের বেঞ্চে বসে আরজুবিবির থমথমে অথচ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সেই চেহারাটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাইকে শোনা গেল, কন্যা-কুমারী যাবার গাড়ি শীগগির আসছে তিন নম্বর প্ল্যাটফরমে।

আরজুর ভূত তখনও আমার ঘাড় থেকে নামেনি। প্ল্যাটফরমের শেডের দিকে তাকিয়ে তখনও তার কথা মনে হচ্ছিল, ও যেন একটা জীবন্ত প্রতিবাদ। ইতিহাসের পাতায় রাজিয়া সুলতানের বিরাট ব্যক্তিত্বের উল্লেখ থাকলেও আরজুর নির্ভীক ব্যক্তিত্বের কথা কোথাও লেখা হবে না। অখ্যাত ক্ষুদ্র শহরের একটি মুসলীম যুবতী শরীয়তের অপব্যাখ্যা নস্যাৎ করতে যে ভাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল তা কোথাও উল্লেখ না থাকলেও আমার মনে স্থায়ী আসন গড়ে তুলতে পেরেছে, এটাই তার প্রতিবাদ কীর্তির পিরামিড। নানা দেশে নানা রুচির নারী-পুরুষের সাহচর্য লাভ করলেও এমনটা দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছে।

হুস্ হুস্ করে ট্রেন প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই স্মৃতিমন্থনের রাজ্য থেকে ফিরে আসতে হল। গুটি গুটি পায়ে গাড়িতে উঠে বসলাম। আমার চেয়ে ভাগ্যবান এক দল বঙ্গসন্তান এই কামরাতে ছিল, তাদের গন্তব্যস্থলও কন্যাকুমারী। অবশ্য তখনই তাদের পরিচয় জানতে পারিনি, তাদের ব্যাকালাপের ভেতর দিয়ে তাদের জেনেছি।

একটা প্রবাদ আছে যেখানে ইংরেজ দলবদ্ধ সেখানেই একটা ক্লাব, যেখানে বাঙালী সেখানেই একটা কালীবাড়ি। এই প্রবাদের নব সংযোজন, প্রবাসে বাঙালী মাত্রই অপর বাঙালীর মিত্র। এই মিত্রতা গড়ে ওঠে বাঙালীর বাকচাতুর্যে। বাঙালীকে দেখলেই নবাগত গদগদ হয়ে নিজেকে জাহির করতে কখনও ভুল করে না। আমি এই প্রবাদে বিশ্বাসী। পেছনে ফেলে আসা কটা দিন ইংরাজিতে মনের কথা বলতে বলতে হাঁপিয়ে উঠেছিলাম, এবার নিজেকে ফিরে পাবার আনন্দটা পুরোপুরি উপভোগ করতে পারব। ওরা কে, যেমন কি-জাত কি-ধর্মী তার প্রয়োজন নেই, সবার পরিচয় বাঙালী।

নিয়ামতের আমন্ত্রণে পদ্মার ওপারে গিয়ে কোন সময়ই মনে হয়নি আমি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে এসেছি। আমার রক্ষণশীল বাঙালী মনটা বাংলা সংস্কৃতির যতটা নৈকট্য অনুভব করেছে তার অর্ধাংশও খণ্ডিত ভারতের বাংলায় অনুভব করার অবসর কখনও পাইনি। আমাদের একটা দুর্নাম আছে আমরা কথা বলি বেশি আর কাজ করি কম। নিয়ামতের অতিথি হয়ে বেশি কথা বলার সুযোগে যতটা পেয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতে এসে কথা বলার

সুযোগ না থাকায় মৌনব্রত মাঝে মাঝে পালন করতে হয়েছে। কাজ করার সুযোগও পাইনি। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বলেছেন দেশ গড়তে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে। সারা দেশের তরুণ তরুণীরা কঠিন পরিশ্রম করতে কর্ম সংস্থানের আশায় দরজায় দরজায় ঘুরে কয়েক ডজন জুতো ছিঁড়ে ছেঁড়া মন নিয়ে কঠিন পরিশ্রমের অভাবে কটুবাক্য নিয়ে অধিক বাক্য ব্যয় করতে বাধ্য হচ্ছে। নিজের অক্ষমতা ও অযোগ্যতাকে গোপন করতে অপরকে ছোট করে দেখাতে অনেকেই তৎপর হয়। তৎপরতা দেখা দিল, মৌনব্রত ভঙ্গ হল। সঙ্গী দুটো বালিকা আর একটি কিশোরকে পেলাম। এবার বেশি কথা বলে কম পরিশ্রম করার সুযোগ পাব।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে তোমরা ?

বড় মেয়েটা গালে হাত দিয়ে বলল, ওমা, তুমি তো বাঙালী !

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাবার আগেই কিশোরটি এগিয়ে এসে বলল আমরা প্যাকেজ ট্যুরে বেরিয়েছি গোটা দক্ষিণ ভারত বেড়াতে।

এখন কোথায় যাচ্ছ ?

কন্যাকুমারী হয়ে কোভালাম তারপর আর মনে নেই। বাবার কাছে প্রোগ্রাম আছে। ওই যে বাবা, ও বাবা, এদিকে এস, এই ভদ্রলোক বাঙালী।

ছেলের ডাক শুনে এগিয়ে এলেন নির্মলবাবু। হাতজোড় করে নমস্কার করে বললেন, আপনি বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছেন, সঙ্গে আর কে আছেন ?

আমি একা।

তাহলে আমাদের সঙ্গেই চলুন। এক সাথে যাওয়া যাবে। সঙ্গীও পাবেন। আমরাও পাব।

এমন অযাচিত আমন্ত্রণ খুব কমই পেয়েছি। আমি তো সবাইয়ের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল। একবারও জানতে চাননি আমার পরিচয়। এদের কাছে আমার অন্য কোন পরিচয় দরকার হয়নি. আমার সেদিনের বড় পরিচয় আমি বাঙালী। এই ঔদার্য আমি লক্ষ্য করেছিলাম পদ্মার ওপারে। উগ্র ভারত বিদ্বেষের মাঝেও নিয়ামত ও তার পরিবার পরিজন সব সময় আমাকে আপনজন মনে করেছে। একদিন কথায় কথায় বলেছিল, একজন বাঙালী মুসলমানের কাছে একজন বাঙালী হিন্দু যত আপনজন তার কণিকাও নয় উর্দুওলা মুসলমান একজন বাঙালী মুসলমানের কাছে। অবাক হয়ে নিয়ামতের কথা শুনে আমার মোহভঙ্গ ঘটল। আচার আচরণে আহারে বিহারে শ্যামল বাংলা উভয় সম্প্রদায়ের মা এটাও বুঝিয়ে দিয়েছিল নিয়ামত।

আজ কন্যাকুমারীগামী গাড়িতে বসে সেই পুরোনো দিনের কথাগুলো মনে পড়তেই কেমন শিহরণ অনুভব করলাম। নির্মলবাবু বললেন, আমরা একত্রিশজনের এইদল প্যাকেজ ট্যুরে বেরিয়েছি। আমরা কেউ-ই কারও পরিচিত নই অথচ আট-দশ দিন একই পরিবারের অংশীদার হয়ে ভালমন্দ ভাগাভাগী করে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোন ক্ষোভ নেই, স্বার্থের সংঘাত নেই। ভালই লাগছে।

আমরা যে এত আপনজন তা কলকাতাবাসী হওয়াতে মোটেই উপলব্ধি করতে আগে পারিনি।

আমি নির্বাক। ভদ্রলোকের এই আবেগ উচ্ছ্বাসকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। সত্যি সত্যি মানুষ প্রবাসে যত উদার পারে তার পরিচয় শহুরে জীবনে প্রত্যক্ষ করা সুকঠিন।

আমাদের কথাবার্তা জমে উঠতেই ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন প্রৌঢ় আনন্দময়বাবু। আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা থেকে আসা হল?

রামেশ্বরম গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মাদুরাই, তারপর এই চলেছি।

ওঃ। পণ্ডিচেরি যাওয়া হয়েছিল কি?

হেসে বললাম, আপনি ভাববাচ্যে কথা বলছেন কেন. সোজাসুজি তুমি বললে আমি মোটেই বিরূপ হব না। হ্যাঁ, পণ্ডিচেরিতেও গিয়েছিলাম, মহাবলীপুরমে গিয়েছিলাম, পক্ষীতীর্থেও গিয়েছিলাম। আপনারা?

আমরাও।

দিনের আলো নিভে গেল। নেমে এল রাতের অন্ধকার। সবাই ব্যস্ত হল রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়তে। আমি জানলার ধারে যেমন বসেছিলাম সেই ভাবেই বসে রইলাম। গাড়ির গতিবেগ কত জানি না, তবে এক্সপ্রেস্ গাড়ি হু-হু করে স্টেশনের পর স্টেশন পেরিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটছিল। গাড়ির গতিকে হার মানিয়ে আমার মনের গতি ছুটছিল কিন্তু সামনে নয় পেছনে।

সেই কিশোর এসে আমার ধ্যানভঙ্গ করল।

মা তোমাকে ডাকছে।

তাকিয়ে দেখলাম কিছুটা দূরে জানলার পাশে নিচের টায়ারে বসে মধ্য বয়সী একজন ভদ্রমহিলা তথা নির্মলবাবুর স্ত্রী, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিশোরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন ডাকছেন?

খেতে।

হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে রাতটা আন্দাজ করে বললাম, এত রাতে আর কিছু খাব না। তোমার মাকে বল গিয়ে আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

আমি জানতেও পারিনি ভদ্রমহিলা আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। আমার কথা শেষ হতেই বললেন, একটা পাঁউরুটির কয়েকটা টুকরো একটা কলা খেলে কারও পেট ভর্তি হয় না ভাই।

ভাই! চমকে উঠলাম।

উনি আবার বললেন, আমি তোমাকে অনেকক্ষণ থেকেই দেখছি। তোমার অনশনটা কেন তা জানি না, তবে আমার সঙ্গে যথেষ্ট খাবার আছে, তুমি খেয়ে নাও।

উত্তর দেবার মত ভাষা খুঁজে পেলাম না।

এই ঝণ্টু, টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে আয়।

নির্দেশ মাত্র ঝন্টু ছুটে গিয়ে খাবারের ক্যারিয়ারটা এনে দিল। সঙ্গে জলের বোতল।

পথে পাওয়া দিদি-টি আমাকে সব স্নেহ উজাড় করে পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়ালেন। উঠে যাবার সময় বললেন, কাল থেকে তুমিও প্যাকেজের মেম্বার। কোন আপত্তি শুনব না।

কিন্তু!

কিন্তু নেই ভাই। পথে কুড়িয়ে পাওয়া ভাইটি আমার বিশেষ প্রাপ্তি মনে করব যা আমরা হরেক তীর্থদর্শণ করেও লাভ করতে পারিনি।

লজ্জায় মুখ নিচু করা তো দূরের কথা একটা প্রতিবাদের ভাষাও আমার মুখ দিয়ে বের হল না।

আমার স্বামী ঝন্টুর বাবা সরকারী দপ্তরে মস্ত বড় চাকুরে। অনেক দিন ধরে বাইরে যাব যাব করে আর হয়ে ওঠেনি। এবার সুযোগ পেয়েই বেরিয়ে পড়েছি। উনি তো এক পা তুলেই ছিলেন আমিই সংসারের ঝামেলায় সময় করতে পারছিলাম না। জান ভাই, বেড়ানোটা যে এত আনন্দের, তৃপ্তির তা কখনও ভাবতে পারিনি। কেন যে দেশ বিদেশ থেকে মানুষ হন্যে হয়ে ছুটে যায় বিভিন্ন দেশে তা মর্মে মর্মে অনুভব করছি, এবার তুমি শুয়ে পড়। বেড টি পাঠিয়ে দেব।

আমার কাছে সবই বিস্ময়কর মনে হলেও বাস্তবটা অস্বীকার করতে পারিনি।

ঘুম আর আসে না।

পেছনে টানতে থাকে আমার মন। মনকে লাগাম দিতে পারিনি।

অনেকক্ষণ ঘুমোবার চেষ্টা করেও যখন চোখের পাতা বিশ্বাসঘাতকতা করল তখন উঠে বসতে হল।

সারাদিন বেশ গরম সহ্য করেছি।

জানলার পাশে বসে রাতের মিষ্টি বাতাসে ঝিমুনি এসে গিয়েছিল।

তাকিয়ে দেখলাম গোটা কামরার মানুষ অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একমাত্র আমার চোখে ঘুম নেই।

কেন নেই, এই প্রশ্নর উত্তরে পেয়েছিলাম, মানুষ সামান্য স্বার্থের জন্য পিতামাতাকে পরিত্যাগ করে, দেশের মানুষ অন্য দেশে গিয়ে ঘর বাঁধে সে দেশে আমার এই নতুন দিদি একটা বিরল দৃষ্টান্ত। তুলনামূলকভাবে এই সব বাস্তব চিত্র আমার মনে ঝড় তুলেছিল।

নিয়মতের মত সেকেন্দার আমার সহপাঠী হলেও তার সঙ্গে পরিচয় ও ভাব-ভালবাসা হয়েছিল কলেজে। সেকেন্দার বর্তমান মালদহের ভারতীয় অঞ্চলের বড় জোতদারের ছেলে। কলেজে পড়ার সময় পরিচয় হলেও সেকেন্দারের আড্ডা-খানা ছিল ইসলামিয়া কলেজে, যেখানে ছাত্রদের অবিসম্বাদিত নেতা ছিলেন মুজিবর রহমান। ছাত্র লীগের নেতা, সেক্রেটারি মুজিবরের মন্ত্রশিষ্য সেকেন্দার কালিয়াচকের গ্রামাঞ্চলের মুসলিম জনতার বিশিষ্ট নেতা কিন্তু দেশ ভাগ হবার

সময় কালিমাচক রয়ে গেল ভারতে। সেকেন্দারের স্বপ্ন ছিল মুসলিম প্রধান মালদহ পাকিস্তানের প্রাপ্য হবেই। আর সেকেন্দার হবে তাজহীন বাদশাহ। (Man proposes God disposes.) স্বপ্ন ভঙ্গ হল সেকেন্দারের।

র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ বের হতে কয়েকদিন দেরি হওয়াতে মালদহের শাসন ব্যবস্থা ছিল লীগের কব্জায়। সে সময় অনাহূত হয়ে সেকেন্দার এসে বলেছিল, ভয় পাসনা ভাই, আমি তোর ছাত্র জীবনের দোস্ত। তার কোন বিপদ হলে আমি তোকে রক্ষা করব।

উল্টোটা যখন ঘটল তখন আমি গিয়েছিলাম সেকেন্দারের কাছে।

বলেছিলাম, শোন সেকেন্দার। তোর কোন বিপদ হলে আমি তোকে সাহায্য করব।

আমার কথায় সেকেন্দার ঘাবড়ে গিয়েছিল। উল্টো সুরের গান তার মোটেই ভাল লাগেনি। সেকেন্দার নিজেকে কোন সময়ই ভারতীয় ভাবেনি ভেবেছে মুসলিম কৌমের অংশীদার। তাই তার কদিন আগের কার্যধারা তাকে ভীত করে তুলেছিল। সেকেন্দার রাতারাতি সীমানা পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পাকিস্তানে।

সেকেন্দারের বাবা আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর জীবিতকালে এই স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত হইনি। তার মুখে শোনা ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল। তবে সেকেন্দার যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল।

তুই ঠিকই যাবি সেকেন্দার ?

সেকেন্দার গম্ভীরভাবে বলেছিল, এতকাল যে পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছি তা যখন সফল হয়েছে তখন এদেশে থাকা কোন ক্রমেই কর্তব্য নয়। তার ওপর দ্বিজাতিতত্ত্ব হল দেশ ভাগের মূল থিওরি। ওটা হল মুসলিম জাঁহা আর এটা হল হিন্দুস্তান। নিরাপদে বাস করতে পারব নারে।

গোধূলি লগ্নে আম বাগানের কিনারায় বসে সেকেন্দারকে বললাম, দেখছিস ?

কি ?

পাখীগুলো ফিরে যাচ্ছে তাদের নিজের নিজের বাসায়। আমরা আমাদের বাসা ছেড়ে অন্যত্র গেলে সত্যিকার ঘর ও শান্তি পাব কি। পাবি নারে সেকেন্দার। এ দেশটা কিন্তু হিন্দুদের দেশ নয়, এটা হিন্দু-মুসলমান কৃশ্চান সবার দেশ। তবে সবাইকে ভাবতে হবে আমরা ভারতবাসী। এটা তো কঠিন কোন কাজ নয়, বৃটিশ ভারত থেকে নিজের ভারতে বাস করা তো নিরাপদ।

সেকেন্দার তখন হিন্দু বিদ্বেষে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়েছে, নীতিকথা শোনার অবসর ছিল না। ওর বাবা বলেছিলেন, তুই যাস না সেকেন্দার। আমার দাফন দেবার লোক রইবে না।

সেকেন্দার দৃঢ়ভাবে বলেছিল, তোমরাও চল। হিন্দুদের কাছে মাথা হেঁট করে থাকব না।

আপশোষের সঙ্গে তার বাবা বলেছিল, আমাদের বুজরুগরা এখানে মাটি

নিয়েছিল, আমার জন্যও সাড়ে তিনহাত মাটি এখানেই মাপা আছে বেটা।

ও মাটি ওখানেও পাবে।

আমার এখানে আছে দু-শ বিঘে জমি, দুটো বড় বড় আম বাগান রয়েছে, তুতের চাষ, বাড়িঘর, এসব ছেড়ে যেতে পারব না বেটা। এখানে আমার আত্ম-কুটুম্ব তারা তো যাবে না, আমি-ই বা যাব কেন?

সেকেন্দার কারও উপরোধ গ্রাহ্য না করে চলে গেল পূর্ণভবা নদী পেরিয়ে। বেহেস্তের দরজা খুঁজতে চলে গেল পবিত্রস্তান পাকিস্তানে।

সেকেন্দারের বাবার কাছে শুনেছিলাম সেখানে গিয়ে সেকেন্দার সরকারী কাজ পেয়েছে, বিয়ে করেছে সাকিলা বানুকে।

সাকিলার বিয়েতে অমত ছিল অনেকের। বন্ধু-বান্ধবরা বলেছিল, ক্লাস নাইন পাশ করা সাকিলা বে-নমাজী। ওকে বিয়ে করলে খারিজ হতে হবে।

আমরা যখন হিন্দুর মেয়েদের বিয়ে করি সে সব মেয়ে তো বিয়ের আগে বে-নমাজী থাকে। শরীয়ত সম্মত হয় যদি সে কলমা পড়ে মুসলমান হয়। তাতে যদি দোষ না থাকে এতেও কোন দোষ হয় না।

শরীয়তকে পাশ কাটিয়ে ঘর সংসার করতে থাকে সেকেন্দার কিন্তু খোদার ফজলে পাঁচ বছরে পর পর তিনটি সন্তানের পিতৃত্ব সেকেন্দারকে বিব্রত করে তুলল। চতুর্থ সন্তানের জননী হবার সংবাদ শুনে সেকেন্দার আর ভারসাম্য রাখতে পারছিল না।

সংসারের খরচ বৃদ্ধি পেল। চাকরির টাকায় সংসার চলে না, যে লোক প্রথম জীবন কাটিয়েছে বিদ্বেষ প্রচার করে আর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান জীগির দিয়ে সে চাল-ডাল কিনতে গিয়ে হিমশিম খেতে থাকে।

স্বর্গরাজ্যের পথ খুঁজতে গিয়ে হয়রান হয়েছিল সেকেন্দার।

দেশের বাড়িতে খাবারের অভাব ছিল না। কোন দিন চাল কেনার ভাবনা ছিল না। গোয়ালে ছিল গরু। শিশুদের জন্য ট্যাকের কড়ি ব্যয় করতে হত না। এর ওপরে স্ত্রীর প্রয়োজন মেটাতে মেটাতে মহা কাঁপড়ে পড়ল। সেপারেট নেশ্যানের সুখ হাড়ে হাড়ে বুঝে বউয়ের হাত ধরে পাশপোর্ট নিয়ে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই ফিরে এল-তার গ্রামে। আমার সঙ্গে তার শেষ সাক্ষাৎ এখানে।

আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তার দুরবস্থার কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

বললাম, পাখীরা গোধূলি বেলায় ফেরে, তোরও গোধূলি বেলা তাই ফিরে আসতে হল। তবে রাতটা তোর সুখের হবে কি?

সুখের হয়নি, সেকেন্দার কয়েক মাস ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে, বহু নেতার সুপারিশ নিয়েও যখন ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে পারল না তখন আরম্ভ হল জীবনের বাস্তব সংঘাত।

একদিন পুলিশ এসে সেকেন্দারকে টেনে নিয়ে বর্ডার পার করে দিয়েই সব সমস্যার সমাধান ঘটাল। এরপর আর সেকেন্দারের খবর নিতে পারিনি।

একবার মাত্র শুনেছিলাম সেকেন্দার আরও একটি বিবি সংগ্রহ করেছিল। দুই বিবির লড়াই থামাতে নাজেহাল হতে হয়েছিল সেকেন্দারকে। অথচ সেকেন্দার ছিল আমার অতি আপনজন। ধর্ম ও রাজনীতির জগাখিচুড়িতে সেকেন্দার আমাদের কাছ থেকে বহুদূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল কিন্তু আপনজন যাদের মনে করিনি তাদের সঙ্গে কন্যাকুমারীর পথে চলেছি নিশ্চিন্ত মনে। আমরা এখনও জানি না কে কি ও কেমন অথচ কুড়িয়ে পাওয়া ভাইকে যে ভাবে আদর অ্যাপ্যায়ন করে চলেছেন ঝণ্টুর মা তার তুলনা হয় না।

ধর্ম যখন রাজনীতির স্কন্ধে আরোহন করে অথবা উল্টোটা হয় তখন মানুষ তার স্বাভাবিক ধর্মগুলোও ভুলে যায়। শিক্ষা দীক্ষা সব কিছু অকেজো হয়ে যায়, শিক্ষার অভিমান কলঙ্কিত হয়। কালচার ভাষা সব কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে অতি আপনজনকে পর করে দেওয়া ধর্মের বোরখাপড়া রাজনীতি-বিদদের পক্ষে যতটা সম্ভব অতটা সম্ভব নয় সাধারণ মানুষের পক্ষে। পুরাতনকে আঁকড়ে ধরে নতুনকে অস্বীকার কত অমার্জনীয় অপরাধ, যা মানুষকে অমানুষের পর্যায়ে নিয়ে যায় মনুষ্যত্ব নীরবে নিভৃতে অশ্রুপাত করে অভিশপ্ত করে উত্তরপুরুষদের।

সকালবেলায় কন্যাকুমারীতে গাড়ি এসে দাঁড়াল।

তাড়াহুড়ো করার কোন প্রয়োজন নেই। সমুদ্রটা কাছেই, এরপর ভারতের আর ভূমি নেই, ভারত মহাসাগর।

গাড়িতেই নির্মলবাবু বলেছিলেন, কন্যাকুমারী থেকে আমরা লাকসারিবাসে বাকি পথ পরিক্রমা শুরু করব। প্যাকেজ ট্যুরের কর্তারা এই ব্যবস্থাই করেছেন। দুটো রাত কন্যাকুমারীতে কাটিয়ে আরম্ভ হবে নতুন পর্যায়ের যাত্রা।

আমি চিন্তিত ভাবে বলেছিলাম, আমার রয়েছে সাকুলার রেলের টিকিট। বাসে যাবার এত অর্থ আমার নেই। যা আছে তা দিয়ে নিজের পথ চলার সামান্য খরচ হতে পারে। এর বেশি ব্যয় করা আমার সাধ্যাতীত।

নির্মলবাবু উদাস ভাবে বলেছিলেন, ওটা পরে বিবেচনা করা যাবে। কন্যাকুমারীতে গিয়ে ধীরে সুস্থে এসব ভেবে দেখা হবে। আপনার দিদির ওপর বিচারের ভার দিন।

অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনেও কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

সমুদ্রের কিনারায় একটা লজে আশ্রয় পেলাম। তিনচারটে ঘর আর খিরাট হল। যারা সস্ত্রীক তারা ঘরগুলো বেছে নিলেন, আর যারা আমার মত একক তাঁরা হলে বিছানা বিছিয়ে নিলেন।

সামনে পশ্চিমে আরবসাগর।

তিনতলার খোলা অলিন্দ দিয়ে সাগরের মিঠে বাতাস হু-হু করে প্রবেশ করছে। উঠে গিয়ে অলিন্দের রেলিং ধরে দাঁড়ালাম।

সমুদ্র আমার মন কেড়ে নিল। দূরে সি-গ্যাল আর সি-ডাকের দল ডানা

মেলে উড়ছে। আকাশে শ্বেতের সমাবেশ।

সামনে আরব সাগরের বুকে একটা ছোট পাহাড় মাথা উঁচু করে রয়েছে। দূর থেকে দেখে বেশ বোঝা গেল সেই পাহাড়ের মাথায় কয়েকটা মন্দির বিরাজ করছে।

আমার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন আমার নতুন দিদি।

কি দেখছ ভাই ?

সমুদ্র।

সমুদ্র দেখার তো শেষ নেই। ক্লান্তি নেই। দেখতে দেখতে চোখ জুড়োয়। মন জুড়োয়।

হেসে বললাম, এই বিশাল জলধি হল রত্নাকর।

সত্যি, এতে যে কি নেই তা ভাবাও যায় না। শোনা যায় সমুদ্রের বুকেই প্রথম জীবের প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল। কোটি কোটি বছরের বিবর্তনের অবদান আমরা মানুষরা।

নতুন দিদির কথায় চমকে উঠলাম। অতি সাধারণ গেরস্থ ঘরের মহিলা উনি নন তা বুঝতে অসুবিধা হল না। আমি মুখ ফিরিয়ে তাঁকে ভাল করে দেখে নিয়ে বললাম, আপনি তো অনেক কিছু জানেন।

জানার কি শেষ আছে, জানি হয়ত সামান্য অথচ বড়াই করি অনেক বেশি। তবে একটা কথা মনে রেখ ভাই। না জানাটা শান্তির সহায়ক। বেশি জানাটা দুঃখের কারণ। আমার বাড়ির দাসী যতটা শান্তিতে থাকে তার অজ্ঞতা নিয়ে সেই অনুপাতে আমার দুঃখ বেশি জানার অপরাধে।

আমি বোকার মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি।

কি ভাবছ, কি দেখছ ?

ভাবছি আপনার কথা, দেখছি এই ছোট দেহটার মাঝে কত রত্ন লুকিয়ে আছে।

ওই পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ ? পাহাড়ের পা ধুইয়ে দিচ্ছে অশান্ত সমুদ্র বারি দিবারাত্রি, কোন বিরাম নেই। পাহাড়টা বিবেকানন্দ রক্ নামে বিশ্ববিখ্যাত। সে অনেক দিন আগের কথা এই উত্তাল সমুদ্র সাঁতার পার হয়ে বিবেকানন্দ এই রকের গুহায় বসে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আজ দুপুরে আমরা ওই তীর্থস্থান দর্শণ করতে যাব। তুমি প্রস্তুত থেক।

বললাম, যথা আজ্ঞা।

আজ্ঞা পালন করতে একটা না বাজতেই প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

ঘাটে লঞ্চ অপেক্ষা করছিল, ফেরি লঞ্চ, সারাদিন তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক পারাপার করে।

নদী মাতৃক দেশে আমার জন্ম। বাল্যকাল কেটেছে নদীর জলে ঝাঁপাই পেটাই করে। নদীকে আমি ভালবাসি। জলের সঙ্গে আমার সৌখ্য চিরকালের। সমুদ্রের উত্তাল রূপ দেখেছি বহির্ভারত পরিভ্রমণ কালে। সেদিন সেই দেখার

মত চোখ আজ আর নেই কিন্তু একেবারে দৃষ্টির স্বচ্ছতা যে হারাইনি তা উপলব্ধি করলাম লঞ্চে আরোহণ করে। সুন্দরবন অঞ্চল দিয়ে যে সব লঞ্চ চলাচল করে তার চেয়ে অনেক বড় এই লঞ্চ। ভারত বিভাগের পূর্বে গোয়ালন্দ থেকে যে সব স্টিমার নারায়ণগঞ্জ অথবা চাঁদপুর যেত এই লঞ্চের আকার তার কম নয়, তবে স্টিমারগুলো ছিল দোতলা, এই লঞ্চ একতলা।

কয়েক মিনিটের মধ্যে লঞ্চ এসে ভিড়ল বিবেকানন্দ রকের গায়ে। সমুদ্র সেদিন শান্ত না থাকলেও বঙ্গোপসাগরের মত দুর্মদ নয়। আরব সাগর অনুপাতে শান্ত।

লঞ্চ ছাড়তেই আমার মনের স্মৃতির রাক্ষুসে গহ্বর থেকে মনের কোণায় ভেসে ওঠে একটা নদী পারাপারের ঘটনা।

বর্ষাকাল।

উত্তাল উন্মত্ত ব্রহ্মপুত্র। প্রবল তার স্রোত।

নদী অতিক্রম ছিল সেদিন দুরূহ তবুও যেতেই হবে। ফেরির নৌকার মাঝিরা নৌকার রশি খুঁটাতে বেঁধে রেখে স্বগৃহে প্রস্থান করেছে।

আমি নিরুপায়।

নদী পেরোতেই হবে অথচ কোন জল-যান নেই।

আমাকে ছোটাছুটি করতে দেখে একজন সহৃদয় ব্যক্তি বললেন, ডিঙি দেখুন, ডিঙি সহজে ডোবে না। মাঝিরাও খুব সাহসী। ওরা ভাড়ার ওপর কিছু পেলে আপনাকে পার করে দেবেই।

ধুবরীর ঘাটে ডিঙির অভাব নেই। পয়সার লোভ দেখিয়ে সম্মত করাটাই আসল কথা।

ঘাটের ভাটিতে চর ভাসানীর চর।

ধুববীর চর, চর ভাসানী।

সেদিন ওখান থেকেই ডিঙি ভাড়া করে ব্রহ্মপুত্র পাড়ি দিয়েছিলাম। সব সময়ই কেমন আতঙ্ক এই বুঝি ডিঙি উল্টে যায়। ডিঙির পাশে ভুস্ করে শুশুক মাথা তুলে আবার জলে মাথা লুকোচ্ছে। দেখতে ভালই লাগছিল কিন্তু মনের আতঙ্ক এই অপূর্ব দৃশ্যকেও ভাল করে দেখতে দিচ্ছিল না।

ওপারে ঠিক যেতে পারব তো মাঝি?

হালের মাঝি বেশ শক্তভাবে বলল, সাঁতার জানেন তো?

জানি তো, এই উন্মত্ত নদীতে সে সাঁতার নস্যাৎ হয়ে যাবে মাঝি।

ভয় নেই বাবু। গা ভাসিয়ে দিলে রৌমারির ঘাটে পেঁছে যাবেন। তবে দরকার হবে না। তিরিশ বছর এই পাগল নদী পারাপার করছি কোনদিন কোন বিপদ ঘটেনি। এটা হল ভাসানীর চরের মাহাত্ম্য।

ভাসানীর চর, সে আবার কি?

মাঝি হেসে বলল, বেহুলা ভাসান শোনেননি বুঝি। সতী বেহুলা তার মৃতপতি লখীন্দরকে নিয়ে ভেলায় চড়ে স্বর্গের পথে চলেছিল। সেই ভেলা

এসে আটকে গিয়েছিল এখানে নেতা ধোপানীর ঘাটে। উ-দিকে নেতা ধোপানীর ঘাট। গদাধর নদী যেখানে ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিশেছে সেখানেই পাথরের কাপড় কাচার পাট আজও আছে বাবু। ভেলা ভেসে এখানে আটকেছিল বলে এই চরের নাম ভাসানীর চর। বেহুলা ভাসান তো জানেন।

আমি নীরব শ্রোতা।

কবে কোন্ অজ্ঞাত দিনে বেহুলার ভেলা পতি লখীন্দরকে নিয়ে ভাসতে ভাসতে এই চরে এসেছিল তা কোন ইতিহাসের পাতায় কেউ লিখে রাখেনি।

কোথায় চম্পকনগর আর কোথায় ধুবরীর পাশে নেতা ধোপানীরঘাট, এ নিয়ে গবেষণা করার কোন সূত্রই পাওয়া যাবে না। লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্যপ্রচারে কত উদ্ভট কাহিনী তৈরি হয়েছে তার হিসাব কেউ আজও করতে পারেনি। সতী বেহুলা ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছিল কিনা তা জানিনা। তবে দুর্ভাগ্যের তাড়নায় একজনের ভেলা আটকে ছিল এই চরে তা কিন্তু প্রমান সাপেক্ষ যা নয়। বাস্তব সত্য। এই সত্যকে যাচাই করতেই যেতে হয়েছিল ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে। অবশ্য নদী পার হয়েছিলাম যে মনোভাব নিয়ে আজ সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছি তার সম্পূর্ণ বিপরীত মন দিয়ে।

ব্রহ্মপুত্রের ওপারে অশিক্ষিত ধর্মভীরু মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষী করে তুলতে নিজ স্বার্থসিদ্ধি করতে যে ব্যক্তি কোন ত্রুটি করেনি সেই পীর আলহাজ মওলানা আবদুল হামিদ খাঁ ভাসানির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করতে যেতে হয়েছিল, ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির কপটাচার দিয়ে কি ভাবে শোষণ, বিদ্বেষ ও অনাচার কায়েম করা যায় তা প্রত্যক্ষ করতেই পাগল ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলেছিলাম। আর আজ একজন ত্যাগী বিশ্বমানবদরদী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের সাধনা স্থল দেখতে চলেছি।

চলার পথের স্মৃতি অপ্রিয় হলেও তার ভূমিকা উপেক্ষণীয় নয়। ক্ষুদ্রের বিষও সর্বনাশ ঘটায়।

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ আর ময়মনসিংহ জেলার মাঝ দিয়ে বয়ে চলেছে যমুনা নদী।

কখনও এপাড় ভাঙে কখনও ওপাড় ভাঙে। ভাঙা গড়ায় এ পাড়ের চর ওপাড়ে ভেসে ওঠে। আবার কখনও ওপারের চর এপাড়ে ভেসে ওঠে। চরের মানুষরা যে কোন্ জেলার লোক তা স্থির হয় তাদের দাবী অনুসারে।

এমনি এক চরের মানুষ আব্দুল হামিদ।

ভাঙা গড়া খেলার নিপুণ শিল্পী আব্দুল হামিদ। বিদ্যার চেয়ে বুদ্ধির প্রাচুর্যে অদ্বিতীয় ছিল। বিদ্যাভাসের দিনগুলি ঝাপসা তাই মওলানা পরীক্ষায় পাশ না করেও বুদ্ধির চাতুর্যে আব্দুল হামিদ হয়েছিল মওলানা আর অশিক্ষিত ধর্মভীরু মুসলমানদের নানা ভেল্কী দেখিয়ে আর কতকগুলো আরবী আয়াত আউড়ে হয়েছিল পীর অর্থাৎ ধর্মগুরু।

আমাকে স্মৃতির দুয়ার থেকে টেনে নামালেন আমার নতুন দিদি।

এখনও বসে আছ, ওঠ। আমরা বিবেকানন্দ রকে পেঁছে গেছি। নামতে হবে। আচ্ছা ভাই, তুমি মাঝে মাঝে এমন অন্যমনস্ক কেন হয়ে থাক। কোথায় তোমার দুঃখ।

হেসে বললাম, নাতো। পরে কথা বলব।

সবার পেছন পেছন ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরের দরজায় পেঁছলাম।

যাদের সঙ্গী হয়ে একটা দিন কেটেছে তাদের সবাইকে পেলাম মন্দিরের আঙ্গিনায়।

সবাই কেমন একটা মৌন মগ্নভাবে তাকিয়ে রয়েছে উত্তর দিকে যেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ভারতের নির্ভুল মানচিত্র। পশ্চিম ঘাটের বাঁকগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

সাগরের বুক ভেদ করে ভারতের মাটি উত্তরে ক্রমশ বিস্তার লাভ করে নিশানা দিচ্ছে বিরাট ভারতের অবস্থিতি। কন্যাকুমারীর দক্ষিণে ভারতের আর মূল ভূখণ্ড নেই। বিবেকানন্দ মনে হয় এই পাহাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে ভারতের বিশালত্ব আর শ্রেষ্ঠত্ব মনে প্রাণে উপলব্ধি করে ভারতবাসী, মাত্রেই এক মায়ের সন্তান এই অমৃতের সন্ধান দিয়েছিলেন। এই ভারতের বুকে জন্মে কেউ মহান হয়েছে, কেউ হয়েছে স্বার্থান্ধ হীনমনের অধিকারী। এখানেই রবীন্দ্রনাথ মহামানবের অমোঘ মন্ত্র শুনিয়েছেন, আবার এখানে জন্মেই ভারতের অঙ্গচ্ছেদ করতে তৎপর হয়েছিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ। অলক্ষ্যে অমৃত ফলও যেমন পবিত্র আবাস গড়তে পারে তেমনি ভারতের মহাপুরুষের পাশে কীটপতঙ্গের আবির্ভাব ঘটে। এই কীটপতঙ্গরা দাবী কার তারা ধর্মের রক্ষক কিন্তু ধর্মীয় শিক্ষা ওরা অনেক দিন আগেই ভুলে গেছে, পেশা ওদের রাজনীতি। আর রাজনীতিক ধর্মের নামে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করাই ওদের বড় ধর্ম।

হাঁটতে হাঁটতে একটা পুকুরের মস্ত বড় বড় চৌবাচ্চার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। মিষ্টি জলের মাছগুলো কেমন নিরাপদে খেলে বেড়াচ্ছে। বিরাট সমুদ্রের মাঝে ছোট্ট পাহাড়। পাহাড়ের বুকে মিষ্টিজল মূল ভূখণ্ড থেকে এল আমাদেরই কেউ না কেউ পুকুর তৈরি করে শান্তশিষ্ট মাছগুলোকে ছেড়ে দিয়েছে নয়নানন্দকর করতে। মানুষের জীবপ্রেমের একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত পরিব্রাজকদের চোখের সামনে তুলে ধরতে ধর্মের সেবকরা।

বিস্ময়ের পর বিস্ময়।

সেদিনের সেই প্রবীণ ভদ্রলোকটি আমার পাশে দাঁড়ালেন।

কি দেখছ ?

মাছ।

মাছে কি দেখার আছে। বাঙ্গালীর ছেলে জন্ম অবধি তো দেখে এসেছে। এতে নতুনত্ব কিছু নেই।

আছে। হাটে বাজারে মাছ দেখেছি রসনা তৃপ্তির উপকরণ রূপে কিন্তু আজ

মাছকে মাছ মনে করতে পারছি না কাকাবাবু। এই মাছগুলো যেন নির্ভয়ে হেসে খেলে বেড়াচ্ছে, মনে হচ্ছে মৎস্য অবতার নারায়ণ ওদের মধ্যে বিরাজ করছেন।

প্রবীণ ভবতারণবাবু হেসে বললেন, তুমি দেখছি মৎস্য পুরাণ অবধি পৌঁছে গেছ।

আমিও হেসে বললাম, পুরাণ কতটা সত্য জানি না। তবে জীবনহানি, জীবনরক্ষা ও জীবনদানের অর্থ এক নয়, উদ্দেশ্যও এক নয় এই সত্যের সন্ধান যেন খুঁজে পেয়েছি এদের দেখে। আমার মনে হয় স্বামীজি সাধনমার্গের সহচর জীবপ্রেম এই রকম কোন ভূয়াদর্শনের মাঝ দিয়েই ঘটেছিল।

পশ্চিমের আকাশ ক্রমশ লাল হতে থাকে।

সূর্য বিদায় নেবার মুহূর্ত প্রায় সমাগত।

মন্দিরের নিচে একটা বড় আঙ্গিনা। আঙ্গিনার সঙ্গে রয়েছে একটা বড় বাড়ি। তার বারান্দায় একাকী বসেছিলাম সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখতে। পাশে আমার অজান্তে এসে বসেছিলেন আমার নতুনদিদি।

কি দেখছ ?

সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখার জন্য অপেক্ষা করছি।

এখানে বসে সূর্যাস্ত দেখতে পাবে না ভাই। সূর্যাস্তের আগেই আমাদের ফিরে যেতে হবে ওপারে। রাতের বেলায় সমুদ্রে ফেরি চলাচল বন্ধ। একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞেস করব মনে করছি। তুমি যদি উল্টো অর্থ না কর অথবা ব্যক্তিগত কোন ব্যথা না সৃষ্টি করে তা হলে প্রশ্নটা করতে পারি।

আমি বললাম, আপনি কি জিজ্ঞেস করবেন তা আমি জানি।

কি জান ?

আমার পরিচয় জানতে চান, এই তো ?

আরও বেশি, কিসের টানে তুমি ছুটে বেড়াচ্ছ সেটাও জানার ইচ্ছা।

হেসে বললাম, আমার নিজের দিদি কখনও এভাবে জানাতে চায়নি। তাদের কাছে আমি ছিলাম অতি অনভিপ্রেত এমন একটি ব্যক্তি যার সাহচর্য সে অথবা তার পরিবার কোন ক্রমেই সহ্য করতে পারত না। আমার দিদি কখনও জানতে চায়নি আমার ছন্নছাড়া জীবনকথা, শুধু দূর্-দূর্ ছেই-ছেই করে আমাকে বিপর্যস্ত করেনি আমার পথ থেকে তাদের দেখানো পথে নিয়ে যেতেও পারেনি।

বলতে বলতে আমি থেমে গেলাম।

নতুন দিদি বললেন, আর শুনতে চাই না। তোমার মনের গভীরে কোথায় যেন একটা ক্ষত আছে।

না কোন ক্ষত নেই। আপনারা বেরিয়েছেন দেশ ভ্রমণে, তীর্থ দর্শনে, অবসর সময়কে আনন্দময় করতে এবং আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে স্বদেশে ফিরতে। আর আমি বেরিয়েছি মানুষ দেখতে।

মানুষ দেখতে।

হ্যাঁ নতুনদি। রবীন্দ্রনাথের ক্ষ্যাপা যেমন পরশপাথর খুঁজে বেরিয়েছিল, আমিও তেমনি মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছি নতুনদি।

ওপারে লজে গিয়ে তোমার কথা শুনব। স্টিমার ভোঁ দিচ্ছে। চল, ও-মা সবাই চলে গেছে। আর দেরি করা উচিত হবে না।

দুজনেই ছুটলাম।

ঘাটে এসে দেখি নির্মলবাবু তার ছেলেমেয়ে নিয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। অন্যরা সবাই যা দেখলেন তা নিয়ে আলোচনা করছেন আর সুবিধামত জায়গায় বসে রয়েছেন।

লজে ফিরে এসে কেমন একটা সন্তুষ্টির ভাব আমার মনে ছুটোছুটি করছিল।

আজ মনে হচ্ছে, তুমি যদি পাশে থাকতে তা হলে নতুনদির জানার ইচ্ছাটা তুমি-ই গুছিয়ে বলে পূর্ণ করতে পারতে। লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখছিলাম। রক্তবর্ণ বিরাট একটা থালা ধীরে ধীরে আরব সাগরের বুকে মুখ লুকিয়ে রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়ে সন্ধ্যাকে আহ্বান জানাল। ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভা তরঙ্গায়িত সমুদ্রের বুকে গলিত সোনার ঢেউ ছড়িয়ে দিয়ে অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করে ছিল প্রকৃতির বুকে।

দেখছি তো দেখছি দেখার যেন শেষ নেই।

অনেকদিন পর তোমার অনুপস্থিতিকে অনুভব করলাম। বিধাতার ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে আমাদের রইতে হচ্ছে নির্মম দূরত্ব বজায় রেখে।

প্রকৃতির ধ্যান গম্ভীর এমন রূপ আর কখনও দেখিনি। মোহিত আমার মন, সার্থক আমার নয়ন। হাজার হাজার মাইল জাহাজে চেপে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছি কিন্তু এমন সৌন্দর্য আগে কখন দেখিনি।

রাতের বেলায় কোন কাজ ছিল না।

সন্ধ্যা থেকেই লজের টি-ভির সামনে বসে ছবি দেখছি কিন্তু একটি অক্ষরও বোধগম্য হচ্ছে না। সবটাই তামিল ভাষার প্রোগ্রাম। ইংরেজি ও অন্য কোন ভারতীয় ভাষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

নতুনদি পেছন থেকে ডেকে বললেন, কি দেখছ? রাত নটার আগে এখানে তামিল ভাষা ভিন্ন অন্য কোন ভাষার প্রোগ্রাম হয় না। বিশেষ করে হিন্দি প্রোগ্রাম একদম বাদ রাত নটা অবধি।

কেন তা শুনেছেন কি?

যা শুনেছি তা মোটেই আনন্দদায়ক নয়। লজের ম্যানেজার শিক্ষাদীক্ষায় ন্যূন নন কিন্তু আঞ্চলিকতাবাদ বোধহয় ভদ্রলোকের মানসিক বিপর্যয় ঘটিয়েছে। উনি বললেন, ভারতের ইতিহাস বললেই উত্তর ভারতের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসকে মনে করা হয় একটা পরিশিষ্ট বা annexure. আর হিন্দিওয়ালারা মনে করে আসছে তারাই Ruling people. এবং অন্যান্য ভারতীয়রা তাদের খাস তালুকের প্রজা এবং করুণার পাত্র। তাই

এরা হিন্দী বর্জনের শপথ নিয়েছে। এখানে ইংরাজিতে কথা বললে আমরা হয়ত জবাব পাব কিন্তু হিন্দীতে কথা বললে নৈব নৈব চ। উনি বললেন, হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হয়েছে, হিন্দী প্রসারের জন্য কোটি কোটি টাকা ভারত সরকার ব্যয় করছে আর আঞ্চলিক ভাষাগুলো সরকারী সহায়তার অভাবে শুকিয়ে কাঠ হচ্ছে। আরও একটি গুরুতর অর্থবহ কথা বললেন উনি। সরকারী মতে হিন্দী হল রাষ্ট্রভাষা, রাজভাষা নয়। যে দেশে রাজা নেই সেদেশে রাজভাষা কিছু থাকে কি। ওরা মনে করে হিন্দীওয়ালারা এদেশের রাজা তাই হিন্দীকে রাজভাষা বলে প্রচার করে থাকে। তামিল তেলেগু কানাড়ি মালায়ালাম ভাষা ভাষীরা হিন্দীকে মোটেই গ্রহণ করতে পারেনি এই রাজ্যে।

বললাম, এতে সংহতি নষ্ট হবে।

হলেও নিরুপায়। ইংরেজিকে হটিয়ে হিন্দীকে আঁকড়ে ধরে ভবিষ্যত বংশধরদের সর্বনাশ ডেকে আনতে চায়না এদেশের মানুষ। কি কথা বলছ না কেন?

ভাবছি, আমারা ভোটরাজ্যে বাস করছি! ভোটের ভিখারী হয়ে সরকার ও তার প্রশাসক রাতারাতি অনেক ভাবে ভোল বদলাতে পারে। হিন্দী কেন যে কোন ভাষার সমাদর হবে ভোটের রাজ্যে ক্ষমতা দখল করতে। ভারতের সংহতি রক্ষা করার নিখুঁত ও অব্যর্থ অস্ত্র হল ভোট। ভোটের ভাষাই হবে ভারতের রাষ্ট্রভাষা। আর ভোটের জন্যেই সংহতি। ছাইগাদায় মাথা খুঁড়ে মরুক অন্য ভাষা ও ভাষীরা।

এতটা ভাববার সময় এখনও বোধহয় হয়নি ভাই।

হয়েছে, আরও একটু স্বচ্ছ চোখে দেখলেই দেখতে পাবেন নতুনদি। বাংলা দেশ থেকে উর্দুকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে বাঙালীরা আর পশ্চিমবাংলায় বাংলা একাডেমি গড়ে উঠার আগেই উর্দু একাডেমির পত্তন করেছে তথা কথিত বামপন্থীরা কেবল মাত্র ভোটের লোভে। ভোট ওদের ভগবান। ওদের কাছে ভারতীয় তথা বাংলার ঐতিহ্যের কথা ওরা বেমালুম ভুলে গেছে, এটা তো পরখ করেছেন। ভোটের ঐতিহ্যে ওরা মাতোয়ারা, সেই ভোট যে কোন উপায়ে পকেটস্থ করাই ঐতিহ্য।

প্যাকেজ টুরের অধিনায়ক এসে জানিয়ে গেল রাতের খাবার প্রস্তুত।

আমাদের আলোচনার গতিভঙ্গ হল। গুটি গুটি পায়ে দুজনে এগিয়ে গেলাম রন্ধনশালার দিকে। ইতিমধ্যে একটি ব্যাচ বায়ু উদগীরণ করতে করতে বাথরুমে যাচ্ছেন হাত মুখ ধুতে, অর্থাৎ আমরা বিলম্বিত অতিথি।

খেয়েদেয়ে নিজের বিছানায় গা গলিয়ে দেবার আগেই হাজির হলেন নতুন দিদি, নির্মলবাবু আরও তিনজন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা ওদের মুখ চিনি নাম জানি না। আন্দাজ করলাম এরা সবাই এসেছেন নতুনদিদির আমন্ত্রণে চিড়িয়াখানার দোপায়া জীবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখতে।

কি ব্যাপার নতুনদি? এতজন এই অভাজনের ছেঁড়া কম্বলে। বসুন

বসুন। নিশ্চয় কোন উদ্দেশ্য আছে। নতুনদি হেসে বললেন, অবশ্যই। তবে পরিচয়ের পালাটা শেষ করি। ইনি হলেন অসীম সরকার। সরকারী দপ্তরে জাঁদরেল অফিসার কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নয়, ইনি ওঁর স্ত্রীর বিভাবতী। নির্মলবাবুর সঙ্গে পরিচয় অবশ্যই আছে। আর ইনি শ্রীঅরবিন্দের অনুগৃহীত, পেশায় ব্যবসায়ী। এসেছেন অরবিন্দ আশ্রম দেখতে। দেখা হয়ে গেছে। এবার তীর্থদর্শন করবেন।

শ্রীঅরবিন্দের অনুগৃহীত গুনদাবাবু হাতজোড় নমস্কার করে বললেন, আমি অতি অভাজন। আমাদের নয়নাদি বললেন, আপনি মানবদর্শন করতে বেরিয়েছেন সেটা কি বস্তু জানার জন্যই আপনাকে বিরক্ত করতে এসেছি। আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন।

তাঁর দিকে লক্ষ্য করে মনে হল ভদ্রলোক স্থির প্রতিজ্ঞ আমার সঙ্গে আলোচনা করতে অথচ এই রকম বেখাপ্পা গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে আমি চাই না। মানব দেখার বিষয়টা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিষয়? অন্যকে বলার মত কিছু নয়। আমি জানি মানুষ দেখা, মানুষ চেনা, তার সঙ্গে আত্মিক পরিচয় করা দুরূহ বিষয়।

বললাম নয়নাদি আমার কথাটা ঠিক মত বলতে পারেননি। মানুষ দেখার অর্থ চোখে দেখা নয় তাতো বোঝেন। দেখতে চেয়েছি কতটা মানবতাবোধ আমরা হারিয়েছি কতটা রক্ষা করতে পেরেছি, এটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্জাত। বুঝিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আনন্দময় আজকের এই পরিবেশকে কূট তর্ক দিয়ে বিষাক্ত করা কি উচিত হবে! তার চেয়ে কালকের প্রোগ্রামটা ঠিক করাই ভাল।

সেদিনের আসর জমল না।

নতুনদিদি কিন্তু রেহাই দেয়নি।

পরদিন সকালে নতুনদিদি চা হাতে করে এসে আমার পাশে বসে বললেন, তোমার কথা শুনতে চাই ভাই।

বলার মত কিছু নেই নতুনদি। শোনাবার মত কিছু নেই। হতচ্ছাড়া ছন্নছাড়া আমার মত কোন লোকের জীবন নিয়ে কোন কিছু বলা বাতুলতা মাত্র।

নতুনদি বললেন, তাই শুনব।

প্রতিবাদ করলাম না।

দুই

নতুনদিদি ছিনে জোঁকের মত আমার পেছনে লেগে রইলেন।

আজ কিন্তু তোমার কথা বলতেই হবে।

বললাম, আমাকে একটু ভাবতে দিন। গুছিয়ে নিতে দিন ঘটনাগুলো।

বিনাসুতোর মালা দিয়ে মনের মধ্যে ঘটনার মালা গেঁথে আপনাকে উপহার দেব।

কন্যাকুমারী থেকে কোভালাম পর্যন্ত তোমার কথা শোনার জন্য ছটফট্ করেছি, আর তোমাকে সময় দিলে শেষ পর্যন্ত তুমি কোথায় ছুটে যাবে। আমার আর শোনা হবে না।

না শুনলেও কোন বস্তু নষ্ট হবে না নতুনদি। জানার ব্যথার চেয়ে না জানার আনন্দ অনেক বেশি।

নতুনদিদি ক্রোধের সঙ্গে বললেন, আর বকবক করে মাথার শিরায় টান ধরিও না। লক্ষ্মী ছেলের মত আজ রাতে সবাই যখন বিশ্রাম করবে তখন তুমি হবে বক্তা আর আমি হব শ্রোতা। অবশ্য আরও দু'চারজন শ্রোতা পেলে জমবে ভাল।

নতুনদিদির বলা শেষ হবার আগেই দেখি তাঁর কিশোর পুত্র ছুটতে ছুটতে আসছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, জানো মা, ময়নাবৌদি সমুদ্র থেকে স্নান করে আসার পথে পাথরে হোঁচট খেয়ে পা ভেঙেছে।

কোথায় ময়না ?

ওই যে মসজিদের পাশে পাথরের দেওয়াল, ওখানে শুয়ে আছে, নিমাইদাদা আর ময়নাবৌদির বাবা তার পায়ে পটি বেঁধে দিয়েছে।

ভেঙেছে কি মচকেছে ডাক্তার না হলে সঠিক বলা যাবে না। এখানে ডাক্তার কেউ আছেন! চল ভাই, দেখি কি করা যায়।

আমরা কি করতে পারি নতুনদি, ওর স্বামী ও বাবা দুজনে সেবা করছেন, আমরা শুধু আ-হা উ-হু বিনা কিছু করতে পারব কি!

এক সঙ্গে এতটা পথ এসেছি, একসাথেই ফিরতে হবে। চোখের দেখা না দেখলে তা হবে গুরুতর অপরাধ ও অসামাজিকতা!

প্যাকেজ ট্যুরের কর্তারা কন্যাকুমারী থেকে বাসের ব্যবস্থা করায় যাতায়াতটা হয়েছিল যাত্রীদের ইচ্ছামত।

বললাম, আপনার কথা শিরোধার্য। বাস যখন আছে তখন নিকটবর্তী কোন হাসপাতালেও নিয়ে যাওয়া সম্ভব। চলুন।

ময়নার পা দেখে মনে হল না পা ভেঙেছে, মচকানো সম্ভব। যন্ত্রণায় ময়না গোঙাচ্ছে, গৌরবরণ মুখটা যেন নীল হয়ে গেছে। ময়না সদ্য বিবাহিতা। অত্যাধুনিক। সালোয়ার পাজামা পরা অবস্থায় তাকে দেখেছি। বোধহয় শাড়ি ভাল করে পড়তেও জানে না। শাড়িপরে সমুদ্রে নেমেছিল, উঠবার সময় ভেজা শাড়ি পায়ে জড়িয়ে বিপদ ঘটিয়েছে।

আমাদের করার কিছু ছিল না। যাদের দায়িত্ব তারাই সাগ্রহে সেবা করে চলছিল।

ফিরে এলাম পাহাড়ের ওপর আমাদের সাময়িক আস্তানা বেসরকারী কটেজে যাকে মোটেল বলা হয়।

বিকেলবেলায় গিয়ে বসেছিলাম কটেজের বারান্দায়।

সমুদ্রের গায়ে তখন সূর্য মুখ লুকিয়ে দিগন্তে হারিয়ে যাচ্ছে। শেষ বেলার সোনালি আভা উঁকি দিচ্ছিল পাহাড়ের গায়ে আর সানুদেশের অসংখ্য নারকোল গাছের মাথায়। ধূসর সন্ধ্যা। আমরা সবাই বসে আছি কটেজের বারান্দায়, কেউ বসে আছে কটেজের আঙ্গিনায়। সবার চোখেমুখে কেমন ক্লান্তির ছাপ। শুক্লপক্ষের দশমীর চাঁদ ধীরে ধীরে ভাঙা মেঘের তলা থেকে উঁকি দিচ্ছে, মিঠে হাওয়া মোহময় করে তুলেছে অনেককেই। এই সৌন্দর্যকে মন ও প্রাণ দিয়ে উপভোগ করতে করতে ঝিমুনি এসে গেছে। আজকের রাত পেরোলেই আবার মোটর বাসে গাদাগাদি, আবার ছুটতে হবে তিরুবন্তপুরম হয়ে বাঙ্গালোরের পথে। মহীশূরেই দুই রাত্রিবাস স্থির।

আমার ঝিমুনি কেটে গেল নির্মলবাবুর ডাকে।

ভাইদাদা কি ঘুমোলেন ?

চোখ কচলাতে কচলাতে বললাম, ঠিক ঘুম নয়, ঘুমের পূর্বাভাস।

তাই বলুন। এমন সুন্দর যে ভারত তা দেখে নয়ন মন স্নিগ্ধ করে আমেজ অনুভব করছিলেন।

বোধহয় তাই।

এর আগে এই দেশে আপনি কখনও আসেননি ?

না। ইচ্ছা থাকলেও সামর্থ্য ছিল না তবে এমন রসসমৃদ্ধ দেশে না এলেও উত্তরভারত ও সংলগ্ন রসকষহীন বিদেশী রাষ্ট্রে যাবার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য হয়েছিল। রসহীন বললেও সেই সব পাহাড় পর্বত ঘেরা শুষ্ক অঞ্চল মরুভূমি এবং তথাকার উগ্রমানুষদের মাঝেও আমি রসের সন্ধান পেয়েছিলাম।

এখানে সবচেয়ে অসুবিধা হল ভাষা। উত্তরভারতের কোন ভাষাই এরা জানে না। মনে হয় জানার চেষ্টাও করে না, বিশেষ করে হিন্দী ভাষা এই অঞ্চলে অপাংক্তেয় পারিয়া। তবে ইংরাজি জানা আছে বলেই মোটামুটি কাজ চালাতে পারছি।

বললাম, ভারতে, বহির্ভারতে মনোভাব আদান-প্রদানে ইংরাজি আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এখনও মোটামুটি ইংরেজি জানলে ভারত পরিভ্রমণে কোন অসুবিধা হয় না। হিন্দীর বদলে ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করলে যতটা সহজে সংহতি রক্ষা করা সম্ভব হত ঠিক সেই পরিমান কঠিন হয়েছে হিন্দীকে অহিন্দী ভাষীর ঘাড়ে কৌশলে অথবা চাপে রাষ্ট্রভাষা বলে প্রচার ও চালু করে অপচেষ্টায়। ইংরেজি হটাও, অথচ যারা এই নীতির সমর্থক তাঁরা তাদের সন্তানদের জন্য ইংরেজি শিক্ষার বিদ্যালয়ে অজস্র ব্যয় করে থাকে। আচ্ছা আপনিই বলুন, যখন নেলোর স্টেশনে গাড়ি দাঁড়িয়েছিল তখন তাকে চিনলেন কি করে ? ইংরেজিতে স্টেশনের নাম লেখা ছিল বলেই তো চিনতে পেরেছিলেন। আমরা হিন্দী জানি না, তেলেগু পড়তে পারি না। অর্থাৎ রাষ্ট্র ভাষা ও আঞ্চলিকভাষাও আমাদের বোধগম্য নয় বলেই ইংরাজি আমাদের

সাহায্য করেছিল। ইংরেজি হটিয়ে কি মহৎকার্য এরা সম্পূর্ণ করছে তা আমি বুঝি না।

আপনার যুক্তি একটা। পার্লমেন্টে সভাসমিতিতে প্রতিযোগিতায় পরীক্ষায় ইংরেজি অর্থাৎ রাজকার্যে ইংরেজি অপরিহার্য। মজার কথা হল, যারা ইংরেজি হটাতে চান তাঁরা সবাই ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত এবং তাঁদের সন্তানরা ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা নিচ্ছে। অর্থাৎ পরবর্তী কালে যারা ভারতের প্রশাসন দণ্ড হাতে তুলে নেবে তাদের বাছাই করা হচ্ছে ওদের ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে আর যারা শাসিত হবে তাদের জন্য যে সামান্য লেখা পড়ার ব্যবস্থা আছে তাতে ইংরেজি 'E' নিষিদ্ধ। বিচিত্র দেশ বিচিত্র ব্যবস্থা।

অবশ্যই, চাষার ছেলে, অন্ত্যজ শ্রেণীর ছেলে মন্ত্রীর গদীতে বসবে তাতো হতে পারে না, অর্থবান সমাজ শাসকদের সন্তানরাই ভবিষ্যতে যাতে মন্ত্রীর গদীতে বসতে পারে তারই পটভূমি তৈরি করছে সমাজে শ্রেণীবিভাগ বজায় রেখে। কটা বাজে নির্মলবাবু? নটা! এই তো সূর্যাস্ত হল ঘণ্টা দেড়েক আগে। ঠিকই তো, যত পশ্চিমে যাব ততই রাত হতে দেরি হবে, সকাল হতেও দেরি হবে। এখানে সকাল হবে সেই সাতটায়! ঘড়ির কাঁটা দিয়ে আহ্নিক গতিকে বাঁধা যায় না।

চলুন দেখে আসি খাবারের কি ব্যবস্থা হল।

দুজনেই উঠলাম।

নির্মলবাবু রন্ধনের তাগাদায় গেলেন আমি গেলাম প্রকৃতির তাগাদা মেটাতে।

আজ বের হবার তাগাদা কারও ছিল না।

সবাই গা এলিয়ে গল্পগুজবে মত্ত।

এমন সময় প্রবীন ভবতারণবাবু এসে বসলেন আমার বিছানায়।

প্রথমে জানতে চাইলেন, এরপর কোথায় যাওয়া হবে জানো কি?

বললাম, জানি না। নির্মলবাবু বোধহয় জানেন। আপনাদের কাছেও তো প্রোগ্রাম থাকা উচিত।

প্রোগ্রাম অনুসারে এরা চলছে না। কথা ছিল মহাবলীপুরম আর পক্ষী-তীর্থে যাওয়া হবে না। অথচ পণ্ডিচেরি যাবার আগেই ওই দুটো জায়গা ঘুরিয়ে আনল। ওটা ছিল তিরুপতি পথের তালিকায়।

ভালই তো হয়েছে।

তুমি কি গেছ সেখানে।

হ্যাঁ। ভারতবর্ষকে যারা দেখতে চান তাদের উত্তর ভারত দেখাই যথেষ্ট নয়, ভারতদর্শন তাতে অসম্পূর্ণ থাকে। মধ্য ভারতেও অজন্তা-ইলোরা যারা দেখেন না, দক্ষিণ ভারতে যারা মহাবলীপুরম, পক্ষীতীর্থ, রামেশ্বরম্ কন্যাকুমারী আর মাদুরাই দেখে না তাদের ভারতদর্শন যেমন অসম্পূর্ণ থাকে তেমনি ভারতের ঐতিহ্য, গৌরব বৈশিষ্ট্য কিছুই জানতে পারে না।

ভবতারণবাবু দেশ দেখতে আর তীর্থ করতে বেরিয়েছেন। ভারতের ঐতিহ্য বৈশিষ্ট্য এসব তাঁর কাছে অবাস্তব। আমার কাছ থেকে আরও কিছু শোনার আশায় আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটি মাত্র বিরাট পাথর।

পাথর নয় পাহাড় বলা যায়।

তারই গা খোদাই করে মহাবলীপুরমের সব মন্দির।

এই রকম সারি সারি মন্দির।

মন্দিরে কোন জোড়া পাথর নেই। শুধুমাত্র পাহাড় কেটে মন্দির ও গর্ভগৃহ, সিঁড়ি আর অলিন্দ যা কয়েকশত কারিগরের অক্লান্ত পরিশ্রম, সৌন্দর্য বোধ, প্রযুক্তির জ্ঞান এবং দক্ষতাপূর্ণ নিষ্ঠায় তৈরি হয়েছিল কোন চোল রাজার রাজত্বকালে। হয়ত বা শৈলেন্দ্র রাজবংশ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

মন্দিরগুলো পরিত্যক্ত। হয়ত কোন অশুভ কারণে আজ আর পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ শোনা যায় না, আর বাদ্য ধ্বনিও নেই।

নীরব নিস্তব্ধ পরিবেশ।

সামান্য কিছু দূরে বঙ্গোপসাগর। সাগরের বুক বেয়ে মিষ্টি হাওয়া এসে দেহ মনকে প্রফুল্ল করেছিল। গোটা চত্বরটা ঘুরতে ঘুরতে বেশ ক্লান্তি বোধ করছিলাম। একটা মন্দিরের সিঁড়িতে বসে অতীতের স্মৃতি মন্থন করছিলাম হঠাৎ চোখ পড়ল মন্দিরের দেওয়ালে। মহিষমর্দিনীর মূর্তি খোদাই করা রয়েছে দেওয়ালের গায়ে। বাংলার দুর্গোৎসব দেখেছি, দেখি এখনও। সেই মাতৃমূর্তি দেখলাম পাথরের গায়ে! একটা পাথর খোদাই করা মন্দিরের দেওয়ালে খোদাই করা মাতৃমূর্তি। কি এক অনির্বচনীয় সন্তোষ সঞ্চার করল আমার মনে।

ধীরে ধীরে উঠে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মন্দির দেখলাম, মনে মনে আউড়ে গেলাম দেবী বন্দনা।

দেবী পূজার চেয়ে যে ঋষিরা এই দেবী কল্পনা করেছিলেন তাঁদের প্রশংসা করছিলাম। ভয়ঙ্করী অথচ সাম্য সুন্দর এমন মাতৃমূর্তি পাথরের গায়ে যারা খোদাই করেছে তাদের প্রণতি জানালাম।

মুসলমান আক্রমণকারীর হাত থেকে এই মন্দিরগুলো যে রক্ষা পেয়েছে এটাই আশ্চর্য।

মালিক কাফুরের দল ধ্বংস করতে পারেনি দৈবী প্রভাবে অথবা গণ প্রতিরোধে তা এখনও স্থির হয়নি।

ভবতারণবাবু শুধু বলল, আমি দেখেছি কিন্তু তোমার মত করে দেখিনি।

বললাম, সবায় দৃষ্টিভঙ্গী তো এক নয় কাকাবাবু। একই জিনিষ দেখছে পথিকরা কিন্তু তাদের এক একেকজনের মনে ভিন্ন ভিন্ন রেখাপাত করছে।

তারপর ?

এটা আপনার কঠিন জিজ্ঞাসা। আগের কথা না বললে পরের কথা বলা যায় কাকাবাবু? আপনাকে বলতে হলে পিছিয়ে যেতে হয়।

পেছনের কথাই বল।

বলব। কিন্তু সে তো মহাভারত। একদিন অথবা একরাতেও শেষ হবে না। শোনার ধৈর্য দরকার। আপনি নিশ্চয়ই পক্ষীতীর্থের মন্দিরে উঠেছিলেন। সবাই বলে পাখীর দল একটা নির্দিষ্ট সময়ে সেখানে আসে কিন্তু দিনের পর দিন ধৈর্য সহকারে পাখীর প্রতীক্ষা করেও পাখীর সাক্ষাৎ পাইনি। সেখানে আমি ধৈর্যের পরীক্ষা দিলেও উদ্দেশ্য সফল হয়নি। আপনারও ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে, শেষ পর্যন্ত তার প্রাপ্তির ঘরে শূন্য লাভ ঘটবে।

তুমি তো মানুষ দেখতে বেরিয়েছ, ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে যা পেয়েছ তাই বল।

হ্যাঁ বলব। কিন্তু নতুনদির বড়ই আগ্রহ আমাকে জানার তাকে বাদ দিয়ে বলাটা উচিত হবে না কাকাবাবু। কাল পথ চলার সময়ে পথেই বলব। পথে দেখা, পরিচয়, পথেই তার সমাপ্তি ঘটাব।

বেশ তাই হবে। নয়নাদিদিকে ডেকে নেব।

বললাম, যথা ইচ্ছা।

নিজেকে নিজেই জিজ্ঞাসা করেছি এরা কেন আমাকে কেন্দ্র করে অনেক কিছু জানতে চায়।

আমার না আছে দেহের সৌন্দর্য, না আছে অর্থ বিত্ত সম্পদ, না আছে উচ্চ শিক্ষার ছাপ তবুও কিসের আকর্ষণে এরা আমাকে ব্যস্ত করে তুলছে, এর উত্তর আমি নিজেও খুঁজে পাইনি।

এর মাঝ দিয়ে অনিশ্চিত যাত্রা পথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট কথায় অনেক কথা বলতে হয়েছিল। ছুটকো কথায় শ্রোতারা খুব খুশি হতে পারেনি।

আমি বলতে থাকি ওরা শুনতে থাকে। বিরতি পথে। মাদ্রাজে ছাড়াছাড়ি হওয়া অবধি কেউ কোন মতামত দেয়নি। এটাই আমার পুরস্কার।

সরকারী চাকরি করতাম। সে সরকার ইংরেজ সরকার।

লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখে চাকরির চেষ্টায় নামতে হয়েছিল। ভারতবর্ষে ভগবান লাভ যত সহজ ততোধিক কঠিন চাকরি পাওয়া। স্বামী বিবেকানন্দের মত মহাপুরুষ পাঠ্য জীবন শেষ হওয়া মাত্র সাহেবদের দরজায় দরজায় চাকরির প্রত্যাশায় ঘুরে ঘুরে একটি করণিকের চাকরি জোটাতেও পারেননি, তবে চাকরি তিনি পেয়েছিলেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পাদদেশে বসে যে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তার অমৃত ফল আজও আমরা ভোজন করে নিজে, স্বজন পরিজন সবাই অপূর্ব আনন্দ লাভ করছি। সেদিন যদি নরেন্দ্রনাথ দত্ত করণিক হতেন তা হলে আমরা বিবেকানন্দকে নিশ্চয়ই পেতাম না। দক্ষিণেশ্বরের পূজারী রামকৃষ্ণদেবের চাকরি করেই তিনি বিবেকানন্দ হয়েছিলেন।

অনেক চেষ্টা করেও যখন কোন চাকরি পেলাম না তখন একজন উপদেশ দিলেন, ভিক্ষা করে চাকরি পাবি না, চাকরি আদায় করতে হবে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে।

পরীক্ষা দিয়ে। দেখবি পরীক্ষা দিতে দিতেই একটা না একটা চাকরি জুটেই যাবে।

বন্ধুর উপদেশ শিরোধার্য করে দিল্লী গিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল।

চাকরিও পেয়েছিলাম।

কপালে সহ্য হল না।

কপাল এমন একটা বস্তু যাকে বিশ্লেষণ করা যায় না অথচ কপালের অলিখিত নির্দেশ মানতে হয় রাজা-প্রজা সবাইকে। আমাকেও মানতে হয়েছিল। নিরুপায় মানুষ মুক্তির কোন পথ না পেলে যেমন নিজের হাতে কামড়ায়, আমিও হাত কামড়াতে বাধ্য হয়েছিলাম, তারপর—একদিন হাত কামড়াতে কামড়াতে বেরিয়ে পড়লাম পথে। অবশ্য পথে বের হতে বাধ্য হয়েছিলাম প্রশাসন ও পুলিশের তাড়নায়।

তারপর প্রায় গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিক্রমা শেষ করে সবে মাত্র স্থিতি লাভ করতে চেষ্টা করছি স্বদেশে। তাকিয়ে দেখলাম, স্বদেশও খণ্ডিত।

বলতে বলতে থেমে গিয়েছিলাম।

নতুনদিদি পেছনের সিটে বসে আমার কথাগুলো যেন গ্রাস করছিলেন, আমাকে থামতে দেখে বললেন, তারপর— ?

তারপর! নাটকীয় ভাবে বলতে হবে, সত্য সেলুকস বিচিত্র এই দেশ। ভেবে দেখলাম, ওপার এপার দুইবাংলাই তো আমার দেশ। এপার থেকে ওপারে পাড়ি জমিয়ে দেখতে হবে দেশ ভাগের পর কেমন আছে সেখানকার মানুষ। চেহারায় তো মানুষ, ভেতরটা কেমন তাই দেখব।

জানেন নতুনদি, মানুষ বাঁচতে চায়। বাঁচার মন্ত্র জানা থাকলে বাঁচার পথ তারা কখনই খুঁজত না। বাঁচাটা তো মানুষের মত বাঁচা, সেই বাঁচার রেস খেলতে মানুষ কত কি হারায় তা বলে শেষ করা যায় না।

একদিন চুপি চুপি নদী পেরিয়ে হাজির হয়েছিলাম ওপারে।

গ্রামের দোপায়া পথ ধরে চলেছি এমন সময় দেখা হল নিবারণ সরকারের সঙ্গে।

প্রথম প্রশ্ন, মহাশয়ের নিবাস ?

বললাম, হোগলবেড়িয়া।

কোন্ জিলা ?

বগুড়া।

বোগড়া! কোথায় মেলা করেছেন ?

গ্রামেই যাব, নিজের গ্রাম।

সে তো অনেক পথ। তিন দিন তো চলতে হবে।

তা হতে পারে।

আপনার আশ্রম ?

ঠিক বলতে পারব না। আপনি ?

নমঃ।

বললাম, নমস্কার। পূজ্যজন।

কি বলছেন মশায়। সবাই বলে ছোট জাত, চাঁড়াল।

তারা অন্যায় বলে। নমঃ যেমন মানুষ, বামুনও তেমন মানুষ। মানুষের কোন জাত-ধর্ম থাকে না। মুসলমান শাস্ত্র বলে, সব মানুষ মুসলমান হয়েই জন্মায় তবে পরিবেশ তাদের অমুসলমান করে। আমরাও মনে করি একই কথা। জন্মের পর সে কি হবে তা আমাদের বিধাতাও বোধহয় জানেন না। তবে মানুষ হবার পথ বন্ধ থাকে না।

নিবারণ সরকার প্রসঙ্গ বদলে প্রশ্ন করল, আপনি এলেন কি করে ?

হেসে বলেছিলাম, বর্মার মাটিতে পা দিয়ে দেশটাকে বিচিত্র মনে হয়েছিল। এই বৈচিত্র শেখাবার গুরুঠাকুর হলেন আমাদের ইংরেজ প্রশাসন। ইংরেজ যে দেশে গিয়েছে সেই দেশেই এই বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছি। দান করা পরমধর্ম, তাই পথ চলতে অনেক বার দান করতে হয়েছে, এই দানকে উৎকোচ বলে অনেকে দান ব্যবস্থাকে ছোট করে দেখে। দান গ্রহণকারীরা অবশ্যই কোন সময় দাতাদের প্রশংসা করে না, প্রাপ্যটা বুঝে নিয়েই তারা থেমে যায়। আমিও একজন দাতা। নিবারণ সরকার বোধহয় আমার কথা কিছুটা বুঝেছিল সেজন্য মাথা দোলাতে দোলাতে বলল, ঘুষ দিয়ে এপারে এসেছেন বুঝি। সাবধান মিঞারা জানতে পারলে আর রক্ষা নেই।

আছে। একই অস্ত্র দিয়ে আত্মরক্ষার পথ পাব। দানের মহিমা যারা জানে ও বোঝে তারা কখনও 'রা' কাড়ে না। এই দেখুন ওপাড়ে পাঁচটাকা, এপাড়ে পাঁচটাকা। অর্থাৎ আমরা যে কোন সময়ে দশটাকা দান করে দু-দেশের নাগরিক হতে পারি; কোন বাধা বিঘ্ন এলে আরও দশ টাকা।

বুঝলাম। এখানে আত্মীয় স্বজন কেউ আছে কি !

ছিল, তবে খুঁজে পাব কিনা জানি না।

তা হলে আমার বাড়ি চলুন। খোঁজ খবর করে দু-একদিনের মধ্যে তাদের কাছে যাবেন।

অবাক হয়ে নিবারণ সরকারের মুখের দিকে তাকালাম। আমার চাহনিতে অবিশ্বাসও ছিল। অজানা কোন পথিককে ঘরে ডেকে নিয়ে যাওয়া নিশ্চয়ই বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অবশ্য অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকলে তা সম্ভব। আমার মত নিঃস্ব ব্যক্তিকে ডেকে নিয়ে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন তো সম্ভব নয় তাই আমার ভীতিটা অমূলক। হয়ত নিরাশ্রয় অতিথিকে ঘরে ডেকে সেবা করে পুণ্য অর্জনটাই নিবারণ সরকারের মহৎ উদ্দেশ্য।

ভাবছিলাম দশটাকার গর্দান পাশপোর্ট যারা দেয় তারাই হল ভারত-

পাকিস্তান উভয় দেশের দ্বাররক্ষক। সততার আভিজাত্যের বিশেষ দাবীদার।

কি ভাবছেন ?

ভাবছি সীমান্তের রক্ষীদের কথা।

এ কোন নতুন ব্যাপার নয়। সীমান্তের উভয় দিকে ওদের জমিদারী। মালগুজারি নেই, ট্যাকস নেই, আয়কর নেই, সেস নেই, হিস্যা নেই, শুধু যে যার মত পকেট ভর্তি করছে, লুঠের রাজত্ব রক্ষা করছে, লুটের তলা দিয়ে হরেক পাপ পাচার হচ্ছে। অলিখিত আইনে, যে যেমন সুযোগ পাচ্ছে সে তেমন সদ্-ব্যবহার করছে। কাউকেই কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। এ এক মজার দেশ, শুধু একে উপভোগ করতে হয় দূরে দাঁড়িয়ে। আপনি ঘাবড়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

ঘাবড়াই নি, প্রাণটা শীতল হল সততাধর্মীদের কথা শুনে। এখানে একটা নোকরি মানে চাকরি কি করে পাওয়া যায় বলুন তো, মাসিক বেতন দিতে হবে না, বেতনটা চিরকাল প্রাপ্য হবে চাকরিদাতা মহান ব্যক্তিটির।

একটা কথা বলব।

বলুন।

আপনার তো বিবি-বাচ্চা আছে। চলে আসুন এদেশে।

আমি উল্টে প্রশ্ন করলাম, আপনি ওদেশে না গিয়ে এদেশে কেন আছেন ?

সেটাই তো আসল কথা। জমি। জমি আমার মা। মাকে ছেড়ে যাব কেমন করে। ভাতের অভাব তো নেই। এই তো সেদিন রাখহরি ওপার থেকে এসে বলল, নিবারণ তোর কথাই ঠিক। যারা এপার থেকে গেছে তারা কুকুর বেড়ালের মত মাঠে-ঘাটে, রেল স্টেশনে না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে পড়ে আছে। যাই হোক দুটো এখানে তো খেতে পাব।

কতদিন ? হিন্দুর জমি বরবাদ হয়ে যাবে নিবারণবাবু।

তাতেই বা কি। আমাদের অখিলবাবু তো আমানত আলি হয়ে দিব্য আছে। আমরাও থাকব। ধর্ম চেপে ধরে তো পেট শুকোতে পারব না। তার চেয়ে পেটে খেয়ে যে কোন ধর্ম আশ্রয় করে বাঁচব তো।

তা বটে। মানুষ সেই আদিম যুগ থেকে বাঁচার জন্য কত কি যে করেছে তার ঠিকানা নেই। আমি ও আপনি অন্যের চেয়ে নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। সব ভালবাসা মিইয়ে যাবে পেটে ভাত না থাকলে! চলুন কোথায় নিয়ে যাবেন।

নিবারণ সরকার আমাকে প্রায় বেহেস্তের দরজায় পেঁছার ব্যবস্থা করেছিল।

বলতে বলতে থেমে গেলাম।

নতুনদিদি বললেন, থামলে কেন ভাই ?

দ্রুতগতি বাসটা হঠাৎ ব্রেক করে গতি বন্ধ করল।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে মাথায় মাথা ঠুকে গেল।

বললাম, থামিনি। কিন্তু ভেবে ঠিক করতে পারছি না, এসব শুনিয়ে

কি হবে।

আবার গিয়ার টেনে গাড়ির গতি বৃদ্ধি পেল।

বললাম, আমার গতি থেমেছিল, এবার গাড়ির গতির সঙ্গে আমার গতিও বৃদ্ধি পাবে।

নির্মলবাবু পেছন থেকে হাসলেন। বললেন, আপনার তো সৌভাগ্য যে সে দেশে যেতে পেরেছিলেন।

সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না। কেন গিয়েছিলাম তার যুক্তিযুক্ত উত্তর আজও খুঁজে পাইনি। ওরা কেন যে এমন সুন্দর দেশটাকে টুকরো টুকরো করল তাও ভেবে পাইনি। এদেশে কি নেই। উত্তর থেকে দক্ষিণ,পূর্ব থেকে পশ্চিম তো মানুষের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র ছিল। কোন দিন কোন সময় মনে হয়নি বেলুচিস্তানের বালুকাময় প্রান্তর আমার দেশ নয় আবার কখনও মনে হয়নি ওপারের মাটির সঙ্গে এ পারের মাটির গন্ধ আলাদা।

আবার আমি থেমে গেলাম।

নির্মলবাবুর পাশে প্রবীন ভবতারণবাবু বসে ছিলেন, তিনি বললেন, আবার এক হয়ে যাবে অদূর ভবিষ্যতে।

হাসলাম। আমাদের কোন ভবিষ্যত নেই। সব লাল হো জায়গা বলার মত বুকের জোর আর নেই। তবে পরিবেশ ও পরিস্থিতি বদল হবে, সময় সাপেক্ষ।

দেখতে দেখতে বিকেল পেরিয়ে গেল।

গাড়ি এসে দাঁড়াল একটা লজের সামনে। এখানেই রাত্রিবাস। আগামী কাল মহীশূর দর্শণ, সবচেয়ে আকর্ষণীয় বস্তু হল মহীশূর প্রাসাদ, বৃন্দাবন উদ্যান ও চামুণ্ডা মন্দির। তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যায় সরকারী উদ্যানগুলো।

বাস থেকে নেমে যে যার মত আবার আস্তানা করে নিতে হল।

এই রকম আশ্রয় গড়ে নিতে হয়েছে অনেকবার পথ পরিক্রমায়। সর্বত্রই অজানিত মানুষের করুণায় আবার কখনও তাদের অনিচ্ছায়।

এই তো সেদিনের কথা।

বাংলার একটি গ্রামে গিয়ে হাজির হলাম নতুন স্বাধীন পাকিস্তানের চেহারা দেখতে। ওরা কি সত্যিই সুখে আছে আমাদের তাড়িয়ে দিয়ে সেটাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও নিঃস্ব মানুষ তার মনোভাব যেমন সহজে ব্যক্ত করে না, তেমনি আমিও মোটামুটি মুখ বুঁজে দেখে চলেছিলাম।

এবার আশ্রয়দাতা ইমান আলি!

কতটা ইমানদার তা অঙ্ক কষে দেখতে হয়েছে পরবর্তীকাল।

আশ্রয়দাতা বলেন, সব দেখলেন তো বড়ে মিঞা।

মিঞা। কোনকালে ছিলাম না কিন্তু কথার মাঝ দিয়ে বেশ আন্তরিকতা ছিল তাই চুপ করে তার কথা শুনলাম।

ইমান আলি যখন শুনল গর্দান পাশপোর্ট সম্বল করে এসেছি তখন

উত্তেজিতভাবে বলল। ভাল করেননি। তোবা, তোবা, ঘুষ খাওয়া হারাম। ঘুষের চাকরি দিতে পারি আপনাকে। কিন্তু পারবেন না ও কাজ করতে। আমিও দিতে পারব না। পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়ি, রোজা করি, জাকাত দেই, সুদ নেই না, আল্লার কসম পরনারীর মুখের দিকে তাকাই না। আপনি যদি থাকতে চান তা হলে জমিন দিচ্ছি। হাল বলদ দিচ্ছি করে কম্মে খান।

বললাম। জমীন তো দখলী।

মানে, আমি নগদ কড়ি দিয়ে কিনেছি। তা বলে আপনাকে দাম দিতে হবে না।

বললাম, চাষ জানি না। চাষার কাম না জায়েজ।

হো-হো করে হেসে ইমান আলি বলল; আপশোষ করতে হবে মিঞাভাই। চাষাই হল দুনিয়ার মালিক। পেটে দানা না থাকলে কেতাব পড়া মিথ্যে হবে। জানেন তো উজীর-আমীর ওমরাহ হতে হলেও জমীন থেকে যাবে।

আমিও হেসে বললাম, থাকে না ইমানভাই। হাত বদল হয়। যেমন হিন্দুর জমি হাত বদল হয়ে আপনার হয়েছে। ওটা কোন পাকা কথা নয় ইমানভাই।

আপনার কথা শুনে নিজের কথা ভুলেই যাচ্ছি।

অনেকক্ষণ দুজনে চুপ করে বসে রইলাম।

ইমান আলি ছাঁচা বেড়ার ঘরের দেওয়ালে একটা টিকটিকি পোকা ধরে ধরে খাচ্ছিল। সে দিকেই চোখ রেখে ভাবছিলাম। কি ভাবছিলাম?

ইমান আলি জিজ্ঞাসা করল, কি ভাবছেন?

বললাম, তাজমহল।

বাদশাহ শাহাজাহানের তাজমহল।

হাঁ। ভাবছিলাম, এত করেও আমরা বাদশাহের শেষ জোলুষটুকুও বুকের সঙ্গে আঁকড়ে ধরে চলতে পারিনি। ওটা আমাদের। আমরা ভাইয়ের মাথা কেটে ওটাকে পর করে দেব না এ কথা বলতে পারিনি।

ইমান আলি কপালে হাত দিয়ে বলল, নসীব। নসীব।

আমাদের দার্শনিক আলোচনায় বাধা পড়ল। ইমান আলির স্ত্রী চা আর ডিম ভাজা এনে সামনে রাখতেই ইমান আলি বলল, আপনার ভাবী।

ভাবীসাহেবা মাথার ঘোমটা বড় করে টেনে ফিক্ করে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল। আমার সেলাম জানাবার ইচ্ছা থাকলেও তা বলতে পারিনি। বলার আগেই নিষ্ক্রান্ত।

ইমান আলি বলল, বলুন তো ঠকেছি কি না?

কি বিষয়ে?

আপনার ভাবীকে লাভ করে। খুপ্ সুরতই নয়, মহব্বতে দিল দরিয়া সত্যি বলতে কি, হিন্দু ঘরের মেয়ে যা করে, যদি চাষার ঘরের মেয়ে হত তা হলে এমন সেবা পেতাম কি?

বাধা দিয়ে বললাম, বাংলাদেশের শতকরা নব্বইজন মুসলমানই হিন্দুর

বংশধর। হিন্দুর মেয়ে বউ হলে লাভ বিনা লোকসান কম হবে।

লেখাপড়া জানা তাজী মেয়ে, কোরাণ পড়তে শেখেনি।

বললাম যার শেষ ভাল তার সব ভাল।

মানে ?

মানে। তালাক আর সতীন নিয়ে ঘর করতে না হলে অবশ্যই প্রশংসা পাবে।

আমাদের সমাজ হল পুরুষতান্ত্রিক। মেয়েদের আমরা ঠিক মর্যাদা দিতে পারব কি। তোবা, তোবা। ওকথা বলবেন না মিঞাভাই। তিরিশ হাজার টাকা মোহর আর তিরিশ বিঘা জমীন।

ভাবীসাহেবা বুদ্ধিমতী।

তা বলতে পারেন, চামেলীবিবি গোছালো মেয়ে।

ইমান আলি আর চামেলি বিবির কথা ভাবতে ভাবতে ঝিমিয়ে পড়েছিলাম। নতুনদিদির ডাকে ঝিমুনি কেটে গেল।

চল ভাই ভোজন পর্বটা শেষ করে আসি।

পরের দিন সকালে যেতে হল মহীশূরের রাজপ্রাসাদে।

ইতিহাসের পাতায় মহীশূরের বিশেষ স্থান রয়েছে।

হিন্দুরাজার সেনাপতি হায়দার আলি রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। প্রভুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা ভারতীয় জীবনের একটি কলঙ্কময় বৈশিষ্ট্য। আলিবর্দী তার প্রভু সরফরাজ খাঁকে গদীচ্যুত করে বাংলার নবাব হয়েছিলেন। কুখ্যাত মীর জাফর আলি খাঁ সিরাজদৌল্লাকে ইংরেজ বানিয়ার সাহায্যে কোতল করে গদী দখল করেছিল। এটা হল ধারাবাহিক বৈশিষ্ট্য কিন্তু পরিণতি কোন ক্ষেত্রেই শুভদায়ক হয়নি। সমর প্রতিভা সম্পন্ন শাসকের কৃতিত্ব নিয়েও হায়দার আলি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যতটা গৌরবের স্থান দখল করেছিল তার চেয়ে বেশি গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁর পুত্র টিপু সুলতান।

টিপুর তেজস্বিতা, দেশপ্রেম, প্রজানুরঞ্জন ইতিহাসকে প্রোজ্জ্বল করে রেখেছে।

শ্রী রঙ্গপত্তনম দুর্গে মহীশূরের শেষ যুদ্ধে টিপুর নিধন ঘটলে ইংরেজ সরকার মহীশূরকে চারটি ভাগে বিভক্ত করে কিছুটা মারাঠাদের হাতে তুলে দেয়। কিছুটা দেয় হায়দ্রাবাদের নিজামের হাতে। কিছুটা নিজের তাঁবেতে রেখে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মহীশূরের পূর্বতন হিন্দু রাজার বংশধরদের অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিতে ফিরিয়ে দেয়। এই শেষের অংশই পরবর্তী কালে মহীশূররাজ্য নামে পরিচিত হয়।

এই হিন্দুরাজাদের প্রাসাদই বর্তমান মহীশূর রাজপ্রাসাদ।

থেনানরুমের সামনে দাঁড়িয়ে নতুনদি বললেন, সিংহাসনটা ভাল করে দেখ ভাই।

দূর থেকে যতটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা যায় দেখলাম।

কি দেখলে ? নতুনদির জিজ্ঞাসা।

বললাম, উত্তরটা আপনার অভিরুচিমত হবে না নতুনদি।

নতুনদি বললেন, এমন তো হতে পারে তুমিও যা ভাবছ আমিও তাই ভাবছি।

বললাম, এক টন সোনা দিয়ে তৈরি এই সিংহাসন। যে দেশে এক গ্রাম সোনার দাম চার হাজার টাকা সে দেশে এক টন সোনার দাম কত ? অঙ্কের হিসাব মেলাতে এক দিস্তা কাগজও বোধহয় কম। কিন্তু।

কিন্তু কি ?

এত টাকা কে দিল রাজাকে ?

এই প্রশ্ন তো আমার মনেও।

বললাম, শোষণ, এই সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থের জোগনদার চিরকালই সমাজের নিচের শ্রেণীর মানুষরা। ইংরেজ প্রত্যক্ষ শাসন ব্যবস্থা না করে মধ্যসত্ত্বভোগীদের জন্য শোষণের ঢালাও ব্যবস্থা আইনসম্মত করে ছিল তারই পরিণতি।

থমকে গিয়ে নতুনদিদি বলল, শুনতে পাচ্ছ ভাই !

না তো।

তুমি কি বধির। আমি শুনতে পাচ্ছি। দেখতেও পাচ্ছি। ওই বিরাট প্রাচীর ঘেরা আঙ্গিনার ওপারে হাজার হাজার মানুষ হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে প্রাসাদের মূল দেউড়িতে, তাদের কণ্ঠ থেকে বের হচ্ছে আকুল ক্রন্দনের সুর। বুক ফাটা ওই কান্নার শব্দ স্পর্শ করছে না তাদের ভাগ্য বিধাতা ইংরেজের আশ্রিত দেশীয় মহারাজার হৃদয়ে। তাকিয়ে দেখ ভাই, রাজার পুলিশ ও সৈন্য তাদের গতিরোধ করছে, চলছে তাণ্ডব বুভুক্ষু প্রজারা যাতে মহারাজার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে তার জন্য বেপরোয়া অস্ত্র ব্যবহার করছে, অর্ধাহারী নিরস্ত্র লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত মানুষরা আজ জানতে চায় কোন অধিকারে একজন ব্যক্তি আর তার পারিষদরা সৌভাগ্যের অধিকারী হয়ে বঞ্চনা করছে লক্ষ লক্ষ লোককে। রাজার বিলাস বৈভবের রসদ যারা জোগায় তাদের সামান্য প্রার্থনাকে পূর্ণ করার কোন চেষ্টা না করে তাদের শোনিতে কেন ভূমি রঞ্জিত হচ্ছে।

কি বলছেন নতুনদি ?

যা বলছি তা কাল্পনিক নয় ভাই। এটাই বাস্তব যা ঘটেছে তারই জলন্ত প্রতিছবি আমি দেখছি আমার মনোমুকুরে, তাদের আর্তনাদ ও অশ্রু আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ভেসে উঠছে। তোমার কাছে নতুন মনে হবে ভাই কিন্তু ভারতের ছোট বড় প্রায় সাড়ে ছয়শত দেশীয় রাজ্যে এই একই ঘটনা ঘটেছে প্রায় দেড়শতাব্দী ধরে। ওদের বিচ্ছিন্ন করে রাখা হচ্ছিল আমাদের কাছ থেকে, তাই আমরাও জানতে পারিনি ওদের ব্যথা বেদনার কাহিনী। আমরা কখনও ভাববার অবসর পাইনি দেশীয় রাজ্যের মানুষ আর আমরা একই রক্তের একই চিন্তার উত্তরাধিকারী।

থামল নতুনদি।

আমি দেখছিলাম এই বিশাল প্রাসাদের বহু দরজা জানালা সোনা আর রুপো দিয়ে তৈরি। ভাবছিলাম এত সোনা রুপোর মালিক যে রাজা সে রাজার রাজ্যে প্রজারা কেন দুর্ভাগ্যের শিকার হবে, কেনই তারা বিক্ষোভে ফেটে পড়বে। ইংরেজ আশ্রিত এই সব রাজ্যের রাজাদের অপকাজের জন্য কোথাও এদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। অথচ একদিন আমার মত অপমানিত লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত মানুষকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল জন্মগত স্বাধীনতা লাভের দাবীকে অপরাধ স্থির করে।

ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠলাম।

ডাকলাম, নতুনদি।

নতুনদি এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে একপাশে টেনে নিয়ে বলল, এখানে আমরা বসি। দেশ বিদেশ থেকে যে সব পরিব্রাজক আসে তারা রাজা মহারাজার সম্পদ দেখে পুলকিত হয় কখনও কি তারা ভেবে দেখে, এই বৈভবের পেছনে কত লক্ষ নর-নারীর চোখের জল বইছে। অবমানিত রয়েছে মানবাত্মা।

চলুন দিদি, আমাদের গাড়ি ছাড়বার সময় হয়েছে।

চল।

বিকেলের পড়ন্ত বেলায় ফিরে এলাম সামরিক আস্তানায়।

রাতের খাবার শেষ হতেই বাইরের ফুটপাতে একটা মাদুর আর বালিশ নিয়ে শুয়ে পড়লাম। সে দিনটা ছিল প্রচণ্ড গরমের দিন। বাইরে শুয়ে মোটামুটি সুস্থ বোধ করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

মাঝরাতে স্বপ্ন দেখে উঠে বসলাম।

স্বপ্ন? হাঁ স্বপ্ন বই কি। নইলে কি করে আমি পেঁছে গিয়েছিলাম ফতেপুর সিক্রির দুর্গে।

কে যেন আমার হাত ধরে হাজির করল ভারতের একছত্রপতি সম্রাট আকবরের দরবারে।

কুর্ণিশ করতে করতে এগিয়ে বাদশাহের সামনে দাঁড়াতেই আকবর জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখছ বান্দা।

জনাবে আলি, দেখছি শুধু চূর্ণিত দম্ভের শেষ চিহ্ন।

আর কিছু দেখছ না?

দেখছি। মানব প্রেমিক একজন মহামতিকে। রক্তপাত ঘটিয়ে সাম্রাজ্য গড়ে তুললেও তাঁর হৃদয়ে করুণা রসের কোন অভাব নেই। নিরক্ষর হলেও সংস্কৃতি কৃষ্টির প্রতি অপরিসীম প্রেম। আর দেখলাম অদ্ভুত দৃশ্য, মুসলমান হারেমে হিন্দু স্ত্রীর জন্য হিন্দু পুজো-পার্বনের ব্যবস্থা যা বাদশাহকে মহান করেছিল।

আরও কিছু দেখতে চাও তো চলে যাও আমার আগ্রাদুর্গে। দেখবে জানবে অনেক কিছু যা ইতিহাসের পাতায় কেউ লিখে রেখে যায় নি।

জনাবে আলি, আপনার দরবারে কিছু আর্জি আছে।

বলতে পার, তবে এখন নয়। আমার নবরত্ন সভায় মিঞা তানসেন সেলাম দিয়েছে। তুমিও বস। আজ গুনে যাও বেহেস্তের গজল। এ সুর এ তাল, এ সঙ্গীত তোমার জীবনে শুনতে পাবে না।

হুজুরের অশেষ কৃপা। কিন্তু মরুভূমির এই জনহীন প্রান্তরে আপনার এই রাজধানী কেন স্থাপন করেছিলেন, বিশেষ করে এখানে পানীয় জলের তো ভয়ঙ্কর অভাব। রাজধানী ত রাজাকে নিয়ে গড়ে ওঠে না, প্রজারাও থাকে, তাদের জন্য কোন সুবিধা তো এখানে নেই যাতে রাজধানী স্থায়ী হয়।

ঠিকই বলেছ বান্দা। রাজধানী এখানে স্থায়ী হয়নি। সামনের ওই যে ময়দান দেখছ ওটা হল খানুয়ার মাঠ, ওই মাঠেই চিতোর পতি সংগ্রাম সিংহের সঙ্গে আমার ঠাকুর্দা বাবরের লড়াই হয়েছিল। সেদিক থেকে এই স্থানটি হয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যতদিন রাজপুতদের দমন করতে পারিনি আর আফগানদের শায়েস্তা করা যায়নি ততদিন এখানে থাকতে হয়েছিল, দেখছ কি আমার অশ্বশালা ও উটবাহিনীর ধ্বংসাবশেষ? আমি কয়েক শত অশ্ব আর উট নিয়ে ওদের শায়েস্তা করতে আগ্রা আর রাজপুতানার মরুভূমির মধ্যস্থলে এই রাজধানী করেছিলাম।

কুর্নিশ করতে করতে ফিরে এসেছিলাম দুর্গের বাহিরে। সেখান থেকে সোজাপথ ধরলাম আগ্রা দুর্গের দিকে। আশ্চর্য হয়ে দেখেছিলাম কোটি কোটি টন মাটি স্তূপাকার করে যেমন সমতল ভূমির ওপর ফতেপুর সিক্রির দুর্গ গড়েছিলেন মহামতি আকবর একইভাবে কোটি কোটি টন মাটির স্তূপে নির্মান করেছিলেন আগ্রার দুর্গ। তৎকালীন রণকৌশলের দিক থেকে দুটোই ছিল দুর্ভেদ্য।

ফিরতি পথ ধরবার আগেই চিৎকার করে উঠেছিলাম, জনাবে আলি, আপনার মত এমন মহান নরপতি ভারত শাসন খুব কমই করেছে। আপনি সন্তান লাভের আশায় পীর সেলিম চিস্তির দ্বারস্থ হয়ে সন্তান লাভ করেছিলেন তার নামও রেখেছিলেন সেলিম, সেই পীরের মাজারের প্রবেশ পথে গড়েছিলেন বুলন্দ দরওয়াজা (শ্রেষ্ঠ দরওয়াজা)। কিন্তু আপনার সন্তান সেলিমকে ব্যর্থতার আগুনে কেন নিক্ষেপ করেছিলেন।

বাদশাহ রুমাল বের করে মুখ মুছলেন।

কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি ভারত সম্রাট? একটি যুবতী সুন্দরী ও পুত্র সেলিমের প্রণয়িণী আনারকলির কান্নার শব্দ শুনতে পাচ্ছেন কি সারা জহাঁকে গীর। কেন, কেন, যৌবনের কণ্ঠস্বর চিরকালের মত স্তব্ধ করেছিলেন লাহোর দুর্গের স্তম্ভের মধ্যে জীবন্ত কবর দিয়েছিলেন। শাহানশাহ জবাব দিল?

আমার চিৎকার শুনে নতুনদিদি আর নির্মলবাবু ছুটে এসে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। আমি পাশ ফিরে শুতেই নির্মলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কেন চিৎকার করছিলেন?

চিৎকার! তাই তো ঘুমের ঘোরে চিৎকার হয়ত করেছি।

কি স্বপ্ন দেখছিলে ভাই ? —নতুনদির সাদর প্রশ্ন।

না কিছু না। ফিরে গিয়েছিলাম পাঁচশত বছর পেছনে। ইতিহাসের আস্তাকুঁড় থেকে হীরক আবিষ্কার করছিলাম দিদি। ও মা, সকাল হয়ে গেছে।

এতক্ষণে হুঁস হল। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বের হতে হবে বৃন্দাবন গার্ডেন দেখতে।

নির্মলবাবু বললেন, বৃন্দাবন গার্ডেনে যাব বিকেলবেলায়। রঙীন ফোয়ারা আর রঙীন জলের নর্তন দিনের আলোতে দেখা যাবেনা। রাতের অন্ধকার নামলে দেখা যাবে।

সারাদিন হাতীর দাঁতের কাজ, চন্দন কাঠের নানা আসবাব ও রেশম কারখানা দেখে ও কিছু সওদা করে কেটে গেল। বিকেলে বৃন্দাবন বাগানে যাবার প্রোগ্রাম। সেজন্য অলস মধ্যাহ্নটা গড়িয়ে গড়িয়ে কেটে গেল।

বিকেলবেলায় বাসে পাশাপাশি বসে চলেছি বৃন্দাবন গার্ডেনে।

রাস্তায় নতুনদিদি বললেন, শেষ রাতে কি স্বপ্ন দেখেছিলে ভাই ?

কাল রাতে প্রায় পাঁচ শত বছর আগের জমানায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। সরাসরি মোগলে আজম বাদশাহ আকবরের নবরত্ন সভায়।

তারপর ?

তারপর মিঞা তানসেনের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শোনার পর প্রেস কনফারেন্সের মত বাদশাহের সঙ্গে কথোপকথন। প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর। বেশ লাগছিল, কিন্তু আনারকলিকে জীবন্ত দেওয়ালে কেন গেঁথে হত্যা করা হয়েছিল তার জবাব বাদশাহ দিতে পারেননি। আজও লাহোর দুর্গের চত্বরে ব্যর্থ জীবনের ক্রন্দন শোনা যায় নতুনদি। সামান্য ঘরের মেয়ে বাদশাহজাদার প্রণয়ী হবে এটা সহ্য করতে পারেনি মহামতি আকবর। উত্তর দিতে পারেননি কিন্তু।

নতুনদি হঠাৎ বললেন, তুমি বোধহয় কবিতা লেখ।

আপনি মনে করছেন কবির কল্পনা স্বপ্নের মাঝে রূপ পেয়েছে। না, নতুনদি। মহীশূর রাজপ্রাসাদের সামনে যে কথাটা বারবার মনে হয়েছে তা হল শোষক কখনও শোষিতের মর্মবেদনা জানার চেষ্টা করে না। আবার সুন্দর গড়তে গিয়ে কত মানবীয় সৌন্দর্য ধ্বংস করেছে তার ইয়ত্তা নেই। ভেবেছিলাম, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম, বোধহয় আমার অর্ধসুপ্ত মনের তলা থেকে ভেসে উঠেছিল আনারকলির করুণ মুখখানা। যার চাহনিতে ছিল শেষ-বারের মত সেলিমকে দেখার প্রচণ্ড আকাঙ্খা। যুগল মিলনে যারা অন্তরায় তারা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ কখনও করতে পারে না নতুনদি। বাদশাহ আকবর যথাযথ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তাঁর সাম্রাজ্য পরিচালনায়, জীবন ধর্মে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেননি।

অবাক হয়ে নতুনদি বললেন, এতো নতুন কথা শোনালে তুমি।

পুরানো কথা নতুন করে বলছি। আকবর যদি সত্যিই জীবনধর্মে সফল হতেন তা হলে তার অতি আদরের সোলম তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করতে অস্ত্রধারণ

করত না। ঘটনা আকিঞ্চিৎকর কিন্তু এমন দুর্ভোগ ঘটত কি কখনও। জীবন ধর্মে অসফল বাদশাহ আকবর মাথা নিচু করতেন না কখনও এমন কি অন্ধ স্নেহও তাঁর গরিমা ম্লান করতে পারত না।

হঠাৎ গাড়িটা ক্যাচ করে ব্রেক করতেই বাধা পড়ল আমাদের আলোচনায়।

ড্রাইভার ইঙ্গিত দিলেন, সামনেই বৃন্দাবন গার্ডেন।

সূর্য তখন কাবেরী নদীর বাঁধের ওপাশে সবে মুখ লুকাতে আরম্ভ করছে।

মহীশূর খুবই রুক্ষ দেশ। বহু স্থানই অনুর্বর ছিল। হায়দার আলির রাজত্বকালে এই অনুর্বরতা হ্রাসের জন্য অনেক খাল কাটার রাজকীয় ব্যবস্থা হয়েছিল, হায়দার আলি এই মহান কার্যকে ত্বরান্বিত করতে না পারলেও তাঁর উপযুক্ত পুত্র টিপু সুলতান সেচ ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চাষী প্রজাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য প্রয়োজনের তুলনায় তা খুব বেশি নয়। মহীশূরের পুরাতন রাজবংশ যখন নতুন করে সিংহাসনে বসলেন তখন তাঁদের উপযুক্ত প্রধানমন্ত্রী ও দেওয়ানরা প্রজাদের দুঃখ মোচনে আগ্রহী হলেন। তাঁরাই কাবেরী নদীতে বাঁধ দিয়ে যে জলধারা তৈরি করেছিলেন তার পাশেই রাজকীর ইচ্ছায় বিলাস বহুল বৃন্দাবন উদ্যান নির্মান করেছিলেন মহীশূরের রাজারা। বাঁধ তৈরিতে মন্ত্রীদের কৃতিত্ব বেশি তার মধ্যে মির্জা ইসমাইল সর্বাগ্রগণ্য আর বাগান তৈরিতে মদৎ দিয়েছেন চামরাজারা।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বৃন্দাবন উদ্যান মহীশূরের রাজবংশের অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টির অবদান যা বহু যুগ ধরে গৌরব পতাকা বহন করবে। আমার সঙ্গী সাথীরা প্রায় সকলেই দক্ষিণ ভারতে নবাগত। বরং অতি অল্প সংখ্যকই তীর্থ ধর্মের মন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েছেন, সবাই বেরিয়েছেন গোটা ভারতের অবজ্ঞাত অবহেলিত অংশকে দেখতে, জানতে এবং ভারতের অখণ্ডতার মাঝে যে গৌরব তা উপলব্ধি করতে।

স্বপ্নের বাদশাহ আগ্রার পথ নির্দেশ করেছিল।

আগ্রা তো অনেক দূর।

সবাই বলে, প্রেমের তীর্থক্ষেত্র আগ্রা।

আদর্শ পত্নী প্রেমিক শাহাজাহানের অক্ষয় কীর্তি তাজমহল।

আগ্রা পৌঁছাতে পারিনি বহুকাল।

বার বার ভেবেছি, পত্নী প্রেম না পতি প্রেম, কোনটা স্মরণীয় ও বরণীয়। অনেক কাল পরে বুঝেছি, প্রেম এই শব্দটা নিছক কথার কথা। পতি ও পত্নীর মাঝে কোন প্রেমই কামগন্ধহীন নয়, বলা যায় প্রেম হল আপেক্ষিক শব্দ। প্রেমের মাধুর্য পরখ করা যায় পরকীয়া প্রেমে, বহু পত্নীক শ্রীকৃষ্ণের পত্নী প্রেম তো সন্দেহাতীত নয়, বরং রাধার সঙ্গে তাঁর প্রেমলীলা ছিল প্রেমের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রামের আশায়

একটু ছায়া শীতল পাথরকে আড়াল করে বসেছিলাম তখন গাইড মিঞা অনবরত দুর্বোধ্য উর্দুতে মোগল রাজকাহিনী বলে চলছিল, দু'চার কথার অর্থ না বুঝতে পারছিলাম এমন নয় কিন্তু আগ্রার দুর্গের যিনি প্রাণ পুরুষ ছিলেন সেই আকবর বাদশাহকে বাদ দিয়ে যখন শাহজাহানের স্তুতি শোনাতে আরম্ভ করল তখন তাকে বাধা দিয়ে যখন বললাম, এক দরজা যে সব ঘরের সামনে আজও অকেজো হয়ে রয়েছে, সেগুলোর কোন প্রয়োজন কি ছিল সে সময়।

গাইড মিঞা কপালে চোখ তুলে যা বলল তার অর্থ এই ঘরগুলোতে বাস করতেন বাদশাহ শাহজাহানের বাঁদিরা।

শুনেছি বাদশাহী মহলে অন্য পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ছিল।

তা ঠিক কিন্তু এরা সবাই বাদশাহের সেবাদাসী ছিলেন ওদের বলা হত জারিয়া।

আর দরকার ছিল না জানার।

উঠে পড়লাম। যেখান থেকে বন্দী জীবনে শাহজাহান চবুতরায় বসে তাজমহল দেখতেন সেখানে গিয়ে পা-মুড়ে বসলাম অনেকটা বাদশাহী কায়দায়।

শ্বেতপাথরের সেই বাঁধানো চবুতরায় বসে মনে হয়েছিল, শাহজাহান ছিলেন সৌন্দর্য পিপাসু। প্রেম পিপাসু নন। বাদশাহ ছিলেন সৌন্দর্যকে নিংড়ে নেবার যাদুকর। পনের ষোলটি সন্তানের জননী মমতাজকে ভালবাসতেন ঠিকই কিন্তু নিখুঁত ছিল না তাঁর প্রেম। জারজ সন্তানরা যাতে কোন দাবী জানাতে না পারে তার জন্যই নিষ্ঠা ছিল একটি স্ত্রীর ওপর। এর অর্থ এটা নয় যে শাহজাহান প্রেমিক শ্রেষ্ঠ।

মীনা বাজারে যারা ভিড় করত তারা সাধারণ ঘরের মেয়ে নয়। তারা আমীর ওমরাহদের ঘরের মেয়ে ও বউ। মেয়েরা নাবালিকা হলেও বউরা ছিল সাবালিকা। মীনা বাজারে বাদশাহ ছিলেন একমাত্র ক্রেতা এবং একমাত্র পুরুষ যাঁর ছিল অবাধ পরিক্রমার অধিকার সেই সুন্দরীদের রাজ্যে। রূপ পিপাসু শাহাজাহান এখান থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর ভাবী সম্রাজ্ঞী মমতাজকে। রূপের বাজারে বাদশাহ বেসাতি করেছিলেন অপরূপা মমতাজকে। দর্শনেই প্রেম একথা অবিশ্বাস্য তবে তাতে জন্মায় আবেগ ও পরিতৃপ্তির আকাঙ্খা। একদিন তাঁর মনোমত ও মনোনীত যুবতীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাদশাহ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। যৌন ক্ষুধা ও চুক্তি এ দুটোই নিল মুখ্যস্থান। তবে বাদশাহ মমতাজকে ভালবাসতেন। বহুদিন একত্র বসবাস করার ফলে যেমন মমতা জন্মায়, পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তার কোন কমতি ছিল না।

এটাই বাস্তব জীবনে যাচাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন ইমান আলির স্ত্রী চামেলি বিবি। তাকে শাহজাহানের অনিন্দ্যনীয় প্রেম ও নিষ্ঠার কথা বলতেই তার ঠোঁটে ভেসে উঠল ব্যঙ্গের হাসি।

চামেলির কোথাও কোন জড়তা নেই। সেও ভালবেসেই বিয়ে করেছে ইমান আলিকে। জোর করে হিন্দুর ঘর থেকে তাকে ধরে আনেনি। চামেলির

চাল-চলনে মোটেই বোঝা যেত না কোথাও কোন সন্দেহ গভীরে প্রবেশ করেছে।

নারীর মন।

বুঝতে ভুল করে প্রায় সবাই। আমি ব্যতিক্রম নই।

ইমান আলি সাধু সজ্জন সেজে বেড়ায়।

কিন্তু সব সময়ই মনে হয়েছে ইমান আলির চাল চলনে কোথায় যেন ফাঁকি আছে। একদিন কথায় কথায় বললাম, ইমান আলির চাল-চলন খুব ভাল মনে হচ্ছে না চামেলি বিবি। কোথাও কোন খিঁচ আছে মনে হয়।

আমাকে চামেলি বলে ডেক ভাইসাব, আমার বাবা মায়ের দেওয়া নাম। আমি তো বাঈজি নই অন্যের মনোরঞ্জন করব, আমি বেগমও নই যে নবাব বাদশাহের অঙ্কশোভা বৃদ্ধি করব। আমি বিবি হয়েছি ভালবেসে, সংসার করব মনে করে, সুন্দর করব আমার সংসার। সবই ভুল, তাই বিবির সাজ খুলে আমি শুধু চামেলি রইতে চাই।

কেন?

সেটাই তো আসল বিষয়। যে কথাটা জান না সেটা বলা যায় না। যা মনে কর তা নয়। আমার সঙ্গে ইমান আলির পরিচয় অনেক দিনের। বাবা-মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি সাবালিকা হওয়া মাত্র বিয়ে করেছিলাম ইমানকে। কিন্তু ভুল বুঝতে দেরি হয়নি ভাইসাব। তখন দেরি হয়ে গেছে, পুরানো সমাজে যাবার পথ বন্ধ। আমাকে পূর্বের সমাজ কোন ক্রমেই গ্রহণ করবে না। বাধ্য হয়েই অন্যায়কে মাথা পেতে নিতে হচ্ছে।

চামেলির কথার তোড়ে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম।

আবার সে বলতে থাকে, রাতের বেলায় ইমান আলি মেয়ে মানুষ তল্লাস করে বেড়ায়। নষ্টা মেয়ের তো অভাব নেই। তবে কারও ঘরে আটকে যাচ্ছে না, প্রতিমাসে তার নতুন মেয়ের সঙ্গ চাই, চাই। নতুন মেয়ে মানুষ না পেলে ওর মন ওঠে না। আমি ঘরের মেয়েমানুষ, সংরক্ষিত মাল, যখন কোথাও রাত কাটাবার উপায় থাকে না তখন ফিরে আসে আমার কাছে।

তুমি প্রতিবাদ কর না।

কেন করব।

স্বামী যদি অন্যায় করে স্ত্রী তাতে বাধা দেয়।

কাজির খাতায় নাম লিখলেই স্বামী-স্ত্রী হয় না ভাইসাব। সবাই বলে ভালবাসার বিয়ে। ভালবাসার বাঁধন যে কত ঠুনকো তা আমার মত মেয়েরাই জানে। প্রতিবাদ করতে গেলে অশান্তি হবে। ইমান আমাকে তালাক দেবে না নিশ্চয়। সে জানে মোহরের টাকা আর জমি দিলে তার মুখে ভাত উঠবে না। তবে সব পাপের একটা সীমানা আছে। সীমানা অতিক্রম করতে গেলে পতন অনিবার্য। যতটা হয় ততটা করাই মানুষের কাজ। ইমান সীমানা পেরিয়ে গেছে। ফলও পাচ্ছে হাতে নাতে। ওর কাশির শব্দ শুনতে পান তো রোজই। বিকেলে জ্বর আসে, শেষরাতে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ে, বুকে ব্যথা আর কাশি।

হেকিম বলেছে 'ছয়' রোগ। অর্থাৎ যক্ষা।

আপনার কিছু করার নেই ?

করেছি ও করছি। ডাক্তার দেখাচ্ছি। তবে ওর রোগকে নিজের করে নিতে পারব না। যে মেয়েমানুষের কাছ থেকে এই রোগ নিয়ে এসেছে সেই তো ওর আপনজন।

চামেলির নির্বাক্তিক দার্শনিক কথা শুনে অবাক হয়ে গেলাম।

আবার সে বলল, মরবে ভুগে ভুগে। ফল পেয়েই মরতে হবে। ভগবানের কাছে দিনরাত প্রার্থনা করছি এমন একটি বেইমান মানুষের মৃত্যু যেন সুখের না হয়, যন্ত্রণা তাকে যেন ভাল করে জানিয়ে দেয় ভালবাসার অভিনয়টা যতই মোলায়েম হোক, বেইমানি তাকে যেন নরকেও স্থান না দেয়।

মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে ভাবছিলাম প্রতিহিংসাপরায়ণা নারীর অসাধ্য কিছু নেই।

ইমান আলির আতিথেয়তা, চামেলির অকপট উক্তি এই সব কিছু পেছনে ফেলে একদিন বেরিয়ে পড়লাম। আরজুকে যে দৃষ্টিতে দেখেছি, চামেলিকে সে চোখে দেখতে পারিনি।

পথ চলতে কত মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় কত কথাই হয়, তাঁদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে, সে সব মনে রাখার সুযোগ কখনও পাইনি। ইমান আলি আর চামেলি বিস্মৃতির অতলে কবে চাপা পড়ে গেছে, তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির হবার সময় চামেলির মন্তব্য মাঝে মাঝে মনে পড়ে।

চামেলি বলেছিল, অনেক মানুষই তো দেখলাম কিন্তু তুমি কেমন যেন স্বতন্ত্র। তোমার সত্য পরিচয় জানার খুবই আগ্রহ অথচ তুমি নিজের বিষয়ে একদম নীরব।

কোন উত্তর না দিয়ে হাতের পোঁটলা মাটিতে রেখে সঙ্কুচিত ভাবে দাঁড়াতে হল।

আমার কথায় জবাব দিন।

ভাবছি কোন জবাবটা তোমাকে খুশি করবে।

যে জবাব দেওয়া কঠিন অথচ সত্য হয়ত বা অপ্রিয় আমি হিন্দু সমাজে বড় হয়েছি, মুসলমানের ঘর করছি। কোথাও কিছু ঘটলে অথবা ঘটার উপক্রম হলে সহজেই সেটা আমার চোখে ধরা পড়ে।

কি দেখেছ তুমি ?

তোমার চোখ। চোখ দিয়েই অনেক সময় কথা বলে। সেদিন তোমার চোখে দেখেছি ঘৃণা। তুমি কে এবং কেনই বা এসেছ এদেশে, বল।

বললাম, উদ্দেশ্যবিহীন এই পরিক্রমা। আমার অজ্ঞাতে ঘরের বাঁধন ক্রমেই শিথিল হয়ে যেতেই অবাধ্য পা-দুটো ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। যে দিন ঘর বাঁধার স্বপ্ন ছিল সেদিন আমার কানে কানে হতচ্ছাড়া হবার মন্ত্র কে যেন শুনিয়েছিল। মন্ত্রটা কঠিন কঠোর হলেও মোহচ্যুত করতে সাহায্য করেছে, আমি সেই মন্ত্রের

কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তুমিও যখন কর্মক্লান্ত দেহটাকে শয্যায় এগিয়ে দেবে তখন মনের গভীরে প্রবেশ করে খুঁজে দেখ, আমাদের পরিণতি কোথায়, কতটা আমাদের সঞ্চয়, কতটা আমরা বঞ্চিত, কতটা আমরা রিক্ত। ওই আরাম শয্যায় ভেবে দেখ পার্থিব ভোগ ও স্বার্থকে কায়েম রাখতে তোমার আমার মত লোকের পাশে কত না ফন্দীফিকির আবিষ্কার করছে। হিন্দুরা অপবিত্র বস্তুকে গঙ্গাজলে ধুয়ে পবিত্র করে। আমাদের স্বভাব হল অন্যায় নিন্দনীয় কাজকে ধর্মের নামে অধর্মের বারি ধৌত করে ন্যায় ও প্রশংসনীয় বলে প্রচার করা। ধর্মের মুখোশটা ভেলবেটের মত মোলায়েম, সঙ্গীতের মত শ্রুতি মধুর, সূর্য চন্দ্রের মত নয়নাস্পদকর, ইথারের মত অদৃশ্য তাকেই ধর্মবাণী বলে লোক ঠকাই। অলৌকিকতার মধু মাখিয়ে বিভ্রান্ত করাই হল যাদের ধর্ম তাদের আমরা জেনেও কোন প্রতিকার খুঁজি না। স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বিধানকে ঈশ্বরের বিধান যারা বলে তাদের মত ঠগ জোচ্চোর আর কেউ আছে কি! আমরা নিরুপায়। নীতিধর্মকে আশ্রয় করে বাঁচার চেষ্টা করে আসছি, তাই পদে পদে, লাঞ্ছনা ও প্রতারণা সহ্য করি, আমার কোন পরিচয় নেই চামেলি। আমার পরিচয় আমাতে এবং তা আমাতেই শেষ।

এই শেষ কার ভাইজান? বঞ্চকের না বঞ্চিতের, অত্যাচারিতের?

এর উত্তর আমি দিতে পারব না চামেলি। তবে মনে থাকবে তোমার কথা। খুঁজে দেখব, এর জবাব কোথাও পাই কি-না।

আজও অনুসন্ধান করছি, জবাব আজও পাইনি।

মহীশূরের রাজপ্রাসাদের প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে কত কথাই মনে হচ্ছিল। বৃন্দাবন গার্ডেনের কাবেরী নদীর বাঁধের পাশে একাকী বসে পেছনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। স্বপ্নের ঘোরে মোগল সম্রাটদের দেখলাম, এবার সত্যি সত্যি দেখতে হবে মোগল বাদশাহদের ফেলে যাওয়া সম্পদ। তারই প্রতীক্ষা করছিলাম।

মাঝে মাঝে মনের কোণায় দেখতে পেতাম চামেলিকে। ও যেন ধূমায়িত বহ্নি, যে কোন সময় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে, পুড়িয়ে খাক করে দেবে তার পথের বিঘ্ন সবাইকে।

বৃন্দাবন গার্ডেন থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়েছিল।

ফিরে এসে যা দেখলাম তার বৈচিত্র কলকাতার বাড়িওলা ও ভাড়াটিয়া দ্বন্দ্বের মত অনেক বার দেখেছি, অভিনব কিছু নয় কিন্তু বাংলা থেকে এতদূরে এসে এমন আপ্যায়ন কখনও কল্পনাও করিনি।

আমরা কেউ জানতাম না প্যাকেজ ট্যুরের কর্তাদের সঙ্গে লজের মালিকের সঙ্গে চুক্তি ছিল সেদিন বেলা তিনটের মধ্যে লজ খালি করে দেবার। কারণ, এর আগেই আরেক দল ট্যুরিস্ট লজের ঘরগুলো অগ্রিম বন্দোবস্ত করে রেখেছে। নবাগতদের জায়গা করে দিতে লজের মালিকরা আমাদের অনুপস্থিতিতে বাক্সপাঁটরা টেনে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে।

সবারই মাথায় হাত।

প্যাকেজ ট্যুরের মালিকরা গা ঢাকা দিয়েছে ইতিমধ্যেই।

এবার আমাদের লড়াই।

লজ মালিক পুলিশ ডেকে আনল আমাদের বিদায় করতে।

যুক্তির লড়াই চলল ঘণ্টাখানেক ধরে।

অবশেষে একটা মাত্র ঘর বাদে আর সব ঘর খালি করে দিতে হল। সেই ঘরটায় আমরা সবাই মালপত্র বোঝাই দিয়ে লজের বারান্দা তথা ফুটপাতে আশ্রয় নিলাম। স্থির হল আকাশে আলো ফুটবার আগেই আমরা রওনা হব বাঙ্গালোরের পথে। পথেই খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি।

যতক্ষণ এই দৃশ্যগুলো অভিনীত হচ্ছিল ততক্ষণ আমি হেসে চলছিলাম।

নতুনদি ক্রুদ্ধভাবে আমার হাসির বহর লক্ষ্য করছিলেন। সব মিটে গেলে উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি হাসছিলে কেন ভাই! আমরা তো লজ্জায় ঘেন্নায় মরবার উপক্রম।

কেন? কানাড়ার আতিথেয়তার দাপটে।

ঠাট্টা নয়। যেমন অপমানজনক কথা বলছিল ওরা সব তা তুমি হজম করে হাসছিলে। আশ্চর্য!

আশ্চর্য কিছু নয় নতুনদি। এই রকম অপমান অতীতেও আমাকে সহ্য করতে হয়েছে, তাই গায়ের চামড়া বেশ মোটা হয়ে গেছে, আপনাদের কাছে এটা নতুন তাই সহ্য করতে পারছিলেন না। তবুও ওরা পুলিশ ডেকে গলা ধাক্কা দেয়নি। পুলিশ জানে, পরিব্রাজকরা না এলে কর্ণাটকের ক্ষুদ্র শিল্প, হোটেল শিল্পগুলো মার খাবে। আমরা কলকাতায় ফিরে যখন সবাইকে বলব, কর্ণাটকের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা তখন অনেকেই আসতে চাইবে না। তাতে লজের ক্ষতি না হলেও অনেক লোকের ক্ষতি হবে। বিশেষ করে ভারতে একমাত্র বাঙালীরা ভ্রমণপিপাসু এবং বহু অর্থ ব্যয় করে তারা বেড়াতে আসে অতীতের শিল্প, ধর্ম, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি দেখতে। দারোগাসাহেব এটাই বুঝিয়ে বললেন লজের মালিকদের তারপর একটা রফা হল। এটা হাসির ব্যাপার নয় কি। তবে শুনুন আমার পুরানো অভিজ্ঞতার কথা।

নতুনদি বললেন, তোমার কথা শুনতে শুনতে সকাল হয়ে যাবে।

ক্ষতি কি। সকালে একেবারে আমরা গিয়ে বাসে উঠব। তারপর ঝিমোতে ঝিমোতে বাঙ্গালোর পৌঁছে যাব।

তা মন্দ নয়।

সবাইকে পেছনে রেখে চলছিলাম। চলতে চলতে থমকে দাঁড়াতে হল গোপীনাথপুরে। এখানকার বিষ্ণু মন্দির বহু পুরানো আর বিগ্রহ অষ্টধাতুর। লোকে বলে জাগ্রত দেবতা।

সন্ধ্যার অন্ধকারে নাটমন্দিরে চাদর বিছিয়ে শুয়েছিলাম হঠাৎ কে যেন

ধাক্কা দিয়ে বলল, এই !

ধরমর করে উঠে বসতেই লোকটা বলল, এটা ধর্মশালা নয়। যাও এখান থেকে।

তার চিৎকারে আরও দুজন এগিয়ে এসে আমার চাদর ধরে টানাটানি আরম্ভ করল। বললাম, আমি বিদেশী। আজকের রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল সকালেই চলে যাব।

ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে হঠাৎ বলে উঠল, তুমি বাঙালী শাকাহারী নও, তোমার স্থান এখানে হবে না। দেবতা মন্দিরে মাছ-মাংস খাওয়া লোকদের থাকতে দেওয়া হয় না। পুজো দিতেই দেওয়া হয় না।

আমার তখন করুণ অবস্থা।

তবুও সেই অন্ধকারে পোঁটলা নিয়ে বেরিয়ে পড়তে হল।

কিন্তু নতুনদি কানাড়ি সংস্কৃতির চেয়ে উত্তর ভারতের জাতপাতের আহার বিহারের এই সংস্কৃতি বোধহয় মোটেই নিন্দনীয় নয়।

নতুনদি বলল, তা বটে।

তা হলে আমার হাসি কোন ক্রমেই দুষ্ট নয়। কিন্তু আঘাত না এলে মানুষ সচেতন হয় না। আমি আঘাত পেয়ে সচেতন হলাম। আশ্রয় একটা চাই। দেবদর্শণের প্রয়োজন তখন ফুরিয়ে গেছে। সকালের আলোতে গ্রামের সরু পথ দিয়ে এগোতে এগোতে চোখে পড়ল একটা সাইনবোর্ড। সাইন বোর্ডে হিন্দীতে অনেক কিছু লেখা থাকলেও ইংরেজিতে লেখা ছিল Non-diet Hospital. অর্থাৎ ডাক্তার আছেন, ওষুধও আছে, জরুরী ক্ষেত্রে রুগীর জন্য Bed আছে, নেই রুগীদের খাবারের ব্যবস্থা। রুগীর আহার্য ও পথ্য আনতে হবে রুগীর আত্মীয়স্বজনদের। হাসপাতালটি আধা সরকারী। ঠিক সরকারী হাসপাতাল নয়, তহশীলের ব্যয়ে এটা চালু আছে। এসব খবর অনেক পরে শুনেছি ডাক্তারসাহেবের কাছ থেকে।

আমাদের অভ্যাস ডাক্তারবাবু বলা কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সর্বত্র, এমন কি বিহারেও ডাক্তারদের সম্মানসূচক সাহেব পদবীটা জুড়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ এই হাসপাতালের একমেবঅদ্বিতীয়ম্ ডাক্তার সবার সম্মানীয় ব্যক্তি। কারণ বোধহয় তিরিশ বাই তিরিশ মাইলের ভেতর কোন পাশ করা ডাক্তার নেই।

আমি হাসপাতালের সামনে একটা গাছের ছায়াতে বসে বসে ভাবছিলাম গতরাতে পেটে দানা পড়েনি, কোথাও কোন দোকান খুঁজে কিছু পেটে দিতে না পারলে এবং যথাযথ পানীয় জল না পেলে দেহ ধারণাই সমস্যা হয়ে উঠবে।

আমার চেয়ে বেশি বয়সী প্যান্ট পরিহিত একজন ভদ্রলোক হাসপাতালে প্রবেশ করলেন। তাকে দেখে রোগীরা উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাল। আমি নিশ্চিন্ত হলাম, ইনিই ডাক্তার।

আমিও ধীরে ধীরে রোগীদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ ডাক্তারসাহেবের দৃষ্টি পড়ল আমার ওপর। দেহাতি ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁর কথা বুঝতে না পেরে উল্টো প্রশ্ন করলাম ইংরেজিতে।

বললাম, আমি এখানকার গ্রাম্যভাষা বুঝি না। ইংরেজিতে প্রশ্ন করলে খুশি হব।

ডাক্তারসাহেব আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে অনেক কথাই বললেন।

আমি আশ্রয় পেলাম ডাক্তারবাবুর গৃহে।

প্রথমেই ডাক্তারসাহেব বললেন, যতদিন ইচ্ছা তুমি আমার কাছে থাকতে পার। আমারও কোন সঙ্গী নেই দুজনে নানা আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাতে পারব। তবে একটা মুস্কিল হল, I believe in no religion—এটা মেনে নিতে পারবে তো।

অবশ্যই। এতে আমার কোন reservation নেই।

ডাক্তার সদাশয় ব্যক্তি। মহত্তর তার হাসি। সাদরে আশ্রয় দিয়েছিলেন।

ডাক্তারের বাড়িটি বড়। জনসংখ্যা মাত্র দুই। ডাক্তার ও তার খানসামা রসুইকারী আবু মিঞা। তৃতীয়জন আমি। আমি আশ্রিত ও নবাগত।

ডাক্তার যা বেতন পান তাতে সব খরচ সঙ্কুলান করেও উদ্বৃত্ত থাকে। প্রাইভেট প্র্যাকটিসও করেন। উপার্জিত অর্থ দিয়ে নিজের বাড়িতে একটা ডিসপেনসারি করেছেন। এখানে কোন ওষুধের দাম দিতে হয় না। দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে যে সব ওষুধ দেন যা সরকারী হাসপাতালে পাওয়া যায় না, এবং এত বেশি মূল্যবান যা গরীবের পক্ষে ক্রয় করা সম্ভব নয়। সকালবেলায় হাসপাতালে ডিউটি করে এসে ডাক্তার খাবার টেবিলে বসেন আর সারা বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। বিকেলবেলায় সমাগত রুগীদের দেখতেন। বাইরের কলে যেতেন কিন্তু কোন সময়ই রাতের বেলায় কোন কলে বের হতেন না। কেবলমাত্র হাসপাতালের কোন রুগীর অবস্থা খারাপ হলে রাতেও ছুটে যেতেন।

একদিন জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এই প্রত্যন্ত এলাকাকে কেন নিজের কর্মক্ষেত্র স্থির করলেন ?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন। রাতে খাবার টেবিলে বসে বলব। তবে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে এখানে আসিনি, এসেছি সেবার মনোভাব নিয়ে। তবে আমি বড়ই নিঃসঙ্গ এবং বর্তমান সমাজব্যবস্থায় খুবই অনভিপ্রেত। কোথায় যাব স্থির করতে করতে কয়েকটা বছর কেটে গেল। অবশেষে মনকে চাবুক মেরে মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করেছি।

সত্যিই ডাক্তার খুবই নিঃসঙ্গ। আমার সঙ্গলাভের আশায় অজ্ঞাতকুলশীল একটি ব্যক্তিকে নিজের কাছে সাদরে স্থান দিয়েছেন। সকল বিষয়েই ডাক্তার খুব ধীর স্থির। বাক্যালাপেও খুব সংযত। মিষ্টি হাসি লেগে থাকত তার ঠোঁটে।

প্রভুর মত খানসামা আবুমিঞাও দিলদরিয়া লোক। ডাক্তারকে যেভাবে সেবা করত তার তুলনা নেই, আমিও তার সেবা পেতাম একইভাবে।

ডাক্তারের সঙ্গে যে কয়দিন ছিলাম সে কয়দিন আমি নিজেকে মনে করতাম রাজগৃহের অতি বিশিষ্ট অতিথি।

নতুনদিদি এই পর্যন্ত শুনেই বাধা দিয়ে বললেন, ডাক্তার তোমাকে খাবারের টেবিলে বসে নিশ্চয়ই অনেক কথা বলেছিলেন, তা শোনার সময় আজ আর নেই। সময়ান্তরে শুনব।

বললাম, নতুনদি, আপনি মানুষের ব্যথাবেদনা আমার চেয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাই ডাক্তারের কাহিনী আপনাকে শোনাবই, আজ হোক আর কাল হোক শুনতেই হবে। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডাক্তার যখন মিশরে ছিলেন সেখানকার রোমহর্ষক ঘটনাগুলো না শুনলে মানুষ সম্বন্ধে আপনার কোন উদার মনোভাব গড়ে উঠতে পারে না।

নতুনদি বললেন, ডাক্তার বুঝি যুদ্ধের সময় মিশরে ছিলেন?

হ্যাঁ, নতুনদি, আমাদের গণ্ডীতো আরব সাগর আর ভারত মহাসাগর, তার ওপারে আরও সাগর ও দেশ আছে সেটাই জানার প্রয়োজন মনে করি। সেই প্রয়োজন আংশিক মিটিয়ে দিলেন আমার এই ডাক্তারবাবু।

কাল সকালে। আবার আমাদের যাত্রা শুরু। তার আগেই ডাক্তারের কাহিনী শোনাতে চাই।

বললাম, জানেন নতুনদি। যখনই ডাক্তার মিশরের কথা বললেন তখনই আমার চোখের সামনে মিশরের মানচিত্রটা ভেসে উঠল। ডাক্তার ভাগ্যবান। যুদ্ধের মাঠে ডাক্তার হয়ে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল কিন্তু সে সৌভাগ্য থেকে আমি হয়ত চিরকাল বঞ্চিত থেকে যাব।

মানব সভ্যতার আদিযুগে মিশর ছিল সভ্যতার অগ্রদূত। মিশরের সভ্য মানুষের পাদস্পর্শ পেয়েছিল মেসোপোটেমিয়া। সভ্যতা পবিত্র হয়েছিল টাইগ্রিস আর ইউফ্রেটিস নদীর জলস্পর্শে। সেখান থেকেই গড়াতে গড়াতে প্রাক-আর্যযুগে এই সভ্যতার চরম বিকাশ ঘটেছিল ভারতের সিন্ধু উপত্যকায়।

নীল নদ।

নীল নয় তার জল, স্বচ্ছ কাচের মত জল। প্রাচীন মিশরীরা খাল কেটে মরু অধ্যুষিত মিশরকে শস্যশ্যামল করেছিল। নদীতে বাঁধ দিয়ে মরুর তৃষ্ণা মিটিয়ে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল।

ডাক্তারবাবু হঠাৎ বললেন, মিশরের অভিজ্ঞতা হল আমার জীবনের turning point কতকগুলো ঘটনা এমনভাবে ঘটে যার ফলাফল হয় সুদূরপ্রসারী। আমি কখনও কোন সময়ই রাজনীতি, অর্থনীতি অথবা সমাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাইনি। পাশ করে নিজের পসার জমাবার চিন্তা করছি। ভাল offer পেলাম প্রতিবেশী এক ধনাঢ্য ব্যক্তির। উনি আমাকে Chamber করে দেবেন। দরকার হলে অনেক কিছু করে দেবেন বিনিময়ে তার কন্যাকে বিয়ে করতে হবে।

Offer টা লোভনীয় নয় কি। অর্ধেক রাজ্য আর রাজকন্যা। গররাজি ছিলাম এমন নয়। এমন সময় যুদ্ধের হিরিকে নাম লেখালুম Army Medical Service-এ. প্রথম কয়েক মাস training দিয়েই সোজা পাঠিয়ে দিল মিশরে।

আজ আপনার সঙ্গে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি নিয়ে হরেক আলোচনা করছি, সে সময় ওগুলো ছিল আমার অভিধানের বাইরে।

আমি বললাম, আপনার প্রশংসা করছি।

আমি কি প্রশংসার যোগ্য। কচু। চাকরি থেকে বিদায় নিতেই জড়িয়ে ধরল ভোটের দালালরা। সবাই বলল, গণতন্ত্র চাই, আমি বললাম, democracy is constitutional autocrcay. ওসব হাঙ্গামায় আমি নেই। স্বৈরাচারীদের হাত থেকে মুক্তি পেলাম না। বুঝলাম ওদের democracy-র ফাঁদে পা না দিলে দুর্ভোগ আছে। সেই দুর্ভোগ আমাকে টেনে এনেছে এই অরণ্যের এই কুটিরে। একটা প্রবাদ আছে ঃ একে মিন মিন্। দুয়ে পাঠ। তিনে গণ্ডগোল। চারে হাট। যত বেশি আম জনতা এগিয়ে আসবে ততই হাট বসবে কাজ হবে না।

এমন সময় আবু মিঞা এসে সেলাম দিয়ে জানাল একজন রুগী বারান্দায় বসে আছে।

ডাক্তারের কথায় ছেদ পড়ল।

আবার ফিরে এসে গা এলিয়ে দিতেই বললাম, আপনি তো ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী।

মোটেই নয়। যুদ্ধ যাকে বলে তার সঙ্গে আমার কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ডাক্তাররা তো যুদ্ধ করে না, মানুষ মারে না। তারা পেছনে থাকে আহতদের বাঁচিয়ে তুলতে। আপনি এসব প্রশ্ন করছেন কেন? আমার মনে হয় আপনি রাজনীতিকে নিজের জীবনে জড়িয়ে নিয়েছেন।

বিশ্বাস করুন আমি কোনদিন রাজাও ছিলাম না, রাজার নীতিটা যে কি তাও জানি না। বর্তমানে রাজাহীনদের রাজনীতিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। তবে একসময় জিগীর দিয়েছি, ইংরেজ হটো। ইংরেজ হটেছে কিন্তু জিগীরের মাশুল আজ অবধি সমানে দিয়ে চলেছি। আপনি বরং মিশরের গল্প বলুন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে ডাক্তার মুখ খুললেন।

রোমেল তখন কুকুরের মত পালাতে পালাতে জার্মানীতে পৌঁছে গেছে। তবুও কামানের শব্দ শুনছি রোজই। গাদা দিয়ে মৃতদেহ আসছে, আসছে সামরিক অসামরিক আহতরা। আমরা দেখা মাত্র সার্জিক্যালে তাদের পাঠিয়ে দিয়ে ছুরি চালাচ্ছি, যদি কাউকে বাঁচিয়ে তুলতে পারি তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছি। এমন সময় কয়েকজন আহত অসামরিক নারী পুরুষকে ট্রাক থেকে নামাল ফৌজী সেপাইরা। আমরাও কাজে নেমে পড়লাম।

সবার শেষে চল্লিশ উর্ধ একটি মহিলাকে শুইয়ে দিল অপারেশন টেবিলে।

তার পায়ে বোমার টুকরো লেগেছে।

মেজর হপকিন আমাদের পরিচালক। তিনি রুগী দেখে বললেন, য়্যামপুট করতে হবে। ডাক্তার তুমি রুগীর বাঁ পা কেটে বাদ দাও।

আমি তখন ক্যাপটেন র‍্যাঙ্কের। ওপরতলার হুকুম। সামরিক আইন হল, no question, carry out orders. ফলাফলের দায়িত্ব ওপরতলার। তবুও বিশেষভাবে বলমাম, আমি একবার পরীক্ষা করে দেখতে চাই স্যার।

Yes, you can but amputation a must to save her life.

আমি ভাল করে পরীক্ষা করে বললাম, আমার মনে হচ্ছে পা না কেটেও রোগীকে বাঁচান যায়।

হপকিন রাজি হল না, বলল, গ্যাংগ্রিন হয়ে রুগী মারা যাবে।

মেল নার্স আলামিন মিশরের লোক। আমাদের দোভাষী। তাকে বললাম, টেবিলে তোল রুগীকে। আমিও প্রস্তুত হলাম য়্যামপুট করতে।

এমন সময় মহিলাটির জ্ঞান ফিরে এসেছিল। কাতরে উঠল।

খুব কষ্ট হচ্ছে?

আলামিন জানাল, খুবই কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের অবস্থা দেখে সে আঁতকে উঠে বলল, আমাকে খুন কর না ডাক্তার।

আলামিনের মারফৎ তার জীবনের করুণ কাহিনী শুনলাম।

গ্রামের ঘর গেরস্ত মহিলা ফেরদুনা খানম্।

বলতে বলতে ডাক্তার থেমে গেলেন।

তাঁর মন ছুটে গিয়েছিল কোন্ অতীতে তা সে নিজেও হয়ত জানে না।

অনেকক্ষণ থেমে থেকে বিড়-বিড় করে কি যেন বললেন।

আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

মিশরের মরুভূমিতে ডাক্তার বোধহয় কোন গোলাপের সন্ধান পেয়েছেন। সেই গোলাপটা বোধহয় শুকিয়ে গেছে। তাতে সুবাসের রেশ মাত্র ছিল না। মাঝে মাঝেই তার কপালে কুঞ্চন দেখা দিচ্ছিল। এভাবে চুপ করে বসে থাকাটা রুচিসম্মত মনে হচ্ছিল না। বিশেষ করে ডাক্তারের মুখে একটা ব্যথার ছাপ যা দেখে অনুভব করা যায়, ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমি উঠে দাঁড়াতেই ডাক্তাররের ধ্যান ভঙ্গ হল।

আমার হাত ধরে বললেন, বসুন। ভাবছিলাম যুদ্ধ কি ভয়ানক ব্যাপার। ভাবছিলাম, রক্তপাত আর সম্পদ ধ্বংসই হয় না। মনুষ্যত্বকে হত্যা করে এইসব রক্তপিপাসু পররাজ্যলোভী যুদ্ধবাজরা।

জানেন বন্ধু, ফেরদুনা তার আঘাতের জন্য যতটা ব্যথা অনুভব করছিল তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা ভোগ করছিল তার মেয়ের কথা ভেবে। নাসাইস তার একমাত্র যুবতী কন্যা তার ওপর বিভৎস অত্যাচার করেছিল চারটে ইংরেজ পশু।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, যুদ্ধে অসামরিক লোকরাই বেশি বিপর্যস্ত হয়।

এটা ইংরেজ নয়। এটা পাশব বৃত্তির বেপরোয়া প্রকাশ। [illegible] অপকাজ পৃথিবীর সর্বত্র ঘটেছে, ঘটবেও। সিপাহীরা জানে মৃত্যুই তাদের পরিণতি। তাই ভোগের লিপ্সা তারা দমন করতে পারে না। সামরিক আইন কঠিন হলেও সুযোগ পেলেই তারা নারী ধর্ষণে মেতে ওঠে।

ডাক্তার বললেন, রাইট্ ইউ আর।

তবে শুনুন ঃ

ছিলাম বর্মার রেঙ্গুন শহরে।

আমার প্রতিবেশী একজন মাদ্রাজী বৃদ্ধ তামিল ব্রাহ্মণ। বহুকাল আগে ভাগ্যান্বেষণে বর্মায় এসেছিলেন। বিয়ে করেছিলেন একজন বর্মী মেয়েকে।

এই স্ত্রীর গর্ভে জন্মেছিলেন মা পাও।

জাপান বর্মা থেকে যখন ইংরেজ বিতাড়ন করে নিজেদের কায়েম করেছিল তখন তাদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল বার্মার আপামর জনসাধারণ। এই সময় মা পাও পূর্ণ যুবতী। একদিন বিকেলে বন্দুলা স্কোয়ার থেকে বাজার করতে গিয়ে আর ফিরে এল না। তখন শহরে কোন আইন শৃঙ্খলা ছিল না। আইয়ার সাহেব ও তার স্ত্রী খোঁজাখুজি করে হতাশ হলেন মা পাওয়ের প্রত্যাবর্তন সম্বন্ধে নিরাশ হয়ে কোনরকমে কালাবস্তীর একটা ঘরে দিন কাটাচ্ছিলেন।

আমি যখন তাদের দেখছি তখন বৃদ্ধ আইয়ার, তার স্ত্রীর সঙ্গে সপুত্রক মা পাওকে দেখেছি।

প্রায় রাতেই মা পাওয়ের চিৎকার শুনতাম আর শুনতাম একটা শিশুর কান্না।

ডাই নিপ্পন, ডাই নিপ্পন!

মরুক জাপান এই ছিল মা পাওয়ের তর্জন আর তার ছেলেকে করত প্রহার।

আইয়ার সাহেবের কাছেই শুনেছি, জাপানীরা বর্মার কয়েক হাজার বর্মী যুবতীকে নানাভাবে নানাস্থানে, এককভাবে, কখন সমবেতভাবে ধর্ষণ করেছে যখন তারা বর্মা দখল করে যুদ্ধ পরিচালনা করছিল। এর ফলে জাপান বর্মার কোনরকম সহযোগিতা তো লাভ করেইনি উপরন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে জাপানীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত, খুন করত। জাপানের অপকাজের সঙ্গী মা পাওয়ের এই সন্তান। জাপানীরা পালিয়ে গেছে বর্মা থেকে কিন্তু তাদের অপকাজের নিদর্শন রেখে গেছে বর্মার বহু ঘরে। বহু মানুষের অভিশাপ বর্ষিত হয়েছে পাপীদের ওপর।

মা পাও তার সন্তানকে তাড়িয়ে দিতে পারেনি কিন্তু জাপানীদের পাপকেও সহ্য করতে পারছিল না। সেজন্যই জাপানের মৃত্যু কামনা করে শিশুপুত্রের ওপর ক্ষোভের বিষ বর্ষণ করত যে কোন সময়।

ডাক্তার আবার বললেন, রাইট ইউ আর।

বললাম, যুদ্ধে মহম্মদ ঘোরী আট হাজার সৈন্য নিয়ে এসেছিল ভারত জয়

[illegible] তাকে সাহায্য করায় পৃথ্বীরাজের পরাজয় নিধন ঘটেছিল। যে কথাটা অনেকেই চিন্তা করে না সেটা হল আটহাজার ফৌজ তো তাদের বিবি নিয়ে যুদ্ধ করতে আসেনি, পরাজিত হিন্দুদের ঘরের মেয়েদের তারা জোর করে দখল করেছিল, কেউ কেউ তাদের বিয়েও করেছিল, তাদেরই বংশধররা আজও উত্তর ভারত দখল করে রেখেছে। এইভাবে সঙ্কর শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে।

ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন আমার কথা শুনে।

কিছুক্ষণ কারও মুখে কোন কথা নেই।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে ডাক্তার বললেন, এত গভীরভাবে কোনদিন ভেবে দেখিনি।

বললাম, যারা সভ্যতার দাবীদার অথচ পররাজ্য লোভী তারা বিজয়ীর বেশে যখন কোন দেশে প্রবেশ করেছে তখনই তারা নারীর সর্বনাশ সর্বাগ্রে করে।

জাপানের পরাজয় ঘটল।

আমেরিকা জাপানে নামাল তার সৈন্যবাহিনী।

কয়েক বছর পর আমেরিকা জাপান ছেড়ে যখন ফিরে গেল তখন জাপান সরকারের বড় সমস্যা দেখা দিল জারজ সন্তানদের নিয়ে যাদের পিতৃত্ব মার্কিন সৈন্যদের পাপ সঞ্জাত।

ঠিকই বলেছেন বন্ধু। ইংরেজ বোধহয় এই tradition চালু রাখতে মোটেই ভুল করেনি মিশরে।

আকাশে উষার আগমন সূচনা হতেই দুয়ারে এসে দাঁড়াল বাস। বাসের হর্ণে সবাই সজাগ হয়ে নিজেদের মালপত্র গোছাতে আরম্ভ করল।

নতুনদি বললেন, গোপীনাথপুরের ডাক্তারের কথা পরে শুনব ভাই। গতরাতের অপমান এ জীবনে বোধহয় ভুলতে পারব না।

বললাম, নতুনদি এ অপমান আপনার ভবিষ্যত জীবনে কোন প্রভাব বিস্তার করবে কিনা জানি না, তবে যে অপমানকে মাথায় পেতে নিতে বাধ্য হয়েছিলাম সেই করুণ অথচ মর্মঘাতী ঘটনা তা যদি কারও ঘটত সে বোধহয় আমার মত মাথা উঁচু করে এভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে পারত না।

কিছুক্ষণ থেমে বিছানা গোটাতে বসলাম।

সেদিন সেই শীতের সকালে সিমলার পর্ণকুটিরে বসে সুখের সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখছিলাম এমন সময় বিশেষ বার্তাবাহক ডেকে নিয়ে গেল দপ্তরে। অত-সকালে শীতের উপযোগী বস্ত্রসম্ভারে সজ্জিত ইংরেজ পুঙ্গব অতি মোলায়েম ভাষায় বললেন, দিল্লী থেকে নির্দেশ এসেছে তোমাকে কর্মচ্যুত করে এই শহর থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে।

জিজ্ঞাসা করলাম, অপরাধ ?

আমার জানা নেই। তোমার Identity Cardটা দিয়ে তুমি সিমলা ছেড়ে যাবার ব্যবস্থা কর।

তারপর নতুনদি ফিরে এলাম আস্তানায়। আমার স্ত্রী সবে রান্নার উদ্যোগ করছে আমার কচি মেয়েটা তখন লেপের তলায় ঘুমোচ্ছে। এমন সময় ভগ্নদূতের মত দুঃসংবাদ পৌঁছে দিলাম।

ইংরেজ বড়ই সতর্ক জাতি। আমার সিমলা পরিত্যাগের পথটা উন্মুক্ত রাখতে কয়েক ঘণ্টা পরে যাদের আবির্ভাব ঘটল তাদের পরিচয় পুলিস। সিমলা নয়, গোটা পঞ্জাব থেকে চালান দেবার ব্যবস্থা তখন পাকা।

আমার সামনে ভয়ঙ্কর ভীতিপ্রদ তমসা।

কচিশিশু ও তার জননীর কোন বিহিত ব্যবস্থা করার আগেই তাদের পেছনে ফেলে সামার হিল স্টেশনে নেমে আসতে হল। সকন্যা আমার ধৈর্যের মূর্তিমতী জীবনসঙ্গিনী আমাকে বিদায় জানাল, চোখ মুছল, তারপর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি যাও আমি আমার ব্যবস্থা দু-একদিনের মধ্যেই করে নেমে যাব হিমালয়ের বুক থেকে।

জানেন নতুনদি, কত সাধু সন্তের আশ্রয়স্থল এই হিমালয়, কত দেবদেবীর চরণস্পর্শে ধন্য এই হিমালয়ের বুক, অথচ আমি এমনই পাপী যে আমাকে একটু আশ্রয় দিতেও পারল না এই হিমালয়!

বলতে পারেন, এর চেয়ে অপমান, এর চেয়ে অন্য কোন দুর্দশার কথা আপনি ভাবতে পারেন কি! আমাকে সইতে হয়েছিল, নিরুপায়ের অন্য গতি তো নেই, তাই নিজের হাতে নিজেকেই কামড়ে নিজেকে প্রবোধ দিতে হয়েছিল।

বাসের ড্রাইভার তাগাদা দিতেই গাড়িতে উঠতে হল।

গন্তব্যস্থল শ্রীরঙ্গপত্তনম।

গাড়ি ছুটছে।

ইতিহাসের গৌরবময় কাহিনী স্রষ্টার ট্র্যাজিক পরিণতির যে সামান্যতম চিহ্ন আজও আছে তা দেখার প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমরা চলেছি।

গাড়ি ছুটছে।

আমাদের মন গাড়ির বেগের সমান তালে ছুটছে।

পথের ধারে কফির দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই সবাই হুরমুর করে নেমে পড়ল। আজ সকালে কারও পেটে একটা দানাও পড়েনি। সেজন্য ক্ষুধার্ত যাত্রীদের পরিতোষ করে খাওয়াবার ব্যবস্থা না থাকলেও যা কিছু পাওয়া যায় পথের ধারে তাতেই সাময়িক ক্ষুন্নিবৃত্তি ঘটাবার আগ্রহ সবারই।

নতুনদি কিন্তু নামলেন না।

বললাম, আপনার জন্য কফি আনব কি?

বললেন আনতে পার, তবে ঝণ্টুর বাবা সব ব্যবস্থাই করবে। তোমাকে অত ব্যস্ত হতে হবে না। কখনও কোনদিন কোন চায়ের দোকানে বসে অথবা রেস্তোরাঁয় বসে কিছু খাইনি। এটা তো কলকাতার ফুটপাতের মত দোকান। এখানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কিম্বা ভাঙ্গা বেঞ্চে বসে খাওয়া আমার রুচির বিরুদ্ধ। ঝণ্টু

বাবা এটা জানেন, সেজন্য আমার ব্যবস্থা উনিই করবেন।

আমাদের কথা শেষ হবার আগেই নির্মলবাবু দু'কাপ কফি আর পকোরা নিয়ে দাঁড়ালেন বাসের দরজায়। নতুনদি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, দেখলে তো!

আমি হেসে প্রতিবাদ জানালাম, আমার জন্য আপনি এসব আনলেন কেন? আমি-ই ত যেতে পারতাম।

নির্মলবাবু হাসলেন, বললেন, দিদি আর ভাই দুজনে মিলে যেভাবে বিশ্ব-জয় করতে নেমেছেন তাতে বাধা ঘটত দোকানে গিয়ে কফি খেতে। তার চেয়ে দুজনের সমস্যা এক জায়গাতেই মিটিয়ে দিলাম।

নতুনদি বললেন, অতি উত্তম, এবার আবার বাসের হর্ণ বাজছে। সবাইকে ডাক। এবার আমাদের তীর্থযাত্রা।

হ্যাঁ, তীর্থযাত্রা।

শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে তীর্থদর্শনের স্বর্গীয় আনন্দ আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল।

গাইড সবাইকে টিপু সুলতানের মহল, অস্ত্রখানা, বেগমদের হাবেলি যখন দেখাচ্ছিল তখন আমরা কয়েকজন দাঁড়িয়ে মনে প্রাণে অনুভব করার চেষ্টা করছিলাম এটা টিপুর মাজার অথবা পুণ্যভূমি যেখানে টিপুকে শুইয়ে রেখে ইংরেজ তার পাপের চিহ্ন পরবর্তী বংশধরদের জানতে দেবার যে কলঙ্কিত অধ্যায় রেখে গেছে, তা ভাবতে ভাবতে মন নিথর হয়ে গেল আমার। যে সুলতান মখমলের শয্যায় শুয়ে স্বাধীনতা রক্ষার স্বপ্ন দেখত, সেই সুলতানকে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে কবরে মখমলের আচ্ছাদন দিয়ে।

দুর্গের সামনে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখছিলাম উন্মুক্ত অসি হস্তে স্বাধীনতার পূজারী টিপু সুলতান ফিরিঙ্গি ও তাদের ভাড়াটিয়া সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সেদিনের কুটিল জটিল কূটনীতির বলি টিপুকে হত্যা করতে যারা সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিল তাদের অন্যতম হলেন পেশওয়া এবং অপর-জন হলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম। উপযুক্ত উৎকোচ পেয়ে এবং টিপুর রাজ্যের ভাগ পাবার আশায় মারাঠা ও নিজাম রণক্ষেত্র থেকে দূরে থেকে মজা উপভোগ করছিলেন। তাদের সেদিন কেউ বুঝিয়ে বলেনি, যে কুমীরকে খাল কেটে দেশের অভ্যন্তরে ডেকে আনছেন যাঁরা, সে কুমীর তাদেরও গ্রাস করতে পারে। সব ক্ষেত্রেই দেখা গেছে সম্প্রদায় নয়, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য হিন্দুরাজা ও মুসলমানরাজা ভারতের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রকে চিরতরে স্তিমিত করতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করেছে।

টিপু কিন্তু সব কিছু বুঝতে পেরে ফরাসীদের সাহায্য চেয়েছিলেন। মহীশূরের যুদ্ধের সূচনায় ছিল ফরাসী উপনিবেশ মাহে দখল করা। মাহে ফরাসী উপনিবেশ হলেও তা ছিল হায়দার আলির আশ্রিত ও মহীশূর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। নিরাপত্তার জন্য আবেদন করল। হায়দার তাদের যেমন রক্ষা

করেছিলেন তেমনি ইংরেজকে উচিত শিক্ষা দিতে ঘোরতর যুদ্ধ করতে নেমেছিলেন। মাদ্রাজ শহর যখন অবরুদ্ধ তখন ইংরেজ তার সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল। সন্ধির সর্ত অনুসারে হায়দার অধিকৃত ইংরেজ রাজ্য ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

হায়দার সমর নিপুণ ছিলেন। ছিলেন প্রজাহিতৈষী কিন্তু মানব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় ছিল না তাঁর। তাঁর মন্ত্রীরা যদি বলতেন শত্রুর শেষ রাখতে নেই, ওষুধের শেষ রাখতে নেই, সৎ কাজের ভাবনা দিয়ে অসৎ কাজ রোধ করা যায় না তা হলে ঘটনার মোড় উল্টো পথে ঘুরতো।

মহম্মদ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে সংহার করেছিল কিন্তু তার অতি বিশ্বস্ত বিশ্বাসঘাতক জয়চাঁদ তার হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। মীরজাফর সিরাজদৌল্লাকে গদীচ্যুত ও হত্যা করেছিল কিন্তু সেও ভোগ করতে পারেনি বাংলার মসনদ। ইংরেজ তাকেও বিতাড়িত করেছিল। মুর্শিদাবাদের নবাবশাহী উৎখাত করেছিল কয়েক বছরের মধ্যে। হায়দার যদি মাদ্রাজ দখল করে ইংরেজদের পালতোলা জাহাজে উঠিয়ে দিতে পারতেন তা হলে তাঁর স্নেহের দুলাল স্বাধীনতাকামী বীর টিপু সুলতানের অপমৃত্যু ঘটত না। আর আমার মত লোক সেই কলঙ্কিত ভারত ইতিহাসের অধ্যায় দেখতে মখমলের চাদর ঢাকা মাজারের সামনে দাঁড়িয়ে চোখ মুছত না। তবে বোধহয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল, প্রভুকে বঞ্চিত করে মসনদ দখলের কঠিন মূল্য হায়দারের উত্তরপুরুষকে দিতে হয়েছিল। দুঃখ ও হতাশা দুটোই আমার হৃদয়ের গভীরে যে তরঙ্গ তুলেছিল শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে তার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

এই সেই টিপু যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে দূত পাঠিয়েছিলেন ফ্রান্সের সম্রাট নেপোলিয়নের কাছে। আজকের দিনের মত চলাচলের সুবিধা থাকলে সে সময় স্বয়ং নেপোলিয়ন এগিয়ে আসতেন ফরাসী বাহিনী নিয়ে ইংরেজের সাম্রাজ্যবাদী চেহারাকে পাল্টে দিতে।

আমরা দুর্গের বাহিরে একটা মসৃণ পাথরে বসে তাকিয়ে দেখছিলাম কেল্লাকে দুর্ভেদ্য করার প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব। মাঝে মাঝে ফিরে দেখছিলাম সেই স্থানটি যেখানে টিপু লড়াই করতে করতে উন্মুক্ত অসি হস্তে এগিয়ে গিয়ে ইংরেজদের কপটতায় শহীদ হয়েছিলেন।

কে যেন আমার কানের কাছে রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষানের সেই চির পরিচিত শব্দ 'সব ঝুট হ্যায়' শব্দ কটি ছুড়ে মারছিল। সব ঝুট হ্যায়।

ঝুট হ্যায় সাম্রাজ্যবাদীর লোভ, ঝুট হ্যায় বীরের আত্মত্যাগ, ঝুট হ্যায় ইতিহাস, সাচ্ হ্যায় আজকের বাস্তব যার সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বার বার চোখ মুছে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি অতীত গৌরবকে। ইংরেজের ইতিহাস আমরা পড়ি, আমরা গদগদ হয়ে ভাবি ইংরেজ মহান ও সত্যবাদী কিন্তু যখনই তাকিয়ে দেখি ভারতের গোটা দেহে হাজার হাজার ইংরেজ সৃষ্ট ক্ষত তখনই মনে হয় 'সব ঝুট হ্যায়'।

এই দুর্গের অভ্যন্তরে একদিন যেমন নূপুর নিক্কণ শোনা যেত, তেমনি শোনা যেত অস্ত্রের ঝণ্‌ঝণা। সে সবই আজ অতীত। তার কঙ্কালটুকুও নাই। তার ছায়াটুকুও আর চোখে পড়ে না।

নির্মলবাবু হাত ধরে টেনে তুলে বলল, দাদা যে ভাবুক কবি তা বুঝতে পারিনি।

আমি সজল চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নতুনদি বললেন, কি ভাবছ ভাই।

পরিণতি।

কার? তোমার না আমার! হাসলেন নতুনদি। তাঁর হাসিটা কোন মাদকতা সৃষ্টি করেছিল।

হঠাৎ আমি বলে উঠলাম, নতুনদি, আপনি এত সুন্দর!

তোমাকে আর সৌন্দর্যের মহিমা প্রচার করতে হবে না। কি ভাবছিলে এতক্ষণ?

ভাবছিলাম সেই গোপীনাথপুরের ডাক্তারের কথা!

ডাক্তার বলেছিলেন, সেদিন ফেরাদুনার কথায় আমার সহচরদের নিয়ে যেখানে গিয়েছিলাম সেটাই তোমাকে বলব বন্ধু। সে কি বীভৎস দৃশ্য। আজও আমার গায়ে কাঁটা দেয় সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে। মেজর হপকিন ছিলেন সঙ্গে।

তিনিও এই দৃশ্য দেখে শিউড়ে উঠেছিলেন।

স্যার। কি ভাবছেন?

ভাবছি কার জন্য যুদ্ধ করতে এসেছি আমরা!

দেশের জন্য। তোমার দেশের জন্য।

না, না। আমরা আমাদের সাম্রাজ্যরক্ষা করতে এসেছি, এসেছি ঔপনিবেশিক স্বার্থ বজায় রাখতে। পরাধীনকে পর্যুদস্ত করা মানব ধর্ম নয়। কেন এরা পরাধীন? আমরা তো গণতন্ত্রের দোহাই দেই নিজের দেশে। আর অধিকৃত অঞ্চলকে শোষণ করি। এ কোন ধরনের গণতন্ত্র তা বুঝিনা ক্যাপটেন। আমরা গণতন্ত্রের বড়াই করি। এটা কি। আমার মনে হয় This democracy is bogus—hyrocracy. গুণ্ডামি। শুধু সাম্রাজ্য রক্ষার তাগিদে আমরা Rowdism ছড়িয়ে দিয়েছি সারা দুনিয়াতে।

আজ ভাবছি, যেদিন টিপুকে হত্যা করেছিল সেদিন ইংরেজ তার স্বদেশে গণতন্ত্রের ধ্বজা তুলে ধরে নিজেদের মানুষের পদবাচ্য করতে অপচেষ্টা করেছিল। সেই মিথ্যা ও প্রবঞ্চণার শিকার হল এই টিপু। তাকে হত্যা করা হয়েছিল, ন্যায়ধর্ম রক্ষা করতে নয়, লোলুপতার জন্য, গণতন্ত্রের ঝুলি সেদিনও যেমন ভুয়া হয়ে গিয়েছিল, আজও তার চেয়ে উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারেনি।

ফেরদুনার পা কেটে ফেলতে হয়নি। কেটে ফেললেই ভাল হত। অন্তত সে আর ক্র্যাচে ভড় করে আমার কাছে আসত না। তার দুঃখের কথা

শুনতে হত না। হৃদয়বিদারক তার করুণ কাহিনী ইতিহাসের পাতায় কোনদিনই লেখা হবে না। কত শত সহস্র মানুষ এইভাবে স্বজন হারিয়ে মরমে মরে আছে তার হিসাব তো কেউ করেনি, যদি কোনদিন মানুষের ইতিহাস লেখা হয় সেদিন ফেরদুনার মত অভাগীদের কথা না লিখলে সে ইতিহাস অসমাপ্তই থেকে যাবে।

নির্মলবাবু বাধা দিয়ে বলল, আর শুনতে চাই না।

বললাম, শোনাটা বড় কথা নয় নির্মলবাবু, অনুভব করাটাই বড় কথা। ডাক্তার বলেছিল, ফেরদুনার চোখের জল তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছিল, মনে হয়েছিল সে যেন সাহারা মরুর পাশে জীবন্ত একটা গোলাপ পাঁপড়ি মেলে রয়েছে। আজ নতুনদির হাসি দেখে মনে হল, ব্যথার এই স্মারক মন্দিরে তার করুণ দৃষ্টির মাঝ দিয়ে যে হাসি দেখা গিয়েছিল তা যেন সেই সাহারার গোলাপের মত পাঁপড়ি মেলে সৌন্দর্যকে মহিমান্বিত করেছিল। এই সৌন্দর্য অনুভব করা ব্যস্ত করার নয় নির্মলবাবু। আজ যাঁর স্মৃতি সৌধের সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় না থাকলেও তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে কসুর করি না আমরা কেউ, কিন্তু তিনি ছিলেন বাদশাহ, এই বাদশাহের স্মৃতির পাশে ফেরদুনার কন্যার মত লক্ষ লক্ষ অত্যাচারিত নারীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে তো আমরা পারি না।

নির্মলবাবু বোধহয় আমার কথা বুঝতে চাননি তাই তিনি নীরবে উঠে দাঁড়ালেন।

আপনি কোথায় চললেন দাদা।

নির্মলবাবু বললেন, ট্রাজিডি সাহিত্যে যত সুন্দর, বাস্তব জীবনে তত সুন্দর নয়।

হেসে বললাম, অবশ্যই। সাহিত্যের ট্রাজিডি উপভোগ করা যায় বাস্তবের ট্রাজিডি সহ্য করতে হয়। কিন্তু নির্মলবাবু আমরা ট্রাজিডিকে বাদ দিয়ে চলতে পারিনি, উপভোগও করি, সহ্যও করি।

বলতে বলতে থেমে গিয়ে নতুনদির মুখের দিকে তাকালাম। নতুনদি ইসারায় আমার কথা শেষ করতে বললেন। আমি বলতে থাকি :

যমুনার সাঁকো পেরোতে থাকে তুফান এক্সপ্রেস।

যাত্রীরা হুমড়ি দিয়ে দেখতে থাকে তাজমহলকে। যারা আগ্রায় যাত্রা শেষ করবে তাদের আগ্রহ কম। কিন্তু যারা মথুরা অথবা দিল্লির যাত্রী তারা জানালা থেকে হুমড়ি দিয়ে দেখতে থাকে তাজমহল। যমুনার তীরে তাজমহল। যমুনার রেল ব্রিজ থেকে অতি স্পষ্ট তাজমহলের দৃশ্য।

আমিও দেখলাম।

এ দেখা আমার দেখা নয়। কারণ আমি আপাতত যাত্রা শেষ করব। উদ্দেশ্য তাজমহল, আগ্রাফোর্ট, আকবরের সমাধি সিকান্দ্রায়, ইমতাদদৌল্লার সমাধি-মন্দির খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা। সবার আগে প্রোগ্রাম ছিল ফতেপুর সিক্রি দেখা।

ফতেপুর সিক্রিতে বাদশাহ আকবর অদৃশ্য থেকে আমার কানে কানে বলেছিলেন, আগ্রা দেখে এস। স্বপ্নে দেখা বাদশাহের নবরত্ন থেকে কে যেন আমাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল আগ্রার মাটিতে। চোখ খুলেই দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি আগ্রাদুর্গের বিরাট দরওয়াজায়। গুটি গুটি পায়ে ওপরে উঠেছি। দেখেছি জাহাঙ্গীর মহল, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জাহানারার হারেমের দরজায় বসেছি, যমুনার বুক বেয়ে মিষ্টি যে বাতাস দুর্গের অভ্যন্তরের তরু রাশির ওপর দিয়ে শন্-শন্ করে বয়ে চলেছিল তাতে কেমন একটা সঙ্গীতের মূর্ছনা। সমস্ত হৃদয় দিয়ে সেই সঙ্গীতকে মনের কোণে কোণে হিল্লোল তোলার সুযোগ দিয়ে বার বার মনে করিয়ে দিচ্ছিল এই দুর্গ সাম্রাজ্যবাদীদের কেবলমাত্র নিরাপদ আশ্রয় নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মনের মানুষের প্রেম-ভালবাসার ঘটনাও।

তাজমহল!

আঃ তাজমহল।

শাহজাহানের অপূর্ব কীর্তি।

কেউ বলে প্রেমের সমাধি, প্রেমিকের অবিস্মরণীয় অবদান। আবার কেউ বলে তাজমহল নির্মান করেন শাহজাহান তার বিরাট বৈভবের পরিচয় রাখতে।

কোনটা ঠিক জানি না।

তাজমহল নির্মান কালে দাক্ষিণাত্যে মোগলরাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোকের দুর্ভিক্ষে অনাহারে মৃত্যু সত্যই কি তাজমহলকে ব্যঙ্গ করে না? আগ্রা দুর্গে দেখেছি কয়েক ডজন একদুয়ারী কক্ষ, শোনা যায় বাদশাহ শাহজাহান কর্তৃক ইরান, তুরান, কাজাগিস্তান, আফগানিস্তান, ভারত ও সন্নিহিত দেশ থেকে কয়েকশত সংগৃহীত রূপসী যুবতীর জন্য এই কামরাগুলো তৈরি করা হয়েছিল বাদশাহের নির্দেশে, আর এই অঞ্চলে বাদশাহ ও শাহজাদা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। কারা এই নারী? ব্যর্থ যৌবনের করুণ প্রতিচ্ছবি এই নারীরা কার ভোগ্য ছিল? অনেক প্রশ্ন জাগে মনে। তবুও আমরা বলি শাহজাহান ছিল মমতাজ প্রেমী, তাঁর প্রেমের নিদর্শন হল তাজমহল। ইতিহাসের পাতায় রাজাদের স্মৃতি শুনতে শুনতে আমরা প্রকৃত ইতিহাস বিস্মৃত হয়েছি। সত্য আবিষ্কার করা কঠিন।

আজও মীনাবাজারের শূন্য আঙ্গিনায় শোনা যায় রূপসী যুবতী নারীর নূপুরের শব্দ কিন্তু তারা চিরকালের জন্য অদৃশ্য। তাদের কথা কোন মোগল ঐতিহাসিক লিখে যায়নি, তাদের পরিচয়ও কেউ দিয়ে যায়নি।

ওরা বলে, বাদশাহকি মর্জি।

তাজমহল অমর করেছে শাহজাহানকে।

কিন্তু মহামতি আকবরকে চিরস্মরণীয় করে যারা রেখেছে অথচ তারা অতি নিন্দনীয় একটি ঘটনা একবারও উল্লেখ করেনি।

জাঠরা এক সময় আগ্রা ও সন্নিহিত জায়গা দখল করেছিল।

তাদের দাবী ছিল, আকবর ছিলেন হিন্দু। তার পুত্র জাহাঙ্গীর ছিলেন

মুসলমান। জাহাঙ্গীর আকবরকে মুসলমানী আইন অনুসারে কবর দিয়ে হিন্দু আকবরের অমর্যাদা করেছিল। কেন আকবর হিন্দু? হিন্দু নারীকে বিয়ে করেছিলেন হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী যার সাক্ষ্য বহন করছে ফতেপুর সিক্রির দুর্গের যোধাবাঈ মহলে। পাশেই যোধাবাঈয়ের জন্য যে দুটি মহল নির্মান করা হয়েছিল শীত ও গ্রীষ্মকালে বসবাসের জন্য তা নির্মিত হয়েছিল হিন্দুস্ত্রীর জন্য হিন্দু স্থাপত্য অনুসারে। জাঠরা তাই দাবী করেছিল আকবর ছিলেন হিন্দু।

শোনা যায় জাঠরা আগ্রা দখল করে সিকান্দ্রার কবরখানা থেকে আকবরের অস্থি তুলে যমুনাতীরে হিন্দুমতে ঘি চন্দনে দাহ করেছিল। জাঠদের প্রাধান্য ঘটেছিল মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে। সেজন্য আগ্রা অঞ্চল দখল যতটা সত্য ততটা সত্য বোধহয় নয় আকবরের অস্থি দাহ।

গাইড অনেক কথাই বলল, কিন্তু সবটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদী বহু নরপশু আছে, ছিল ও থাকবে যারা এরকম অপকর্ম করতে পারে। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশে কীর্তি ও অপকীর্তির খতিয়ান করা অসম্ভব।

তিন

তুমি কি পণ্ডিচেরি কখনও গিয়েছ ভাই?

এমন প্রশ্ন হঠাৎ কেন করলেন নতুনদি। দক্ষিণ ভারতে এসেছি। পণ্ডিচেরি না দেখে কি ফেরা যায়! যত ক্লেশই হোক পণ্ডিচেরি বাঙ্গালী মাত্রই দর্শন করে থাকেন। বিশেষ করে শ্রীঅরবিন্দের আকর্ষণে এখানে অনেক বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে বসবাসও করেন। হঠাৎ এই প্রশ্ন করলেন কেন?

তিরুপতি পাহাড়ের নিচে চালুক্য হোটেল।

শহর যতটা বিখ্যাত তার চেয়েও বেশি বিখ্যাত তিরুপতি মন্দির ও মন্দিরের দেবতা। শহর খুব ছোট নয়, এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে প্রভু তিরুপতির নামে।

তিরুবন্তপুরম্ পেরিয়ে আমরা যখন কর্ণাটকের ব্যাঘ্র প্রকল্পের অভয়ারণ্যে এসে খাবার ব্যবস্থা করছি এমন সময় প্যাকেজ ট্যুরের কর্তাব্যক্তিরা সবার অলক্ষ্যে তাদের গাইড কার নিয়ে পলায়ন করেছিল। কারণটা পরে অনুমান করা গিয়েছিল, কিন্তু তারা যদি তাদের অর্থের অসঙ্গতির কথা বলত তাহলে পরিভ্রমণকারী অনেকেই তাদের আর্থিক সাহায্য দিতে মোটেই কার্পণ্য করত না। কিন্তু তাদের এই নিন্দনীয় কাজের জন্য আমরা সবাই বলতে গেলে অথৈ জলে পড়ার মত অবস্থা। নিজের আশ্রয় নিজেদের খুঁজে নিতে হয়েছে। সবাই ঠিক করেছে একটা নির্দিষ্ট দিনে একটা নির্দিষ্ট সময়ে সবাই মাদ্রাজে যে কোন প্রকারে পৌঁছে কলকাতা ফেরার গাড়ির সংরক্ষিত আসন দখল করবে। আবার সবাইয়ের সঙ্গে মাদ্রাজে দেখা হবে।

আমাদের যাত্রাপথে করুণ ছেদ পড়েছিল প্যাকেজ ট্যুরের কর্তাদের বিশ্বাস-যোগ্যতা নষ্ট হওয়াতে।

অন্যান্য সঙ্গীরা কোথায় আশ্রয় পেলেন তা জানার অবসর পাইনি। আমরা চালুক্য হোটেলে স্থান পেয়ে নিজেদের ভাগ্যবান মনে করেছিলাম। একটা হলঘরে পরপর কয়েকটি বিছানা পেতে আমরা যখন পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করতে ব্যস্ত এমন সময় রসভঙ্গ করে নতুনদি জানতে চাইলেন আমি পণ্ডিচেরি গিয়েছি কিনা।

বললাম, হ্যাঁ। বাঙ্গালীর কাছে পণ্ডিচেরি তীর্থস্থান, এত কাছে এসে পণ্ডিচেরি না গেলে নিজেকে অপরাধী মনে হবে। এটা তো বর্তমান। এর অতীত আছে নতুনদি।

অতীত কাল, ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের ইতিহাস।

না, আমার অতীত। ইংরেজ সরকার কোন সময়ই আমাকে আশ্রয় দিতে অনুরাগ প্রদর্শন করেনি তাদের বীতরাগকে কদলী প্রদর্শন করে প্রথম গিয়েছিলাম চন্দননগরে। বাংলার বুকে অতি ক্ষুদ্র একটি ফরাসী উপনিবেশ ও বাণিজ্য-কেন্দ্র। কালক্রমে ফরাসী ইংরেজের হাতে পর্যুদস্ত হয়েও যে কয়েক টুকরো ভারতের বুকের ওপর প্রভুত্ব রাখতে সমর্থ হয়েছিল তার আয়তন অত্যধিক নগণ্য হলেও তার গুরুত্ব নেহাত কম নয়। অবশ্য বাংলার বিপ্লবীদের সন্ধানে ইংরেজ সরকার ফরাসী সরকারের বিনা অনুমতিতে চন্দননগরে হামলা করতে কসুর করেনি। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এটা অতিগর্হিত কাজ হলেও প্রবল প্রতাপ ইংরেজের বিরুদ্ধে টু শব্দ করতে সাহস পায়নি ফরাসী সরকার। উপরন্তু ইংরেজ ও ফরাসীদের সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ একই সুতোয় বাঁধা। ইংরেজ বিপন্ন হলে ভবিষ্যতে ফরাসীরা বিপন্ন হতে পারে। একজন তল্পী-তল্পা গোটাতে বাধ্য হলে তুলনামূলকভাবে দুর্বল ফরাসীকে ব্যাগব্যাগেজ নিয়ে জাহাজে চড়তে হবে এটাই ছিল নিশ্চিত। তাই টেগার্ট যখন ইংরেজ পুলিশ নিয়ে চন্দননগরে হামলা করেছিল তখন কোন প্রতিবাদ করেনি ফরাসী সরকার।

শ্রীঅরবিন্দ আলিপুর বোমার মামলায় খালাস পেলেন। চলে এলেন চন্দননগরে নিরাপদ আশ্রয় পেতে। এখানে স্থায়ীভাবে বাস করছেন বিপ্লবের আদর্শ পুরুষ মতিলাল রায় এখানেই জন্মেছিলেন কানাইলাল বসু। হরিনারায়ণ এবং গঙ্গানারায়ণ চন্দ দুই ভাই-ই ইংরেজ সরকারের কারাগারে ও বন্দীশিবিরে বহু বৎসর কাটিয়েছেন।

ছোটবেলায় এই সব কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর আমার কাছে চন্দননগর ছিল কল্পনারাজ্যের তীর্থস্থান। পাঠ্যজীবনেই বেড়িয়ে এসেছি চন্দননগর শহরে। শুনেছিলাম, চন্দননগর অঢেল মদের রাজ্য। ফরাসী সরকার মদ বিষয়ে বিশেষ উদার তাই কলকাতাসহ নিকটবর্তী অন্যান্য শহর থেকে ইংরেজের আশ্রিত নাগরিকরা এখানে আসত গাড়ি চেপে সুরার সদ্ব্যবহার করতে।

ফরাসী উপনিবেশ চন্দননগরে ফরাসী মুদ্রার প্রচলন চোখে পড়েনি। ফরাসী শাসন ব্যবস্থাও ছিল অন্য ধরনের। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের মেয়র এবং তার কর্তাগণ অসামরিক শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করত। ফরাসী গভর্ণর ছিলেন সর্বেসর্বা। গভর্ণরের ছিল একজিকিউটিভ, মার্শাল ও জুডিসিয়ারীর ক্ষমতা। তিনি সোজাসুজি শাসন পরিচালনা না করলেও তিনি ছিলেন আপিলেট অথরিটি, তারপর যেতে হত পণ্ডিচেরিতে।

আমাকে কিছুকাল বাস করতে হয়েছিল চন্দননগরে। প্রবর্তক প্রতিষ্ঠানের কর্মী হয়ে।

প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা অরুণ দত্ত।

আপনারা অরুণ দত্তকে তো দেখেননি। দেখলে বুঝতে পারতেন গৃহী অথচ সন্ন্যাসী, ভোগী নন ত্যাগী। যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলতেন তখন কতটা স্নেহমাখানো থাকত তাঁর কথায় তা বলে শেষ করা যায় না।

অরুণ দত্ত ছিলেন মেয়র কাউন্সিলের সদস্য। ওর দায়িত্বে ছিল খাদ্য সরবরাহ বিভাগ। তখন ভয়ংকর দুর্ভিক্ষ গোটা বাংলায়। পথেঘাটে শোনা যেত ভাতের জন্য আকুল ক্রন্দন। কলকাতার পথে পথে মৃতের পাহাড়। ইংরেজও যুদ্ধে নেমেছে। ফরাসীরাও যুদ্ধ করছে। উভয়েরই সাম্রাজ্য রক্ষার কঠিন তাগিদ। শোষণের পথ রুদ্ধ হলে উভয় জাতির নাভিশ্বাস উঠবে। ইংরেজ তখন পোড়ামাটি নীতি আঁকড়ে ধরে অনাহারে বাংলার মানুষকে রাখার কঠিন প্রতিজ্ঞা করে নরমেধ যজ্ঞ চালাচ্ছে।

কিন্তু অরুণ দত্ত।

বললেন, অবস্থা বুঝছি। চন্দননগরে তো চাষের জমি না থাকার মত। গঙ্গার কিনারা দিয়ে লম্বালম্বি শহর। তাও মাঝে ইংরেজদের পকেট। সেই পকেট পেরিয়ে গৌরহাট্টি হল ফরাসীদের ক্ষুদ্রতম পকেট। চন্দননগর আর গৌরহাট্টির মানুষ মেয়র কাউন্সিলের মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। অরুণবাবু স্থিরধী। অপেক্ষা করছিলেন ইয়ানন থেকে ফরাসী জাহাজে আমদানীকৃত খাবারের। চন্দননগর ও গৌরহাট্টির কোন অধিবাসীকে অনাহার থাকতে দেয়নি এই মেয়র কাউন্সিলর। আর এই দায়িত্ব পালন করছিলেন অরুণদা। অরুণ দত্তের খদ্দরের চাদরে কোন কালিমাই কখনও লাগেনি।

চন্দননগর বাস হয়ে উঠেছিল ভীতিপ্রদ।

আমাদের কাছে সংবাদ ছিল, চন্দননগরে স্বদেশীওলারা ঘাঁটি করেছে জেনে ইংরেজ সরকারের গোয়েন্দারা তৎপর হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য এই গোয়েন্দারা সবাই বাঙ্গালী।

অতএব কোন উষাকালে নৌকা চেপে চন্দননগরকে পেছেন রেখে নৈহাটিতে ডেরা বাঁধার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

শ্রীঅরবিন্দও চন্দননগর থেকে নিরাপদ এলাকা পণ্ডিচেরিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পেতে। অবশ্য, তখন

আর শ্রীঅরবিন্দ বিপ্লবের প্রতীক ছিলেন না। কেন, সেটা গবেষণার বিষয়। আমি কিছুকাল আগে পণ্ডিচেরি দেখে এসেছি।

কি দেখে এসেছ ?

আপনারা যা দেখেছেন, আমিও তা দেখেছি। সমুদ্র কিনারা বাঁধিয়ে অনবদ্য বিশ্রামের স্থান, সহজ সরল সমুদ্র স্নানের ব্যবস্থা, পরিষ্কার রাস্তাঘাট। সুচিন্তিতভাবে গড়ে তোলা একটি আধুনিক শহর।

এটাতো সবাই দেখে থাকে। আর কিছু নয়।

বলতে সাহস পাচ্ছি না নতুনদি।

কেন ? আমি বাঘও নই, ভালুকও নই।

বাঘ-ভালুককে ভয় করি না। যখন মানুষের কোন অলৌকিক বিশ্বাসে আঘাত লাগলে হিংস্র হয়ে ওঠে তখন সেই মানুষকে আমি ভয় করি। আপনি নিশ্চয়ই অরবিন্দ আশ্রমের পরিবেশ লক্ষ্য করেছেন। যেমন শান্ত তেমনি সমাহিত। কোন অদৃশ্য শক্তি আকর্ষণ করে সাধারণ মানুষকে ওই পরিবেশের সামিল হতেই শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমার (আলফ্রাঁ মেরী) যোগ সাধনা নতুন পথের নির্দেশক।

বললাম, আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন শ্রীঅরবিন্দের সমাধির চারপাশে বিশেষ করে যেদিকে তার পায়ের অবস্থান সেদিকে বহুলোক বহুক্ষণ কপাল ছুঁইয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে থাকেন ঋষি শ্রীঅরবিন্দর প্রতি। যারা ভক্তিমান নয় তারাও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় এই সমাধির সামনে। জানেন নতুনদি, বর্মায় যেখানে ভারতের শেষ মোগল বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরকে সমাহিত করা হয়েছে তার সামনেও সারিবদ্ধ ভাবে ভক্তিমান হিন্দু-মুসলমান ও বৌদ্ধরা চেরাগ জ্বালিয়ে বাদশাহের প্রতি সম্মান জানায়। মানুষ কখনও মৃতের সঙ্গে লড়াই করে না। সেই মৃত-ব্যক্তি মহান হোক অথবা দুর্বলই হোক, তার কর্মজীবনের ত্রুটিগুলো ভুলে যায়, তার গুণাবলীই আকর্ষণ করে, শ্রদ্ধা জাগ্রত করে সাধারণ মানুষের মনে। পৃথিবীর সর্বত্রই এক চিত্র দেখতে পাবেন। মৃতের সঙ্গে কেউই লড়াই করে না।

ঋষি অরবিন্দ ভারতের মুক্তিযুদ্ধের পথ প্রদর্শক ছিলেন। আলাপ আলোচনা আবেদন নিবেদন যে ইংরেজের হৃদয়ে মানবতাবোধ জাগিয়ে তুলতে পারে না এবিষয়ে শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন নিশ্চিত। ইংরেজ হটাতে হলে প্রয়োজন আসুরিক বলের সেই পথের পথিক ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ। কারাবাস কালেই আধ্যাত্মিকতায় যে স্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন তারই সম্পূর্ণ প্রকাশ ঘটাতেই তিনি পণ্ডিচেরির সমুদ্রতীরে এই সাধনাস্থল গড়ে তুলেছিলেন। যতদূর মনে হয় ভারতীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মবাদের প্রভাবই তাঁকে নিয়ে এসেছিল এই সাধনমার্গে। কতটা সাফল্যলাভ করেছিলেন সেটা আজও গবেষণার বস্তু কিন্তু একটা শান্তির হাওয়া বইয়ে দিয়েছিলেন বহুজনের মনে।

একদিন একাকীই বসেছিলাম সমুদ্রের কিনারায় সিমেন্টের রেলিং-এ হেলান দিয়ে। সাগরের মিঠে বাতাসে কেমন ঝিমুনি এসেছিল : হঠাৎ মনে হল দূর থেকে কতকগুলো পালতোলা জাহাজ এগিয়ে আসছে বন্দরের দিকে। কার

জাহাজ। কেন আসছে। আড়াই-শ বছর পেছনে তাকিয়ে দেখলাম জাহাজগুলোর মাথায় উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক্, তারপর কামানের শব্দ। প্রত্যুত্তর দিল উপকূলরক্ষী বাহিনী। অসম লড়াই, ভেঙ্গে পড়ল দুপ্লের প্রতিরোধ। আয়ার কুটের বাহিনী দখল করল পণ্ডিচেরির মাটি। ইতিহাসের ঝাপসা পৃষ্ঠাগুলো যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম।

কে ওখানে মাথা নিচু করে গালে হাত দিয়ে চোখের জল ফেলছে? আরে, এযে দুপ্লে সাহেব! পরাজয়ের গ্লানি ভুলতে সমুদ্রের ধারে বসে হতাশায় রোদন করছে। সামনে ভগ্নপ্রায় একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে, বন্দরের কোণায় ভিড়তেই দুপ্লে উঠে পড়লেন জাহাজে, জাহাজ ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলল সিংহলের দরিয়াতে। জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে সাম্রাজ্য স্থাপনের নৈরাশ্য নিয়ে দুপ্লে শেষ নমস্কার জানাল ভারতের তটভূমিকে। তবুও ফরাসীরা নিশ্চিহ্ন হয়নি এদেশ থেকে। ইংরেজ শোষণ ভিন্ন অন্য কোন নীতিতে বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু ফরাসীরা তাদের অধিকৃত উপনিবেশের মানুষের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার না করলেও রাজনৈতিক ভাবে উপনিবেশের মানুষদের ফ্রান্সের অধিবাসীর অধিকার দিয়েছিল।

পাশে এসে বসলেন বয়স্ক তামিল ভদ্রলোক।

অপরিচিত লোক দেখে কি মনে করলেন জানিনা তবে অতি মোলায়েম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি নবাগত?

আজ্ঞে হাঁ।

বাঙ্গালী বুঝি। বাঙ্গালীরাই এখানে বেড়াতে আসে। ভ্রমণকারীদের শতকরা আশীজনই বাঙ্গালী। আপনারা বেড়াতে খুব ভালবাসেন, নয় কি?

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমিও বেঙ্গলে কয়েকবার গিয়েছি।

কোথায়?

চন্দননগর।

হেসে বললাম, চন্দননগর কিন্তু বেঙ্গল নয়। বেঙ্গল মস্ত বড় জায়গা।

উনি বললেন, তা ঠিক কিন্তু আমি ছিলাম ফরাসী সেনাবাহিনীর কর্ণেল। চন্দননগরের নিরাপত্তা পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিলাম। একবার কলকাতাতেও গিয়েছিলাম। ফোর্টে যেতে হয়েছিল।

আপনি যুদ্ধে গিয়েছিলেন।

ওটা তো বাধ্যতামূলক। আমি এখনও ফরাসী নাগরিক, এখনও ফরাসী সরকারের অবসর ভাতা পাচ্ছি। আমরা কয়েক পুরুষ বাস করছি পণ্ডিচেরিতে। তবে কিছুই করতে পারিনি। একটা বাড়ি সম্বল। এটাও আমার ঠাকুর্দার আমলে তৈরি, আমরা কিছুটা রদবদল করেছি।

ফরাসী উপনিবেশ ভারতে যুক্ত হওয়াতে আপনি খুশি হয়েছেন কি?

বড়ই কঠিন প্রশ্ন করেছেন। আমি ফরাসী দেশের নাগরিক, আমার পক্ষে

ফরাসী প্রশাসনই নিশ্চয়ই সুখকর ছিল নইলে এখনও নিজেকে ফ্রান্সের অধিবাসী বলে দাবী করতাম কি ?

অনেকক্ষণ মৌন থেকে আবার বললেন, ফরাসীরা কখনও আমাদের ছোট মনে করত না, কখনও আমাদের গোলাম করে রাখতে চায়নি। ফরাসীরা চলে যাবার পর এখানকার মূল অধিবাসীও নিজেদের ভারতীয় বলে দাবী করলেও ফরাসী রাজ্যে যে সুখশান্তি ছিল তা আজ আর নেই। ইংরেজরা তাদের সাম্রাজ্য কায়েম রাখতে যে সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়িয়েছিল ভারতের মূল ভূখণ্ডে তার বিন্দুমাত্র এখানে কখনও দেখা যায়নি। এখন মানসিকতার পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে অতি ধীরে। আমরাও ভীত হয়েছি। ভাবছি বাড়িঘর বিক্রি করে ফ্রান্সে গিয়ে বাস করব।

কর্ণেল আলফানসোর কথা শুনতে শুনতে কেমন হয়ে পড়েছিলাম। মন ছুটে গেল দুরন্ত বেগে তমাচ্ছন্ন অতীতের গুহায়।

আমাকে অন্যমনস্ক দেখে নতুনদি বললেন, পণ্ডিচেরি আর চন্দননগরের জয়গান করতে করতে তুমি যেন ভাব জগতে প্রবেশ করেছ।

আমি শুধু হাসলাম।

কি ভাবছ ?

ভাবছি, একটা ঘটনার সঙ্গে কত ঘটনা যুক্ত হয় তার ঠিক ঠিকানা নেই। কর্ণেল আলফানসো যখন বললেন, তাদের এই ছোট্ট কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে কোন সময় সাম্প্রদায়িক চিন্তা মাথা চাড়া দিতে পারেনি তখনই অসাম্প্রদায়িক কত কথাই আমার মনে এসে ধাক্কা দিচ্ছিল।

তখন দেশ বিভাগ হয়নি।

ছোট লাইনের গাড়িতে চেপে চলেছি। কত নদী নালা পার হয়ে, কত ছোট বড় গ্রাম শহর পেরিয়ে ট্রেন এসে দাঁড়াল আখাউরা স্টেশনে।

নামতে হল। গন্তব্যস্থল পৌঁছতে হলে এখানে গাড়ি বদল অনিবার্য। গন্তব্যস্থলের গাড়ি ছাড়বে শেষরাতে।

বর্ষাকাল। খাল বিলগুলো জলে জলময়। মূল রাস্তাটা এই জলময় স্থানকে বাঁয়ে করে রেললাইন পেরিয়ে ছুটে গেছে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলায়।

শুনলাম, এখান থেকে আগরতলার বাস ছাড়ে। ভাড়া মাত্র ছয় পয়সা। যে সময়ের কথা বলছি সে সময় ছয় পয়সার যথেষ্ট মূল্য ছিল।

হঠাৎ একজন ছুটে এসে বলল, কোথায় যাবেন কর্তা ?

সিলেট।

রাত বারটায় গাড়ি। হোটেলে গিয়ে খেয়ে নিন। আমার হোটেলে মাত্র এগার পয়সায় ভাত, ডাল, তরকারি, রুইমাছের ঝোল আর ইলিশমাছ ভাজা। চলুন।

বললাম, রেলের ক্যাটারিং-এ খাব মনে করেছি।

পাগল। রেলের হোটেলে কান মোলে পয়সা নেবে, খাবারও ভাল পাবেন না। আমার হোটেলে খেয়ে তৃপ্তি পেলে তবেই পয়সা দেবেন।

গুটি গুটি পায়ে হোটেলওলার পেছনে পেছনে তার হোটেলে যেতে হল।

হোটেলের সামনে যেতেই আরও দুজন ফিরিস্তি দিয়ে বলল, আমাদের হোটেলে মাত্র দশ পয়সা কর্তা।

বললাম, এর হোটেলে কথা দিয়েছি।

ভাল করেছেন। ওর কোন হোটেল নেই। এগার পয়সায় এক পয়সা ওর কমিশন।

আচ্ছা নতুনদি, আজ আমরা একথা চিন্তাও করতে পারিনা যে একজন জওয়ান ছেলে মাত্র একটি পয়সা কমিশনের জন্য রেল স্টেশনে খদ্দের পাকড়াও করতে ছুটাছুটি করে। সে সময়ে একটা পয়সার মূল্য নেহাত কম ছিল না। সারাদিনে দশ পনেরজন খদ্দের টানতে পারলে সেই উপার্জনে একটা লোকের নিরাপদ জীবিকার ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব ছিল।

এই দৈন্য ও কৃচ্ছ্রতা পরখ করে কেমন যেন নাড়ি ছাড়ার উপক্রম হয়েছিল।

আমার মত ছন্নছাড়া হতভাগ্য মানুষও সেই লোকটির কথা ভাবতে ভাবতে কেমন আত্মহারা হয়ে গিয়েছিল।

সিলেট যাবার গাড়িটা প্লাটফরমেই দাঁড়িয়েছিল।

খেয়েদেয়ে বাঙ্কের ওপর চাদর বিছিয়ে শোবার আগে কেমন কৌতূহল জাগল মনে। ধীরে ধীরে প্লাটফরমে নেমে দাঁড়ালাম। আকাশে মেঘের আনাগোনা, মাঝে মাঝে চাঁদ উঁকি দিচ্ছিল ভাঙ্গা মেঘের মাঝ দিয়ে। হঠাৎ চোখে পড়ল, সেই লোকটি স্টেশনের কেরাসিন তেলের আলোর নিচে বসে কি যেন করছে। অতি সতর্কভাবে এগিয়ে গেলাম তার কাছে।

আমাকে দেখে হকচকিয়ে গেল লোকটি। আমাকে কেরাসিন আলোর ক্ষীণ রশ্মিতেও চিনতে পেরেছিল।

কিছু বলবেন ?

বললাম, না। এখানে কি করছেন ?

সারা দিনের উপার্জনের হিসাব করছি। তা আজ হয়েছে প্রায় ছয় আনা। আজ কিছু কম হয়েছে। অন্যদিন আট দশ আনাও হয়। আপনি তো সিলেট যাবেন। সামনের গাড়িটা যাবে সিলেট। ব্রাঞ্চ লাইন। গাড়িটা সকালে পেঁছিবে।

বললাম, জানি। এই কি আপনার পেশা ?

তা বলতে পারেন। অন্য কোন পথ তো পাইনি তাই ভাতের হোটেলের দালালি করি।

কথা বলতে বলতে আমি গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই বললাম, ফিরতি পথে আবার দেখা হবে।

লোকটি কি যেন ভাবল, তারপর গাড়িতে উঠেই আমার পাশে বসল।

আপনি কি মহাপ্রভুর পিতৃভূমি দেখতে যাচ্ছেন।

ওটা ফাউ। মানে যে কাজে যাচ্ছি সেটা করতে পারলে তখন মহাপ্রভুর পিতৃভূমি দর্শন করতে যাব। তবে নিশ্চিত করে বলতে পারছি না।

শাহ জালালের মাজার ও দরগা দেখতে ভুলবেন না।

মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের পিতৃভূমি শ্রীহট্টের দত্তরাইল গ্রামে।

মুসলমান সম্প্রদায় শাহজালালের জন্য যেমন গৌরববোধ করে হিন্দুরাও ঠিক একইভাবে শ্রীহট্টকে পবিত্রভূমি গণ্য করে থাকে। শ্রীহট্ট তথা সিলেটের শাহ জালালের মাজার ও দরগাকে দর্শন ও শ্রদ্ধা জানানো মুসলমানরা পবিত্র কর্তব্য মনে করে হিন্দুরাও একইভাবে মহাপ্রভুর পিতা জগন্নাথ মিশ্রের জন্মস্থান দত্তরাইলকে পবিত্র স্থান মনে করে এবং বহুদূর থেকে হিন্দু তীর্থযাত্রীরা বিশেষ বিশেষ পর্ব দত্তরাইলে সমবেত হয়।

দত্তরাইল শহর থেকে চৌদ্দ মাইল দূরে।

পথও দুর্গম। পাকা সাড়ে তিন ঘণ্টা পদব্রজন করে দত্তরাইলে পৌঁছলাম। তখন উৎসাহের চেয়ে হতাশা আমাকে পেয়ে বসল। গ্রামটি প্রায় জনশূন্য। চৈতন্যদেবের উত্তরপুরুষ অথবা জগন্নাথ মিশ্রের জ্ঞাতি হয়ত কেউ কেউ আছেন। পাঁচশত বৎসর পর বংশধারা কতটা সঠিক কতটা নিষ্কলঙ্ক তা বলা কঠিন।

মহাপ্রভুর মন্দিরে দেখলাম অনেক সেবাইত। তারা বংশ পরম্পরায় এই মন্দিরের পূজারী, কেউ কেউ সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্তন করে থাকে রোজই। এদের কেউ কেউ চৈতন্যদেবের পিতৃবংশের উত্তরপুরুষ এটাও দাবী করে থাকেন।

ইংরেজ রাজত্ব অবসান সমাসন্ন জেনে দত্তরাইলের অধিকাংশ হিন্দু অধিবাসী চলে গেছেন কাছাড় জেলায়, কেউ কেউ আয়ও উজানে নওগাঁর। তেজপুরেও আশ্রয় নিতে আরম্ভ করেছেন অনেকে।

গ্রাম জনশূন্য নয় তবে তারা গ্রাম শূন্য করে অন্যত্র পাড়ি জমাবার চিন্তায় বিভোর।

কোন বাহুল্য নেই।

মন্দির পরিচর্যা চলছে টিমটিম করে।

দুর্গম এই গ্রাম থেকে জগন্নাথ মিশ্র শচীদেবীর হাত ধরে অনিশ্চিত যাত্রা আরম্ভ করেছিলেন, লক্ষ্যস্থল নবদ্বীপ কিন্তু শ্রীহট্ট থেকে নবদ্বীপের দূরত্ব কয়েক শত মাইল। তৎকালে পায়ে হেঁটে এবং নৌকা যোগেই এই পথ অতিক্রম করা কতটা যে কঠিন তা আজ আমাদের কল্পনার বাইরে।

জগন্নাথ মিশ্রের গমন পথের সঠিক বিবরণ না পাওয়া গেলেও এটা অনুমান করা মোটেই ভুল হবে না যে যুবতী স্ত্রী শচীর হাত ধরে জগন্নাথ মিশ্র পথে বেরিয়েছিলেন তাতে তাঁর সাহস নিষ্ঠা ও অকুতোভয় চরিত্র শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার উপযুক্ত। এহেন পিতার পুত্র নিমাইও ছিলেন সাহসী, নিষ্ঠাবান।

কেন জানি না, মহাপ্রভুর পিতৃভূমিতে মহাপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ যথাযথ

মর্যাদা পান না।

সন্ন্যাস নেবার পর মহাপ্রভু তার পিতামহীকে দর্শন করতে নবদ্বীপ থেকে সপারিষদ এসেছিলেন দত্তরাইল গ্রামে। সেই সময় তার আশীর্বাদে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁর প্রদত্ত বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। বাংলার বৈষ্ণব আজ সমাজের পীঠস্থান এবং মহাপ্রভুর পদধূলি লাভে ধন্য এই গ্রামের মানুষ যেন ভুলে গেছে এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য। তাদের কাছে সবই যেন কিম্বদন্তী।

অপরাহ্ন অবধি মন্দির প্রাঙ্গণে বসে অতীতকে মনে করতে চেষ্টা করছিলাম। ভগ্নপ্রায় মন্দিরের দৈন্যদশা আমাকে ব্যথিত করলেও স্থানীয় লোকদের মনে তেমন রেখাপাত করেছে এমন মনে করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে সেবাই তাদের আর প্রদত্ত কিছু খিঁচুড়ি প্রসাদ গলাধিকরণ করে ফিরতি পথ ধরলাম।

শহরে পেঁছিলাম তখন বেলা গড়িয়ে গেছে।

অনেকের মনে একটা ধারণা স্থান করে নিয়েছিল। সিলেটের গ্রাম্য পরিবেশে যেখানে মুসলমানদের গরিষ্ঠতা রয়েছে সেখানে সব সময়ই জমিজমা নিয়ে কাজিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। শহরে আসত তারা ফৌজদারি অথবা দেওয়ানি মামলা রুজু করতে অথবা তদ্বির করতে। এই সব ভাসমান জনতাদের আশ্রয় দিত কিছু হোটেল। সেগুলির পরিচালনার মালিকানা ছিল মুসলমান ব্যবসায়ীদের। হিন্দুদের বাসস্থান ছিল না। হিন্দু হোটেল থাকলেও সেখানে আহার্য ভিন্ন আর কিছু পাওয়া যেত না। রাত্রিবাস তো নৈব নৈব চ।

আমাকে আশ্রয় নিতে হয়েছিল মুসলমানের হোটেলে।

হোটেলের পাশেই ছিল ছোট ছোট কামরা? কোনটার ঝাঁপ আছে, কোনটার নেই, তবে বাস করতে অসুবিধা নেই তাদের যারা উন্নাসিক ও ধর্মান্ধ নয়, যাদের সামর্থ্য সীমাবদ্ধ।

সন্ধ্যার অন্ধকার নামতেই আমি আমার মনোমত একটি কামরা বেছে নিয়ে বড় মিঞা খালেককে বললাম, কটা দিন এখানে থাকতে চাই।

খালেক মিঞা গদগদ হয়ে বলল, আপনার তকলিফ্ হবে সাহেব। আমাদের হোটেল তো সেই সব মুশাফিরদের জন্য যারা সিলেটি গ্রাম্যজীবনের সঙ্গে পরিচিত। আপনি ভিন্ জায়গার লোক।

বললাম, তা ঠিক কিন্তু আমি যে কাজে এসেছি তা শেষ করতে আরও দুদিন দরকার। এই দুদিন এখানে রাত্রিবাস করব কোনরকমে। দিনের বেলায় বাইরে বাইরেই কেটে যাবে।

খালেক মিঞা চিৎকার করে ডাকল, এই শরিফা।

জি মালিক, বলে একটি মধ্যবয়সী কুৎসিৎ দর্শনা মেয়ে এসে দাঁড়াল।

সাহেবের জন্য পশ্চিমের কুঠুরিটা খুলে দে। সাহেবের খানাপিনার কোন অসুবিধা যেন না হয়। তুই দেখবি আর কাদেরকে বলবি। সাহেব শরীফ আদমি, ঠিক ঠিক যেন খেদমত করে।

শরিফা মাথা নেড়ে ইশারায় আমাকে ডেকে পশ্চিমের একটা কুঠরি দেখিয়ে দিয়ে বলল, সাহেবের বিস্তারা আছে কি ?

বললাম, আছে।

এই মাচাং-এ পেতে নেবেন। যখন যা দরকার হবে আমাকে ডেকে বলবেন। আমি এন্তেজার করব। বাতি দিয়ে যাব, রাতের খানা খেয়ে ঝাঁপ বন্ধ করে শুয়ে পড়বেন। কোন ভয়ডর নেই। এই তল্লাটে খালেক মিঞার নামে বাচ্চা-চেংড়া পিসাব করে ফেলে।

শরিফার বলার ভঙ্গী ও শালীনতাবোধের অভাব ভালভাবে হজম করে চুপ করে বসে রইলাম।

আপনার বিস্তারার কোথায় ? বাইরে। এনে দিচ্ছি।

ঝটিতে শরিফা বেরিয়ে গেল। ফিরে এল আমার ছোট বেডিং নিয়ে আর একটা কাঁচভাঙ্গা হ্যারিকেন লণ্ঠন নিয়ে। দেওয়ালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে লণ্ঠনটা টাঙ্গিয়ে বিছানার দড়ি খুলে মাচাং-এ ছড়িয়ে দিল। জিজ্ঞাসা করল, আপনার তাকিয়া নেই, মানে বালিশ নেই ? বললাম, না।

শরিফা ঝড়ের বেগে আবার বাইরে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যে তেলচিটা নোংরা ছোট্ট একটা বালিশ এনে বলল, এই নাও মিঞা তাকিয়া। আজ রাত কাটাও, কাল তোমার জন্য ভাল তাকিয়া এনে দেব।

রাতের খাওয়া মিটিয়ে সবে মাত্র শোবার উপক্রম করেছি এমন সময় ঝাঁপটা নড়ে উঠল।

কেমন ভয় ভয় লাগল। চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম ? কে ? কে ?

চেল্লাবে না, আমি শরিফা। দেখতে এলাম মিঞার কোন তকলিফ হল কি না। ঝাঁপটা খোল, পানির বদনা এনেছি। দরকার ফল পিয়াস মিটবে। আবার পাখানাও যেতে পারবে।

হঠাৎ এত দরদী বাঁদির কথায় সত্যি সত্যি ভয় পেয়েছিলাম। ভয় যে অমূলক নয় তা পরদিন বুঝেছিলাম। শরিফাও বলেছিল, সিলেট এসে শাহজালালের মাজার দরগা না দেখলে, মোনাজাত না করলে গুনাহ হয় মিঞা।

জিজ্ঞাসা করলাম, মাজার আর দরগা কোথায় ।

শহরে। একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে যেতে পার। হেঁটে যেতে পার। লোক পুছতে পুছতে মক্কা শরিফে যায় তুমি শাহজালালের দরগায় যেতে পারবে না। কেমন মরদ গো তুমি। না যেতে পারলে মালিকের হুকুম নিয়ে আমি-ই তোমার সঙ্গে যাব।

কি বলব, ভেবে পাচ্ছিলাম না।

কেবলমাত্র মাথা নেড়েই হ্যাঁ-না দুটোই বুঝিয়ে দিলাম।

শরিফাও খুশি হল কিন্তু আমার বিছানা চেপে যেমন বসেছিল সেখান থেকে ওঠার কোন লক্ষণ দেখলাম না।

শরিফার চালচলন মোটেই প্রীতিপ্রদ মনে হল না বললাম, আমি এবার

শোব। তুমি যাও তোমার কাজে।

তবুও সে বিছানার কোণায় যেমন বসেছিল তেমনি নির্বিকারভাবে বসে রইল।

আমি ঘর ছেড়ে বাইরে যাবার চেষ্টা করতেই শরিফা বলল, শাহজালালের কেচ্ছাকাহিনী কি তুমি জান মিঞা।

না।

তুমি কিছুই জান না। এখানে যারা রাত কাটায় তারা আমোদ আহ্লাদ করে কাটায়। তুমি কেমন যেন।

বিপদের কালো মেঘ সামনে।

শোন শরিফা, আজ সারাদিন রোদে রোদে ঘুরেছি। শরীরটা ভাল নেই। কাল রাতে তোমার সঙ্গে কথা বলব। হোটেলের কাজ শেষ করে এস। কেমন।

এইবার শরিফা নড়ল। নামল বিছানা থেকে।

বেশ তাই হবে। খালেক মিঞার খবরটা করে এসে দেখা করব।

শরিফার হাত থেকে সাময়িক মুক্তি পেলেও নিরাপদ নই তা বুঝতে পেরেছিলাম। যেমন করে হোক হোটেলটা না ছাড়লে কমলি আমাকে ছাড়বে না। সকালবেলা উঠেই শাহজালালের মাজার দেখতে বেরিয়ে পড়লাম।

শাহজালাল ছিলেন আরবের কোরেশ বংশধর।

হজরত মহম্মদের যে বংশে জন্ম সেই বংশেই জন্মেছিলেন শাহজালাল। বংশ পরিচয়ে শাহজালাল মুসলমান সমাজের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। পীর শাহজালালের অলৌকিক ক্ষমতার কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থানীয় ও দূরাগত মুসলমানরা শাহজালালের আশীর্বাদ পেতে এখনও তার মাজারে প্রতি সপ্তাহে ভিড় করে। যতদূর জানা গেছে শ্রীহট্টে মুসলমান রাজত্ব কায়েম হবার মূলে ছিলেন পীর শাহজালাল। এটা ধ্রুব সত্য।

পাঁচশত বছর আগে যখন মুসলমান রাজত্ব কায়েম হয়েছিল শ্রীহট্টে তখন থেকেই হিন্দু-মুসলমানের সৌহৃদ্য অটুট ছিল। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই শাহজালালের মাজারে চেরাগ জ্বালায়, সবাইয়ের খাবার ব্যবস্থা করে, সিন্নি দেয়। কোন বিদ্বেষ ঘৃণা কারও মনে ছিল না।

অবশ্য এগুলো আমি পরখ করিনি। লোক মুখে শুনেছি, শাহজালাল ছিল বিশ্বভ্রাতৃত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কোন স্থান সাময়িক পরিভ্রমণ করে তথাকার অবস্থা বিচার কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবুও মনে হল সেকালেও বহু সুফীসন্ত মুসলমান সমাজে জন্মেছিলেন। তাদের নিরপেক্ষ দৃষ্টিও ছিল সবার প্রতি সমান ব্যবহারে, আজও আমাদের মনে এই সব স্থান করে রয়েছে। আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের স্মরণ করি। শাহজালালের মতবাদ শিক্ষা জানার কোন উপায় আমার জানা ছিল না তবুও তাঁকে সুফী মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা মনে করতে কোন দ্বিধা ছিল না।

আমার কাছে মৌলবাদী আর সুফী এদের তারতম্য প্রকট হয়েছে দেশভাগের

সময়। আমার অনেক বন্ধুবান্ধবকে দেখেছি উদার মতাবলম্বী অথচ দেশভাগের আগে তাদের কেউ কেউ উগ্র মুসলমান হয়ে পাকিস্তানের সমর্থনে প্রচার করেছে। সেকেন্দারের কথা আগেই বলেছি। তখনও যারা ভারত ছেড়ে যায়নি তাদের কেউ কেউ হঠাৎ উগ্র ভারতীয় হয়ে মুসলীম লীগের বিরোধিতা করতে করতে একদিন অতি গোপনে ভারতের মাটি ছেড়ে পাকিস্তানে হাঁটা দিতে কসুর করেনি। সেকেন্দারের কোন গোপন মতলব ছিল না, সে প্রকাশ্যেই ভারতের বিরোধিতা করেছে কিন্তু যারা মুখোশ পড়ে সুযোগ খুঁজছিল বিনিময় অথবা বিক্রি করে পালাতে তাদের চেনা হয়েছিল কঠিন।

শাহজালালের মাজারের খাদেম বলল, পীরসাহেব খড়ম পায়ে দিয়ে রোজ বিকেলে সুরমা নদী পার হয়ে ওপারে ইসলামের বাণী শোনাতে যেতেন। আবার মাঝরাতে খড়ম পায়ে দিয়ে নদী পেরিয়ে ফিরে আসতেন। কি অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তা নিশ্চয়ই মেনে নেবেন।

আমি আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করলাম, আরও কিছু ঘটনা বলুন।

অনেক রুগী আসত পীরের দরগায়। পীরসাহেব পাণিপড়া খাইয়ে তাদের নিরাময় করতেন।

আমার জানার ইচ্ছা এবার লোপ পেল।

খাদেম বলতে থাকে, আজমীর শরীফ গেছেন কখনো ?

না। আপনি গেছেন কি ?

একবার গিয়েছিলাম। ওই যে দেখছেন তামার ডেকচি, একরম একটা ডেকচি আছে আজমীরে। বাদশাহ আকবর ডেকচিটা উপহার দিয়েছিলেন চিস্তি সাহেবকে। ওই ডেকচিতে ছয় মন চালের ভাত রান্না হয় একবারে। এখানেই দু'মন চালের ভাত ফোটানো হয় ওই ডেকচিতে। এটাও বাদশাহ সুলতানদের দান।

চালুক্য হোটেলের মালিক-ম্যানেজারকে যতটা অসামাজিক মনে হয়েছিল কার্যত তাঁদের ব্যবহার ছিল অতি ভদ্র ও সমাজ সম্মত। গেটের সামনে আমাদের গাড়ি বারবার হর্ণ দিয়ে আমাদের ত্বরিতে গাড়িতে উঠবার আহ্বান জানাচ্ছিল। আমরাও স্নান করে সাজগোজ করে দোতলা থেকে নিচে নেমে এলাম। ম্যানেজার আমাদের ঘরের চাবি চেয়ে নিলেন। অনেকেই মহীশূরের অভিজ্ঞতাকে বড় করে দেখতে ভুল করেনি। তাঁরা চাবি দিতে ইতস্তত করছিল। নির্মলবাবু নির্বিকারভাবে চাবিটি ম্যানেজারের কাছে জমা দিয়ে সোজা ছেলে মেয়েদের হাত ধরে গাড়িতে উঠে বসলেন।

পা ভাঙ্গা সেই মেয়েটা আর তার স্বামী সহজভাবে চাবি দিতে সামান্য আপত্তি না করেছিলেন এমন নয় কিন্তু সবাই যখন চাবি তুলে দিল ম্যানেজারের হাতে তখন তারাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও, চাবি জমা দিলেন। এবং খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠলেন গাড়িতে।

তাদের অবস্থা দেখে হাসি রোধ করতে পারছিলাম না।

নতুনদি আমাকে হাসতে দেখে একটু বিরূপ ভাবে বলল, হাসছ কেন ?

আশঙ্কা। অর্থাৎ শ্রীমান ও শ্রীমতী মহীশূরের গলাধাক্কাটা ভুলতে পারেননি। এখানেও যদি কিছু ঘটে এই আশঙ্কায় চাবি জমা দিচ্ছিলেন না।

তা ঠিক।

আমি যখন মায়ের হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা করতে শিখেছিলাম তখন কি জানতাম আমার হাঁটার রেস চলবে জীবনের শেষ দিন অবধি। আর চলার পথে কত যে লাঞ্ছনা, অপমান ও বিঘ্ন পেরোতে হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

যেমন ?

প্রথম জীবনে রাজগৃহ দর্শনের আশা নিয়ে দিল্লি জংশন স্টেশনে যখন নামলাম তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বাঁধেনি। এই প্রথম দিল্লি আগমন। কাউকে চিনি না, কোন পরিচয় নেই কোন স্থানের সঙ্গে। দুদিন পরে পরীক্ষায় বসতে হবে অর্থাৎ মাঝে একটা দিন। এর মধ্যে বাসস্থান সংগ্রহ, পরীক্ষা কেন্দ্র দর্শন শেষ করতে হবে। ছোটবেলা থেকে শুনেছি ভারতের ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিরা তীর্থযাত্রীদের জন্য ধর্মশালা স্থাপন করেছে নানা স্থানে। সামনেই ধর্মশালা, আশ্বস্ত হলাম। একটা রাত কোনরকমে ধর্মশালায় কাটাতে পারলে পরের দিন নিজের প্রয়োজনীয় কাজ ও বাসস্থান খুঁজে নিতে পারব।

আমার হাতে ছোট একটা বিছানা আর ঘাড়ে কাপড় জামার ঝোলা ব্যাগ।

ঢুকলাম ধর্মশালার আঙ্গিনায়।

উৎকট হিন্দিতে আমার নাম, ধাম ও দিল্লিতে আসার উদ্দেশ্য জানতে চাইল ধর্মশালার কেরাণী।

অকপটে বললাম।

কেরাণী বলল, এখানে স্থান হবে না।

অবাক কাণ্ড। বিনীতভাবে বললাম একটা রাত কাটাব। সকালে চলে যাব। আমি কখনো দিল্লি আসিনি তাও বললাম।

উত্তর পেলাম, হবে না। শাকাহারী ভিন্ন অন্য কাউকে স্থান দেওয়া নিষেধ।

আমি বারান্দার এক কোণায় বিছানাটা রেখে কলে মুখ ধুতে গেলাম। এসে দেখলাম আমার বিছানা নেই।

আমি এদিক ওদিক তাকাচ্ছি এমন সময় কেরাণী বলল, তোমার বিছানা রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছে।

শাকাহারী নই এই অপরাধের মাশুল আরও দিতে হয়েছে।

বাধ্য হয়ে রাস্তা থেকে বিছানাটা কুড়িয়ে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা হোটেলের সামনে এলাম। সেখানেই যথাযথ দক্ষিণার বিনিময়ে রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করলেও মোটেই শান্তিতে রাত কাটাতে পারিনি।

জীবনে কোন দিন হোটেলে থাকিনি, থেকেছি কলেজের হোস্টেলে সেজন্য হোটেল সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ছিল না। সেই রাতে জানলাম, এসব হোটেলের সাইনবোর্ডটা খুলে বেশ্যালয়ের সাইনবোর্ড দিলে ঠিক সম্মান করা যেত।

সারারাত যুবতীদের আনাগোনা, মদ্যপানের হৈ হুল্লোরে ঘুমতে না পারলেও আমাকে যে ফুটপাতে রাত কাটাতে হয়নি এটাই সৌভাগ্য।

কাশ্মীর হল ভূস্বর্গ।

নরক দেখলাম দিল্লীর এই কাশ্মীরি হোটেলে।

সুন্দরকে কত কুৎসিৎ করা যায় সেটা পরখ করে সকালবেলায় ঘরে তালা দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম নয়াদিল্লির পথে যেখানে আগামীকাল যেতে হবে পরীক্ষা কেন্দ্রে।

আজ তিরুপতি দর্শনে যাব।

বাসে গিয়ে বসতেই বাস চলতে শুরু করল। মনে পড়ল দিল্লির কথা।

তিরুপতির মন্দির শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে একটা পাহাড়ের ওপর। তিরুমালাই পাহাড়।

শহর পেরিয়ে কিছুটা যাবার পর গাড়ি পাহাড়ের বাঁ দিক দিয়ে আঁকাবাকা পথে উঠতে থাকে। গাড়ির জানালা দিয়ে শহরের চেহারাটা স্পষ্ট দেখা গেল। তবে সামান্যক্ষণ মাত্র। বাঁক ঘুরতেই শহর আড়াল পড়ে গেল। পাহাড়ের ওপর থেকে দূরের খোলা মাঠ ও গ্রাম চোখে পড়ল।

চালুক্য হোটেলের ম্যানেজার বলেছিলেন, তিরুপতি উঠবার রাস্তা আর নামবার রাস্তা আলাদা। বাঁ দিক দিয়ে উঠতে হবে আর ডান দিক দিয়ে নামতে হবে। যে পরিমাণ গাড়ি তিরুপতির দিকে যাচ্ছিল তাতে রাস্তা জ্যাম হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু তা হয়নি, গাড়ি কোথাও বাধা পায়নি কারণ 'ওয়ান ওয়ে' ব্যবস্থা।

পাহাড়ের মাথাটা অনেকটা মালভূমির মত। উপরে দোকান, হোটেল, বিশ্রামাগার এমন কি ছোটখাট হোটেলও আছে। আছে বিজয়া ব্যাঙ্কের শাখা।

সবাই চললাম তিরুপতি দর্শনে।

বিধি বাম।

দর্শনের সৌভাগ্য থেকে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছিল।

দ্রুত ব্যবস্থায় তিরুপতি দর্শন করতে হলে পাহাড়ের ওপর যে বিজয়া ব্যাঙ্ক আছে সেখান থেকে পঁচিশ টাকার কুপন কিনতে হবে। তারপর লাইনে দাঁড়াতে হবে। লাইনে সন্ধ্যা অবধি কয়েক শত দর্শনার্থী ভিড় করে থাকে। মাঙ্গিনায় ঢুকে দর্শন করা সম্ভব নয়।

পর পর পাঁচ ছয়টি হলঘর।

প্রথম হলঘর খালি হলে নির্দিষ্ট সংখ্যক যাত্রীকে সেই হলঘরে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী হলঘর খালি হওয়া পর্যন্ত। এক নম্বর থেকে দু'নম্বর, থেকে তিন নম্বর। এমনি করে যখন বিগ্রহ দর্শনের সময় উপস্থিত হবে তখন দু'নম্বর ঘড়ির কাঁটা অপেক্ষার নিমিত্ত আড়াই থেকে তিনঘণ্টা এগিয়ে যাবে।

বিগ্রহের সামনে গিয়েও স্বস্তি নেই। লাইন তখন চলমান, কেবলমাত্র

একবার মুখ ঘুরিয়ে দেবদর্শন করতে না করতে পেছনের ভক্তবৃন্দের ধাক্কায় একেবারে খোলা মাঠে।

বিগ্রহ কষ্টিপাথরের।

সর্বাঙ্গ সোনার পাতে মোড়া।

কপালের বিরাট একটি হীরার দ্যুতি চোখ ধাঁধিয়ে দেয়।

আর সেবাইতরা যে ভাবে নারায়ণ সেবার জন্য ব্যস্ত তা দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ভক্তবৃন্দ তাদের সামর্থ্য মত দক্ষিণা দিচ্ছেন। সেবাইতরা বিরাট পাত্রে টাকা আধুলি ও অন্যান্য ক্ষুদ্র মুদ্রাকে আলাদা আলাদা করে রাখছেন। একটাকা, দুইটাকা, পাঁচটাকা, দশটাকা ইত্যাদি মূল্যের নোট আলাদা আলাদা পাত্রে জমা করছেন। পরিমাণ? বাজারে যখন চালের বস্তা খালি করে দোকানিরা চাল ঢেলে দেয় ঠিক প্রত্যেকটির মুদ্রার ঢাই রয়েছে দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের পদতলে। এই টাকা গোনার জন্য কয়েকজন অতি ব্যস্ত। প্যাকেট বেঁধে বেঁধে একপাশে ছোটখাট টিলার মত জমা করছে। মন্দির অভ্যন্তরে কেবল সোনা। সোনায় সোনাময়।

নতুনদি কষ্ট করে ধৈর্য ধরে তিরুপতি দর্শন করে এলেন।

অন্যান্য দর্শনার্থীদের পাদুকা পাহারা দিলাম আমি ও ঝণ্টু এবং তার দুই বোন।

বাহিরে এসে নতুনদি বললেন, দেখলাম।

কি দেখলেন নতুনদি?

তিরুপতি নয়। দেখলাম কয়েক সহস্র কোটিপতি। সোনা আর মণি-মুক্তার জমক দেখে ঘাবরে গিয়েছিলাম।

বললাম, তিনঘণ্টা পর এই আপনার লাভ?

আরেকটি লাভ হয়েছে ভাই। এতদিন বেঙ্কটরমন, বেঙ্কটাচারি নানা শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েছি। এখানে এসে জানলাম। বেঙ্কট মানে বৈকুণ্ঠ, তিরুপতি মন্দিরের মাথায় হিন্দীতে বৈকুণ্ঠধাম লেখা দেখে মনে হল যত বেঙ্কট, সবই বৈকুণ্ঠের অপভ্রংশ। বড়ই ধর্মপ্রাণ এরা এবং ধর্মকে কিভাবে আর্থিক দিক থেকে লভ্য করতে হয় তাও এদের ভাল ভাবে জানা আছে।

বললাম, এই পাহাড়ের ওপর তিন চারটে পুলিশ চৌকি আছে তিরুপতির সম্পদ রক্ষার জন্য। দিবারাত্র পাহারা থাকে তিরুপতি রক্ষা করতে নয় তিরুপতির তথা সেবাইতদের অর্থসম্পদ রক্ষা করতে। ব্যবস্থা ভাল। তবে এরা একেবারে নির্মম শোষক নয়। এদের অতিথিশালা রয়েছে। এই অতিথি-শালায় প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রীকে বিনামূল্যে পেটভর্তি ভাত ডাল ও নিরামিষ তরকারি খাইয়ে থাকে। এটাও কম কথা নয় নতুনদি।

এরা যা প্রত্যহ উপার্জন করে তার অতি সামান্য অংশও ব্যয় হয় না এই অতিথি সেবায়। আমার সামনে কতকগুলো মুণ্ডিতমস্তক ভক্ত দাঁড়িয়েছিল। তারা তাদের চুল মানত করেছিল তিরুপতির নামে। তারা একটা বিশেষ ঘরে

মস্তক মুণ্ডন করে এসেছে। অবশ্য মূল্য তাদের দিতে হয়েছে। ভক্তির প্রাবল্যে বিশ বছরের যুবতী যখন ন্যাড়া মাথায় তিরুপতিকে প্রণাম করছিল যথাযথ দক্ষিণা দিয়ে তখন বেশ কৌতুক বোধ করছিলাম।

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, বুঝলাম।

কি বুঝলে ?

কলকাতার বাজারে যে পরচুলা বিক্রি হয় তার উৎসমুখ তিরুপতি। ভাল বিজনেস।

নতুনদি আমাদের ডেকে নিয়ে গেলেন একটা গাছতলায়।

আমরা সবাই বসলাম। নির্মলবাবু গেলেন খাবারের সন্ধানে।

নতুনদি আমার কথার জের টেনে বললেন, বিনা মূলধনে লাভের ব্যবসা হল ধর্ম। কলকাতায় তোমরা তো দেখেছ পথেঘাটে শনিপূজার ধুম। মানুষ বড় অসহায় জীব। কোন কিছু অবলম্বন করে বাঁচতে চায়। কোন বিপদ অথবা বিপদের সম্ভাবনা দেখলেই অলৌকিক কিছুর ওপর ভরসা করে। শনি গ্রহ কেউ দেখেনি। শনির কতটা ক্ষমতা তাও জানা নেই। নানা কথা উপকথায় শনিকে দুর্ভাগ্যের কারণ মনে করা হয়। তাই যাতে শনির কোপ থেকে বাঁচা যায় সেজন্য অকাতরে সামান্য অর্থদান করতে দ্বিধা করে না। কিন্তু শনির যেসব সেবক পথেঘাটে শনি প্রতিষ্ঠা করে তাদের শনিমুক্তি ঘটেছে অনেকে বাড়িঘরও করেছে। কিন্তু শনিভক্তদের দুর্দশা ঘুচেছে এমন সাক্ষ্য প্রমাণ আজও কেউ দিতে পারেনি। এটা তো ভাল ব্যবসা।

বললাম, এটা তো আর্থিক শোষণ। আরও বাকি আছে। আপনাকে যে সেকেন্দারের কথা বলেছিলাম, সেই সেকেন্দারের সঙ্গে যখন দেখা হয়েছিল তখন সে যা বলেছিল তাই আপনাকে বলছি।

সেকেন্দার আমার বাড়িতে এসেছিল।

বেহস্তে যাবার সিঁড়ি খুঁজতে গিয়ে এমন আঘাত আসতে থাকে যার জন্য তাকে আইনসম্মত ভাবে সীমানা পেরিয়ে এদেশে আসতে হয়েছিল অবশ্য তার স্থায়ীত্ব ছিল না।

সেকেন্দার খবর দিয়েই এসেছিল।

তাকে সাদরে বসতে দিয়ে সকালের নাস্তাপানির ব্যবস্থা করে জিজ্ঞাসা করলাম, তারপর আছিস কেমন ?

ভাল। মানে, ভাল বললে অনেক প্রশ্ন এড়ানো যায়, অর্থাৎ কোনটাই ভাল নয়।

চা খেতে খেতে মনের আবেগে সেকেন্দার বলছিল, শিক্ষাদীক্ষা সব কিছু মকেজো হয়ে গেছে ভাই। আগে ছিল শিক্ষার অভিমান, সে অভিমান উপে গেছে। আগে ভাবতাম ধর্মটাই বোধহয় মানুষের জীবনে অন্যকে আপন করার একমাত্র যোগসূত্র। এ ভুল আমার ভেঙ্গেছে। এখন বুঝেছি, কালচার, ভাষা,

পরিবেশ এগুলোই অন্যের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে। বাংলার হিন্দুদের আপন-জন মনে করিনি। অথচ কত শত বৎসর আমরা পাশাপাশি বাস করেছি, একভাষায় কথা বলেছি, একই সাহিত্য আমাদের পুষ্ট করেছে। ধর্মের নামে অধর্মকে কায়েম করতেই বুঝতে পারলাম, সীমান্তের পাঠান আর পানজাবিরা আমাদের শাসন করতে এসেছে, শোষণ করতে এসেছে। পাকিস্তানে আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক। চোখ মেলে দেখলাম এই সব পরবাসী এসেছে আমাদের শোষণ আর শাসন করতে এবং তার মূল ভিত্তি গড়ে তুলেছে ধর্মের নামে। ওরা ভোগ করছে, বাংলার সম্পদ পাচার করছে ওদের পশ্চিম পাকিস্তানে। আর আমরা ওদের সেবা করছি বেকুবের মত।

সেকেন্দার বলতে বলতে থেমেছিল।

বলেছিলাম, পৃথিবীতে ধর্মের ধুয়া তুলেই সবচেয়ে বেশি অপরাধ ঘটেছে, সবচেয়ে বেশি নরহত্যা ঘটেছে ধর্মের নামে, সর্বাধিক নারী নির্যাতন ঘটেছে ধর্মের নামে। এসব কোন বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ের কর্ম নয়। সব ধর্মসম্প্রদায় শোষণ আর শাসন করে আসছে ধর্মের নামে সারা পৃথিবীকে। মানুষ বড়ই অসহায়। বাস্তবের সংঘাতে যখন পথ খুঁজে পায় না তখন এইসব ধর্মধ্বজীদের আশ্রয় নেয়।

সেকেন্দার কথার সঙ্গে কথা জুড়ে বলল, ধর্মটা খারাপ নয়। ধর্মের অপ-ব্যাখ্যা আর ধর্মের নামে যে সব অনাচার ঘটে তাতে ধর্মের ভূমিকা মোটেই থাকে না। পবিত্র কোরাণে পয়গম্বর সাহেব যে শিক্ষা দিয়েছেন তার প্রথম কথা হল আল্লা এক ও অভিন্ন। আর তিনি হলেন আল্লার রসুল। আল্লার বাণী তাঁর মায়ফৎ প্রচারিত হয়েছে। কিন্তু আজকের জমানায় কত যে পীর আর মুচ্ছুল্লী, মওলবী, মোল্লা তাদের স্বার্থসিদ্ধি করতে মুসলমান সম্প্রদায়কে বিভ্রান্ত করছে তার সীমা সংখ্যা নেই।

হেসে বললাম, আমরা এর বাইরে নই। কৃশ্চানরাও নয়। ধর্মগুরু ও ধর্মব্যাখ্যাকারের অনাচারে সবাই সমান ভুক্তভোগী।

আমরা বিবর্তনের দাস। বিবর্তন হল, পৃথিবীর ধর্ম। সে বিবর্তন বাদকে উপেক্ষা করে আমরা ছুটতে চাইলে তাতে সাফল্যলাভ সম্ভব নয়। তাও বুঝি, আরবের শুকনো বালির গাদায় যে সব নির্দেশ তৈরি করেছে পরবর্তী উলেমীরা, তার উপযোগিতা শস্য শ্যামল বাংলার পক্ষে তর্কাতীত নয়। অথচ আমরা তা মানতে বাধ্য হই ভয়ে, ভক্তিতে নয়। ইসলামের মহত্ব, পবিত্রতা, বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণী আমরা ভুলে যেতে বসেছি।

সেকেন্দারকে সেদিন উত্তেজিত মনে হয়েছিল।

তাকে অগ্রসর হতে দিলে অনেক অকথা-কুকথা হয়ত বলত। ইসলামের প্রতি তার অনুরক্তিতে কোন খাদ ছিল না। তার যত অভিযোগ মোল্লাতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

এই রকম আলোচনায় আরও একবার নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলাম।

জয়নাল আবেদিন পশ্চিম বাংলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কয়েক পুরুষ ধরে কলকাতায় বাস করেছেন, বাঙ্গালী নন, তবে বাংলার জীবনের সঙ্গে একাত্ম। নিজেই বলেছিলেন, আমি বাঙ্গালী নই, কিন্তু আমি বাংলার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমরা নিজেদের বিহারী বলে দাবী করি না, আমরা বলি আমরা Calcuttan, —কলকাতাইয়া।

জয়নাল বললেন, আমি inspection যাব, দাদা আপনার কোন কাজ আছে কি। না থাকলে চলুন বেড়িয়ে আসি।

পুরুলিয়ার খরা পীড়িত এলাকায় রিলিফের কাজ দেখতে বেরিয়েছেন জয়নাল। আমি তার সঙ্গী। আমাদের বেসরকারী অন্নছত্র দেখতে যেতে হয়েছে কারণ অচিরেই রাজ্যপাল আসবেন রিলিফের কাজ দেখতে।

অনেক দূরে দূরে বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে সেবাকেন্দ্র।

সরকারী জিপে দুজন এগোচ্ছি।

রাস্তায় রাজনীতি, অর্থনীতি সমস্ত পৃথিবীর বোধগম্য যাবতীয় নীতি আলোচনা করতে করতে চলেছি। আমার কথাবার্তায় এমন কতকগুলো শব্দ তাকে শুনতে হয়েছিল যার অর্থ আরবী ভাষা না জানলে সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না।

জয়নাল হঠাৎ কথা বন্ধ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কি হল সাহেব?

ভাবছি দাদা আপনি যে সব শব্দ ও বাক্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করছেন তাতে আপনাকে হিন্দু মনে করতে দ্বিধা বোধ করছি।

হেসে বললাম, আজকের দিনে এটা স্বাভাবিক। যে সময় প্রথম মুসলমানরা এদেশে এসেছিল সে সময় রাজকার্য আরবী ভাষায় চলত, পরবর্তীকালে ব্যবহার হত ফার্সী ভাষা। রাজকার্য পরিচালনা করতে তো কেবলমাত্র মুসলমানদের প্রয়োজন হত না। হিন্দুদেরও প্রয়োজন হত। হিন্দুরা তখন বাধ্য হয়ে আরবী ও ফার্সীভাষা শিখেছিল। হিন্দুদের মধ্যে বহুজন ছিলেন এই দুই ভাষায় বিরাট বিরাট পণ্ডিত। ইংরেজও তার রাজ্য পরিচালনা করত ভারতীয়দের সাহায্যে, তখনও ভারতীয়রা ইংরেজি শিখেছিল যা আজও অব্যাহত আছে। আমার বক্তব্য হল ভাষা কারও নিজস্ব সম্পদ নয়। ভাষা শেখার অধিকার সবারই আছে।

জয়নাল মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, অবশ্যই। কিন্তু আপনি কোরাণের আয়াতগুলো যা নিখুঁত ভাবে বলছেন, এটাই আশ্চর্য!

শুনুন। আমার প্রপিতামহ ছিলেন ফার্সি পড়া মোক্তার। তখন ফার্সি Court language সেজন্য তাঁকে ফার্সি পড়তে হয়েছিল। তখন বিচার ব্যবস্থায় মুসলমানের আইন ব্যাখ্যা করার জন্য দক্ষ লোকের দরকার হত, আবার হিন্দুর আইন ব্যাখ্যা করার জন্য পণ্ডিত দরকার হত। যাকে আজকাল personal law বলে তার ব্যাখ্যা করতে হত ইংরেজ জজের সামনে। আমার

প্রপিতামহ ছিলেন এবিষয়ে পারদর্শী। জমানা বদল হলেও ঐতিহ্য বদল হয় না জয়নাল সাহেব।

জয়নাল আমার কথা সমর্থন করলেন।

দাদা, আমার মনে হয় আমাদের সমাজের লোক যদি আপনার মত শ্রদ্ধা নিয়ে শরীয়ত হাদিস মেনে চলত তা হলে বোধহয় ভারত বিভাগ হত না। কারা এসব করে জানেন কি? মনে করুন। একজন ব্রাহ্মণ যে কোন কারণেই হোক মুসলমান ধর্মের আশ্রয়ে এসেছিল। হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণের স্থান বেশ উঁচুতে, বিশেষ করে পূজারী সম্প্রদায় নিজেদের জাহির করতে কসুর করে না। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলেও তারা সমাজকে শোষণের ফর্মুলাটা ভুলে যায় না। আমাদের মধ্যে কোন শ্রেণীভেদ নেই, ছোট বড় কেউ নেই। আল্লার চোখে সবাই সমান। একসঙ্গে উপাসনা, একসঙ্গে বসে আহার্য গ্রহণ হল ভ্রাতৃত্বের নিদর্শন। নয়া বামুন মুসলমানরা এটা সহ্য করতে পারল না। তারা বুদ্ধিজীবি। অশিক্ষিত মুসলমানদের শোষণ করতে তারা তাদের পুরানো ফর্মুলা জাহির করে পীর হল। অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মগুরু যখন মুসলমান তখন সে মুসলমানদের ধর্মগুরু হতে সচেষ্ট হল। অথচ ইসলাম একমাত্র রসুলকেই ধর্মগুরু বলে স্বীকার করে এবং অন্য কোন গুরু ইসলামধর্মে নিষিদ্ধ। এইভাবে যে চণ্ডাল ছিল, সে হল কসাই, যে ছিল নাপিত সেও ধর্মপরিত্যাগ করলেও তার জাত ব্যবসা ছাড়তে পারেনি।

জয়নাল আবেদিন নিষ্ঠাবান মুসলমান। তার এই মন্তব্য অন্যের পক্ষে কতটা রুচিকর তা বলা কঠিন, তবে নিষ্ঠাবান মুসলমানরা এটা অস্বীকার করবে না নিশ্চয়।

সেকেন্দার ও জয়নাল আবেদিনের কাহিনী বলেই নতুনদির মুখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমরা আরও বড় ধরনের মূর্খ। মুসলমানরা তাদের ধর্মকর্ম করে থাকে নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে আর আমরা এজেন্ট দিয়ে ঈশ্বর উপাসনা করি, আমরা বিশ্বাস করি এজেন্ট তথা পুরোহিত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অর্ধ-শিক্ষিত। পুরোহিতরা আমাদের জন্য ঈশ্বরের করুণা প্রার্থনা করবে আর এজেন্টের আবেদন শুনে ঈশ্বর আমাদের ওপর তাঁর করুণা বর্ষণ করবেন। এর চেয়ে বড় মূর্খতা আর কি আছে, এই কারণেই ধর্মনামক বিশ্বাসকে বিজিনেস উইথাউট ইনভেস্টমেন্ট করার সুযোগ পেয়েছে এক শ্রেণীর প্রতারক। আমরাও এটা মেনে নিয়েছি। ভয়ে নয়, ভক্তিতে নয়, বাহুল্য ও জাঁকজমক দিয়ে নিজেদের প্রচার করতে আর স্বার্থসিদ্ধি ঘটাতে।

তিরুপতির মন্দির প্রাঙ্গণে বসে নতুনদির সঙ্গে যে সব আলোচনা করেছি তাতে নতুনদি খুব খুশি হননি। আরও কিছু উনি আশা করছিলেন। ধর্মের নামে অধর্মাচারণ সম্বন্ধে একমত হলেও এই অনাচারগুলো পারিবারিক জীবনে কতটা ক্ষতিকর তা কখনও বলা হয়নি।

কেন?

নতুনদি মনে করেন এই অনাচার যে স্থানে স্থানে গভীর শেকড় বসিয়েছে তার কারণ অজ্ঞতা ও অশিক্ষা।

আমি মনে করি শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত অনেকেই এই অনাচারকে মেনে নেন কিছুটা অভ্যাসের বশে আর কিছুটা লালসায়। পাওয়ার আদিম লালসা সামান্য কারণেই তঞ্চকের পাল্লায় পড়ে। তঞ্চকতার কতকগুলো আইনসম্মত পদ্ধতি আছে। এত সুষ্ঠু তার ব্যবস্থা এবং মসৃণ তার গতি যা থেকে প্রতারিত ব্যক্তি বুঝতেও পারে না কিভাবে সে প্রতারিত হল। এ যেন স্বেচ্ছায় হাড়িকাঠে মাথা গলিয়ে দেওয়া তারপর একটি কোপ, বাস্! ধড় আর মাথা আলাদা, মাথা টের পায় না তার প্রাণপাখী উড়ে গেছে, ধড় হাত-পা ছুড়ে এমনিই নিস্তেজ হয়ে যায়। অনেকটা দাড়ি কামাতে গিয়ে রেজে গাল কাটলে সঙ্গে সঙ্গে তা যেমন জানা যায় না, রক্তপাত আর যন্ত্রণা বোঝা যায় অনেক পরে। এই সব আইনসম্মত প্রতারণার অন্যতম হল লটারি। স্বেচ্ছায় লটারির টিকিট যারা কেনে তারা বিনা মেহনতে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে প্রভূত লাভের আশা করে। ক্রেতারা মনেও করে না দশবিশ লক্ষ লোকের পকেট থেকে যে টাকা আইন সম্মতভাবে সংগ্রহ করা হয় তার পঞ্চাশ ভাগও লটারি প্রাপককে দেওয়া হয় না। এর মূলে আছে মানুষের আদিম লিপ্সা, কর্মের প্রতি অনীহা আর অলৌকিকতায় বিশ্বাস।

নতুনদি বলল, শোনা যায় জাপানের কারখানায় উৎপাদিত মাল লটারি করে বিক্রি করা হত। দশ বিশ ইয়েনের বিনিময়ে লক্ষ টাকার মাল একজনের হস্তগত হত, আর সেই মাল বিদেশের বাজারে কম মূল্যে বিক্রি করে বিদেশের বাজার দখল করত জাপানী পুঁজিপতিরা। এটা যে জাতীয় অর্থনীতির পক্ষে সর্বনাশা তা বুঝতে পেরে জাপান সরকার এই প্রথা বন্ধ করে দিয়েছে।

নির্মলবাবু টিফিন ক্যারিয়ার ভর্তি খাবার নিয়ে এলেন একটা ইটিং হাউস থেকে, আমরা বসে পড়লাম খাদ্যের সদ্ব্যবহার করতে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরতি পথের যাত্রী হলাম।

নতুনদি হেসে বললেন, আমার এই ভাই পাদুকার প্রহরী ছিল, তুমি পাদুকার পাঁচালি শুনতে পাবে, তার বেশি নয়।

হেসে বললাম, এও একটা মহৎ কাজ। তিরুপতির সম্পদ পাহারা দিতে সরকারী ব্যবস্থা আছে কিন্তু আমাদের মত দর্শকদের পাদুকা পাহারা দেবার কোন নিরাপদ ব্যবস্থা নেই, সেজন্য আমি যা করেছি তা মহৎ কাজ ও ধন্যবাদের যোগ্য। নইলে পাদুকা বাঁচাতে ট্যাক্স দিতে হত।

হাসতে হাসতে সবাই গিয়ে উঠলাম বাসে।

সূর্যাস্ত হল পাহাড় থেকে সমতলে পৌঁছবার আগেই।

আমাদের উল্টোদিকের জানালা দিয়ে দিগন্তের শেষ সূর্যের আলো আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাতে ভুল যেমন করল না তেমনি আমরাও শেষবেলার দিবাকরকে নিবেদন জানালাম আগামী দিনের উষায় সাক্ষাৎকার দিতে।

রাত কাটল নিরুপদ্রবে।

সকালবেলায় একাই বের হলাম শহর পরিভ্রমণে।

রেল লাইনের পাশ দিয়ে চলতে চলতে দেখতে পেলাম খোলা মাঠের বুকে কয়েক শত ছোট ছোট পাথর পোঁতা আছে। এই পাথরের সূক্ষ্মভাগ আকাশ-মুখী। একদৃষ্টে মনে হয়েছিল, এটা সমাধিস্থান। আমরা সাধারণত কবর-খানা যাকে বলি, এটা তাই।

কবরখানায় দাঁড়িয়ে গ্রে সাহেবের এলিজি রিটন্ ইন্ এ চার্জ ইয়ার্ড কবিতাটা মনে পড়ল। কবি গোধূলিবেলায় গির্জার আঙ্গিনায় সারি সারি কবর দেখে তাঁর অমর কবিতা লিখেছিলেন। আমার কবিতা লেখার সামর্থ্য নেই, অমরত্বলাভ তো সুদূরপরাহত তবে জানার একটা ইচ্ছা আমার মনে জেগেছিল, কারা এরা! কারা এখানে শেষ শয্যা নিয়ে মুক্তি পেয়েছে পার্থিব দুঃখ দুর্দশা থেকে।

পথ চলতে চলতে যাদের সঙ্গে দেখা হল তাদের সঙ্গে বাক্যালাপ করার সাহস আমার ছিল না। আমার ভাষা ওরা বুঝবে না, ওদের ভাষাও আমি বুঝতাম না এমন অবস্থায় হাত পা নেড়ে কবরখানার রহস্য জানার মত সাহস আমার ছিল না।

কিন্তু জানতেই হবে।

একমাত্র ভরসা হোটেলের ম্যানেজার।

হোটেলে ফিরে এসে নির্মলবাবুকে কয়েকশত কবরের কথা বলতেই উনি বললেন, ওটা নিশ্চয়ই মুসলমানদের কবরখানা।

বললাম, মুসলমানদের কবরখানা হলে কোন না কোন মুসলমানী চিহ্ন থাকত, তাতো দেখলাম না।

তা হলে কৃশ্চানদের।

একটা ক্রুস কিন্তু দেখিনি।

তা হলে চল ম্যানেজারের কাছে এর রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

রহস্য আরও ঘনীভূত হল যখন ম্যানেজার বললেন, ওটা হিন্দুদের কবরখানা।

বললাম, কবর দেবার কিছু রেওয়াজ আছে হিন্দু সমাজে কিন্তু এতগুলো কবর!

আপনারা সঠিক ঘটনা জানলে বিস্মিত হবেন না নিশ্চয়ই। আমাদের এই দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ বিনা অন্য কোন জাতির মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ বাদে অন্য সব জাতির মৃতদেহ কবর দেওয়া ন্যায় ও ধর্মসম্মত।

নির্মলবাবু গালে হাত দিয়ে বললেন, অবাক কাণ্ড। বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা-এসব জায়গাতে হিন্দু মাত্রেই মৃতদেহ দাহ করে। আপনাদের দেশে অদ্ভুত নিয়ম। হিন্দুর মৃতদেহ সৎকার করার লোকের ও অর্থের অভাব ঘটলে, কিম্বা স্থানীয় সাহায্য না পেলে কবর দেওয়া হয়ে থাকে। অতি সামান্য ক্ষেত্রেই এই ঘটনা ঘটে। দাবীহীন মৃতদেহ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কোন কোন মৃতদেহ কবর দেওয়া অথবা সমাধিস্থ করা হয়।

আমাদের এই দক্ষিণদেশে অব্রাহ্মণ যদি মৃতদেহ দাহ করে তার পরিবারকে সামাজিক বয়কট ও অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়।

কোন এক ইংরেজ লেখকের রচনা পড়েছিলাম, man wars not with the dead. কিন্তু আমাদের প্রাচীন আর্যসভ্যতার ধ্বজাধারী হিন্দুসমাজ যে মৃত্যুর পরও জাতপাতের লড়াই করে এটা হল তার কুৎসিৎ ও নিকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। নিজের কাজেই নিজেকে ছোট মনে হতে লাগল।

ভদ্রলোক বললেন, আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? চন্দন দিয়ে তিনটি সরলরেখা অঙ্কিত কপাল, মস্তকের শেষ ভাগে ঘোটকের মত পুচ্ছ, গলায় কোন দেবদেবীর নামের মালাধারী যে সব ব্যক্তিকে পথে ঘাটে দেখবেন তাদের কাছে যাচাই করে নিতে পারেন।

এরপর কোন প্রশ্ন থাকতে পারে না। যাচাই করার সুযোগও পেয়েছিলাম ত্রিচুর থেকে কিছুটা দূরে একটা সম্পন্ন গ্রামের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পানীয় জলের খোঁজ করতে গিয়ে একজন অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছিল। সামনে একটা খামার বাড়ি। একটি ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, তান্নি ইল্লে?—ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, ইরকে। বলেই তার খামারে কর্মরত একজনকে এক কলসী জল এনে দিতে বললেন। খামারের উল্টোদিকে একটি আটচালার বারান্দায় একজন উপবীতধারী কৃষ্ণকায় ব্যক্তি কয়েকটি ছাত্রীকে কি যেন পড়াচ্ছিলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, ভদ্রলোক তাঁর ছাত্রীদের হিন্দী পড়াচ্ছেন।

বললাম, তামিল এলাকায় দূরদর্শনে রাত নটা অবধি কোন হিন্দী প্রোগ্রাম হয় না, আর এরা হিন্দী শিখতে আগ্রহী।

হাঁ, যারা হিন্দী শিখতে চায় না, হিন্দীকে ভালবাসে না তারা ঠিক কাজ করে না মিস্টার। আমি অমুক কলেজের অধ্যাপক, ছুটির মাসে এখানে এসে হিন্দী শেখাই। আমার ছাত্রীরা হিন্দী শিখে ভাল ভাল চাকরিও পেয়েছে।

বুঝলাম।

প্রসঙ্গক্রমে কবর দেবার কথা বলতেই বললেন, এটা ঠিক। আন্না দুরাই মহান নেতা। দ্রাবিড় সমাজের যা উপকার করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না কিন্তু আন্না দুরাই ছোট জাত। তবুও তাঁর কাজের জন্য সবাই সম্মান দেখিয়ে মাদ্রাজ শহরে সমুদ্রের কাছাকাছি একটি মনোরম উদ্যানে তাকে সমাহিত করা হয়েছে। অসম্মান করা হয়নি।

অবাক কাণ্ড!

ফিরে এসে নতুনদি ও অন্যান্যদেরও এই অভিজ্ঞতা বলতেই তাঁরা গালে হাত দিয়ে ভাবতে বসলেন।

উত্তর ভারতে এসব কিন্তু কল্পনার বাইরে। এমন কি কোঙ্কনি ও মারাঠি এলাকায় এগুলো লোকে স্বচক্ষে দেখে না।

নতুনদিকে পথ চলতে চলতে বলেছিলাম, বিচিত্র এই দেশ।

সত্যই বিচিত্র। নইলে কেমন করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয় তা ভাবা যায় না।

এই বিষ কিভাবে ছড়িয়ে ছিল তার বাস্তব চেহারা দেখেছিলাম মওলনা ভাসানীর দেশে।

ভাসানীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের দিন দেখেছিলাম উনি হুমায়ুন কবীরের লেখা মার্কসবাদ সম্বন্ধে একখানা বই পড়ছেন। আমাকে দেখেই বইখানা বুঁজিয়ে পাশে রেখে দিলেন।

ভাসানীর সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে এসেছিলাম। তাঁর হাতে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কেতাব দেখে কেমন ঘোলাটে মনে হল পরিবেশকে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মার্কসবাদ পড়ছেন বুঝি।

মার্কসবাদ পড়ার জন্য পড়ছি না, পড়ছি একটা মুসলমানের সন্তান হয়ে হুমায়ুন কবীরের মত পন্ডিত লোক কি করে মার্কসবাদকে এত বড় করে দেখেছেন। মুসলীম জাহানে এ রকম পাপিষ্ঠ আরও কিছু জন্মালে আল্লার বদদোয়া জারি হবে আমাদের মাথায়। যাক্, আপনার আসার কথা কয়েক সপ্তাহ আগেই জেনেছি কিন্তু কেন আসবেন তা জানি না। আপনি জানাননি।

মৃদু হেসে বললাম, লাইন প্রথা। এ সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে এসেছি।

মওলানা গদগদ হয়ে বললেন, আসামে বাঙ্গালীদের বড় সমস্যা লাইন প্রথা। এটা নিয়েই ভাবনা চিন্তা করছি। খাস জমিতে বাঙ্গালীদের বসবাস করতে তো দিচ্ছেই না। উপরন্তু সীমানা নির্দেশ করে দিয়েছে যা পেরিয়ে কোন বাঙ্গালী কোন স্থায়ী বাসস্থান গড়তে পারে না।

এতে লাভ কার?

জানি না।

আমি শুনেছি ময়মনসিংহ আর রংপুর জেলার landless মুসলমানরা ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে গারো পাহাড়ের তলা থেকে গোটা গোয়ালপাড়া জেলা ছাপিয়ে তারা উত্তর দিকে ধাওয়া করছে, তাদের আটক করতে আইন করেছে অসম সরকার।

তাই অসমীয়দের আশঙ্কা এইভাবে বাঙ্গালীরা স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলে অসমে স্থানীয় অধিবাসী অসমীয়ারা সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে।

বললাম, আরও একটা ভয় আছে মওলানা সাহেব। মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলে আপনারা অসমকেও পাকিস্তানের অংশ বলে দাবী করবেন। ইতিমধ্যে আপনারা তা আরম্ভ করেছেন অতি মৃদু গতিতে।

এটা ঠিক কথা নয়। আমরা সবাই ভারতবাসী। ভারতের সর্বত্র আমাদের নিশ্চয়ই বসবাস করার অধিকার আছে। এরা তা স্বীকার করে না।

বললাম, আন্দোলন করুন। অবশ্য সমবেতভাবে তা করতে হবে।

আন্দোলন করব স্থির করে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলাম।

সব কাগজপত্র ফাইল বের করে আমার সামনে রাখলেন। ফাইল ঘেঁটে একটা ফাইলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, এটা পড়ুন।

বিরাট আবেদন।

সব ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বিশেষ করে পুলিশ কিভাবে জোর করে দখলকারীদের বিতাড়ণ করেছে তার ধারাবাহিক বিবরণ, সাল তারিখসহ, উদ্বাস্তুদের নাম ঠিকানা সবকিছু রয়েছে তাতে।

পড়লেন তো। এই সব কাগজ পত্র কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে পাঠান হয়েছিল। এই দেখুন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র।

আমার সামনে জওহরলালের লেখা একটি চিঠি। তাতে আবেদনের বিষয়গুলো বিবেচনা করার কথা আছে। এর গুরুত্ব স্বীকার করেছেন স্বয়ং জওহরলাল নেহেরু। জওহরলালের হস্তলিপির সঙ্গে ওই দিন আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল।

বললাম, এই তো পণ্ডিত নেহেরু নিজের হাতে সহি করে আপনাকে জানিয়েছেন আপনার আবেদনটি বিবেচনা করার জন্য কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে হাজির করবেন।

জওহরলাল প্রেসিডেণ্ট থাকলে হয়ত কিছু করতে কংগ্রেস এগিয়ে আসত কিন্তু ভণ্ডুল করে দিয়েছে মওলানা আজাদ। প্রেসিডেণ্টের গদীতে বসেই আসামের লাইন প্রথার সমস্যা ধামা চাপা দিয়ে দিয়েছে। আবার আবেদন করলাম। এই দেখুন আবেদনের নকল।

আবেদনটি মনোযোগ সহকারে পড়লাম।

মওলানা উত্তেজিত ভাবে বললেন, আজাদ আবেদনের প্রাপ্তি স্বীকার পর্যন্ত করেনি। হিন্দু জওহরলালের যেটুকু ভব্যতা জ্ঞান আছে তা নেই মুসলমান আজাদের।

বললাম, স্বাভাবিক।

কেন স্বাভাবিক ?

আপনার আবেদনে মুসলীম সেণ্টিমেণ্টে সুরসুরি দিয়ে কাজ আদায় করতে চেয়েছেন কারণ আজাদ মুসলমান। আপনি ভুলে গেছেন, কংগ্রেস হিন্দু অথবা মুসলমানের প্রতিষ্ঠান নয়। আপনি মুসলমান আজাদকে মুসলীম রক্ষার আবেদন জানিয়েছেন। এটা কংগ্রেসের নীতি বিরোধী। আজাদ ধর্মে মুসলমান হলেও কর্মে ভারতীয় এবং হিন্দু মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টার ফসল। কংগ্রেস কারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, একটা প্রতিষ্ঠান যা লড়াই করছে ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য। সাম্প্রদায়িক আবেদন করে কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থন চেয়েছেন। তাই আজাদ আপনার আবেদন উপেক্ষা করেছেন। অসমের মন্ত্রী হলেন ফকরুদ্দিন আলি আহম্মদ, তিনি মুসলমান হলেও ভারতীয়

এবং কংগ্রেসি, তাই কংগ্রেস তাঁকে অর্থমন্ত্রী করেছে অসমের। ফকরুদ্দিন যদি নিজেকে সাম্প্রদায়িক ভাবতেন তা হলে কংগ্রেসে তাঁর স্থান হত না।

মওলানা আমার বক্তব্যের ওপর আস্থা রাখতে পারেনি কিন্তু প্রতিবাদ করার মত যুক্তিও তার ছিল না। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর কথা নয়, আছরের নমাজের সময় হয়েছে আপনি বসুন। আমি নমাজ পড়ে এসে কথা বলব।

যে মওলানা ছিল কৃষকবন্ধু হঠাৎ সে সাদুল্লার মুসলীম লীগে যোগ দিয়ে হিন্দুবিদ্বেষ প্রচারে নেমে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অসম মুসলীম লীগের সভাপতিও হয়েছিল।

এসবই পুরানো কথা।

মওলানা এখন রোজ কিয়ামতের দিন গুনছে কবরে শুয়ে কিন্তু সোনার বাংলাকে অশান্তি আর দরিদ্রের মধ্যে ঠেলে দিতে তার ভূমিকা কম ছিল না।

নতুনদি চুপ করে শুনছিলেন।

আমি বললাম, দিদি উনিশশ' তেইশ সালে সর্বপ্রথম রেলগাড়ির চলন্ত কামরায় বসে রেলব্রিজের হিসাব লিখতে লিখতে গন্তব্যস্থানে পেঁছেছিলাম। আজও হিসাবই লিখছি, গন্তব্যস্থান পেঁছতে পারিনি। পথ যেন শেষ হতে চায় না, চলাও থামতে চায় না। চলার পথে স্মৃতির ডালি উজাড় করার সময় এখনও আসেনি দিদি।

চার

কোভালামের সমুদ্র কিনারায় বসে বসে অনেক ভাবনা ভেবেছি। তার শেষ এখনও হয়নি। সারি সারি নারকোল গাছের মাঝ দিয়ে গাড়ি ছুটছিল।

আরবসাগরের ডাক শুনতে পাচ্ছিলাম।

গাড়ি দাঁড়াল একটা গ্রামে।

সবাই পিপাসার্ত।

অনেকেই আক্ষেপ করছিল রাস্তায় ডাব পেলে পিপাসা মেটাবে। এত নারকোল গাছ অথচ রাস্তাঘাটে একটা ডাবও পাওয়া গেল না। আশ্চর্য!

আমাদের সন্দেহ নিরসন ঘটল।

যে গ্রামে আমাদের গাড়ি দাঁড় করানো হল সেটা কৃশ্চানদের গ্রাম। প্রায় প্রতিটি দরজায় ক্রুশ চিহ্ন দেখে আর দ্বিতীয় ভাবনা করার অবসর ছিল না।

রাজ্যটা কেরল।

সাক্ষরতায় কেরল হল সর্বাগ্রে।

এখানকার বিশেষত্ব আতিথেয়তা। আমাদের গাড়ির মহিলারা যখন জলের জন্য একটি ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ল তখন গৃহকর্ত্রী দরজা খুলে কিছুক্ষণ বিশেষভাবে তাকিয়ে থেকে স্পষ্ট ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলেন,

তোমাদের কিছু দরকার আছে ?

আমরা বড়ই পিপাসার্ত।

আসুন। এরপর নিজেদের ভাষায় কাজ করার মেয়েকে ডেকে খাবার জল দেবার ব্যবস্থা করলেন।

নতুনদি বললেন, আপনাদের এখানে কত নারকেল গাছ অথচ রাস্তায় একটা ডাবও পেলাম না। তা হলে অবশ্যই আপনাকে বিব্রত করতাম না।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, এরকম বিরক্তি সহ্য করতে আমরা অভ্যস্ত। এখানে ডাব বিক্রি করা হয় না। ডাব বিক্রি করা নিষেধ।

কেন নিষেধ।

নারকোল আমাদের অর্থকরী ফসল। যাকে বলে money Crop. নারকোলের ছোবড়া থেকে দড়ি তৈরি হয়, আসন গালিচা তৈরি হয়, আর শুকনো নারকেল যাকে বলে কোপরা থেকে তেল। এটা আমাদের বড় সম্পদ। তেল নিষ্কাশনের পর পশুর খাদ্য, জমির সার তৈরি হয়। এর পর কেরলের আর্থিক অবস্থাও নির্ভর করে। ডাব কেটে বিক্রি করলে এটা আমাদের জাতীয় বিপর্যয়। তাই ডাব বিক্রি নিষেধ। অবশ্য কোন রোগীর জন্যে অথবা কোন জরুরী কারণে ডাবের দরকার হলে নিজেদের গাছ থেকে ডাব পেরে আমরা ব্যবহার করি। ডাব এখানে luxury drink.

আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ভদ্রমহিলার কথা শুনছিলাম। অর্থকরী ফসল রক্ষা করার জন্য যে রাজ্যে ডাব বিক্রি হয় না সে রাজ্যের সাধারণ মানুষের মানসিকতাকে প্রশংসা না করে উপায় নাই।

বাইরে এসে নতুনদি বললেন, শুনলে ভাই। অথচ আমাদের সবাইকে একটা করে ডাব কেটে উপহার দিলেন। অতিথিসেবায় এরা মোটেই পেছনে পরে নেই। যেমন অমায়িক ব্যবহার তেমনি সামাজিকতাবোধ। এটাই বোধ-হয় ভারতের চিরন্তন ধর্ম।

আমি শ্রোতা মাত্র।

ভদ্রমহিলা বললেন, নারকোলের এই ব্যবসায় কয়েক লক্ষ লোক জীবিকা অর্জন করে। হাজার হাজার লোকের জীবিকা নির্ভর করে সমুদ্রে মৎস্য শিকার করে। স্বনির্ভরতা এখানকার মানুষের হাড়ে মাংসে জড়িয়ে আছে। উপরন্তু ধর্ম সম্বন্ধে গোঁড়ামি বিশেষ নেই। যীশুর দাবি সর্বত্র।

ধূপকাঠি যে জ্বালান হয় তার চিহ্ন স্পষ্ট। তবে ভদ্রমহিলার কথায় মনে হল, কেরলের কৃশ্চান হিন্দুদের যতটা নিকটজন মনে করে, মুসলমানদের অতটা মনে করে না। এর পেছনে রয়েছে মোপলা যারা মালবারের মুসলমান তাদের অতীত কার্যকলাপ। ত্রিবাঙ্কুর ছিল একটি দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্য। পাশের কোচিনও ছিল অপর দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্য। উভয় রাজ্যের রাজা ছিলেন হিন্দু। হিন্দুরাজাদের উদার আচরণে এবং পক্ষপাতহীনতায় এখানে সাম্প্রদায়িকতার বিষ বিশেষ ছড়াতে পারেনি, অবশ্য সাধারণ মানুষ

শোষণের হাত এড়াতে পারেনি কোন সময়ই। যা কিছু সাম্প্রদায়িক চিন্তা এখানে মুসলীম লীগ ছড়িয়েছিল তারই একটা কুৎসিৎ রূপ এখনও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখা যায়। তবে তার পেছনে থাকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।

সবই তো বুঝলাম নতুনদি কিন্তু কেরলের এই অর্থনৈতিক অবস্থার দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, আমরা বাঙ্গালীরা কত বেশি মূর্খ। বাংলায় যে পরিমাণ নারকেল জন্মায় তা luxury drink-এ ব্যবহার করে আমরা যেমন বহুলোকের রুটিরুজি নষ্ট করি তেমনি বেকার সমস্যা বৃদ্ধি করি। বাংলা সরকার যদি কোনক্রমে ডাব বিক্রি বন্ধ করে কোপরা আর ছোবড়ার শিল্পকে উৎসাহিত করে তা হলে বাংলার মানুষ যথেষ্ট উপকৃত হবে।

ভদ্রমহিলা বললেন, রাজনীতি, সত্যিই রাজনীতির আবর্তে অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে, এটা আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতি পদক্ষেপে। আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় কেরলের অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কেরোলিয়ানদের প্রাধান্য। এই রাজ্যের বাহিরের লোকের প্রভাব অতি নগণ্য। অপর লক্ষণীয় বিষয় হল উত্তর ভারতের প্রভাব ধর্মের ক্ষেত্রে থাকলেও অন্যান্য ক্ষেত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায় অতি সামান্য। এই একটি রাজ্য যেখানে হিন্দু-কৃশ্চান-মুসলমানদের সহাবস্থানে একটি Common Culture develop করেছে যা সম্পূর্ণ ভারতীয়।

কেরলের সীমানা পেরিয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল কর্ণাটকের অভয়ারণ্যের মাঝখানে। সরকারী Tiger project—সামনেই Range office. চারিদিকে গভীর বন হলেও Range office-এর সামনে উন্মুক্ত ময়দান, বন্য কোন জন্তুর সাক্ষাৎ পাওয়া না গেলেও মাঝে মাঝে বনমোরগের চিৎকার জানিয়ে দিচ্ছিল পাশেই গভীর বন, আর বনের অধিবাসীরা আশে পাশেই বিরাজ করছে।

Range অফিসের মাঠে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে গাড়ি ছুটল উত্তরে।

আমাদের বিশ্রাম নেবার অবসর একমাত্র কোন লজে রাতের বেলায়। প্রায়শই মাঝরাতে পেঁছে নানা হাঙ্গামায় পড়তে হয়েছে। এইসব অসুবিধা আমরা মোটেই গ্রাহ্য করিনি। ভ্রমণের আনন্দ, দেখার আনন্দ সব আনন্দ মিলিয়ে আমাদের কষ্ট ও কৃচ্ছ্রতা ভুলিয়ে দিয়েছে।

ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, নানাভাষা, নানা বেশভুষা দেখবার যে সুযোগ এতদিন ভাগ্যে জোটেনি তাতে সত্যিই আমি দুঃখিত। আমরা ভারতের বাইরে ছুটে যাই ভ্রমণের নেশায় অথচ ভারতে জানার ও দেখবার মত বস্তুর মোটেই অভাব নেই। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক ভ্রমণবিলাসী বাঙ্গালীরা। কাশ্মীরের শ্রীনগরে বস্ত্র বিপনন কেন্দ্রে গিয়ে তাদের ক্রেতা রেজিস্টারে যাদের নাম দেখেছি তাদের শতকরা সত্তর ভাগই বাঙ্গালী। ছোট ছোট পরিবার, স্বল্প উপার্জন থেকে অতি কষ্টে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে বাংলার মানুষ জানার ও দেখার নেশায় ও আনন্দে ঘুরে বেড়ায়। অবশ্য অন্য রাজ্যের

মানুষ বাংলায় ভিড় করে উদরের তাড়নায়, অথবা শোষণের পথ খুঁজতে যেটা বাংলার মানসিকতার সঙ্গে খাপ খায় না।

আমার কোন বন্ধু নেই।

বহু পরিচিতজন আছে। পরিচিতজনের নাম-ধাম ভুলেই গেছি। ট্রেনের কামরায় লোকের সঙ্গে সাময়িক আত্মীয়তা জন্মেছে। তাদের ভুলে গেছি ট্রেন থেকে প্ল্যাটফরমে পা দিয়েই! বিমানে উঠলে আত্মম্ভরিতার ডগমগ মানুষরা কোনক্রমেই অপরের সঙ্গে সামান্য কথোপকথন করে না। জাহাজের যাত্রীরা যখন ঘর সংসার সাজায় জাহাজের খোলে তখন তারা নিজেদের রাজ্যের মানুষকে খুঁজে নেয়। জাহাজের খোলের যাত্রী সাধারণত নিম্নবিত্তের তাই সেখানে সামাজিকতা ও হৃদ্যতার কোন ছাপই থাকে না। বন্ধুত্ব স্থাপন করার উপযুক্ত স্থান নয় চলতি পথে তবুও পথের যাত্রীদের সঙ্গে যাত্রীদের সহানুভূতি, পরস্পরকে সাহায্য করতে সদিচ্ছা কোন সময়ই কমতি হয় না। তখন মনে হয় সবাই কেমন যেন আপনজন।

নতুনদিদি আমার প্রাপ্তি। পথে ঘাটে এরকম অনেক দাদা, দিদি ইত্যাদি পেয়েছি কিন্তু সেই সম্পর্ক কোন সময়ই স্থায়ী হয়নি। এই প্রথম মনে হল নতুনদিদিকে পাওয়ার সঙ্গে মাতৃস্নেহের কেমন একটা পরশ আছে। তাই নতুনদিকে কোন সময়ই ভুলতে পারি না।

নির্মলবাবুর আন্তরিকতার অভাব দেখিনি। ছেলেমেয়েরা নতুন মাতুল প্রাপ্তিতে উৎফুল্ল।

অভয়ারণ্য থেকে বের হবার আগে ঝণ্টু বলেছিল, মামা আমরা এই বনে বাঘ দেখতে পাব কি?

বললাম, না।

কেন?

বাঘতো সবসময় এ রকম উন্মুক্ত জায়গায় আসে না। যদি বনের বাঘ বা সিংহকে তার স্বাভাবিক বন্য জীবনে দেখতে চাও তা হলে যেতে হবে উড়িষ্যার নন্দন কাননে। ওই যে দেখছ ছোট পাহাড়ি নদীটা তরতর করে নিচের দিকে ছুটে চলেছে, এরই চারপাশে রাতের বেলায় জল খেতে বুনো জন্তুরা আসে, যদি তাই হয় তা হলে এখানে রাতের বেলায় ডেরা বাঁধলে হয়ত বাঘ দেখা যাবে। থাকবে রাতের বেলায়?

মামা, ওই দেখুন হাতি।

বললাম, ওগুলো বনবিভাগের পোষা হাতি। ওই সব হাতির পিঠে চড়ে বনবিভাগের কর্মচারীরা বনের ভিতর ঢোকে। তোমরা তো চন্দন কাঠ দেখেছ। চন্দনের টিপ অনেকেই কপালে দেয়? কর্ণাটকের বনে প্রচুর চন্দন গাছ আছে। আর আছে হাতি। চন্দনকাঠ চুরি করতে আসে পোচাররা, অর্থাৎ যারা পোচার তারা হাতি মেরে তার দাঁত চুরি করে বিক্রি করে। আবার গভীর বন থেকে চন্দন গাছ কেটে তা বিক্রি করে পৃথিবীর সব জায়গায়। এদের দলে

যারা থাকে তারা ভয়ঙ্কর হিংস্র আর নৃশংস। চোরাই কাজে বাধা দিলে খুন খারাবি করতেও ভয় পায় না।

কর্ণাটক সরকার কিছু করে না।

করে, করার চেষ্টা করে। পৃথিবীতে চোররা হল সবচেয়ে বুদ্ধিসম্পন্ন শ্রেণী। পুলিশকে বোকা করে নতুন নতুন পথ খোঁজে তাদের চোরাই কাজ চালাতে। পুলিশের বন্দুকের চেয়েও ভয়ঙ্কর অস্ত্র এদের হাতে থাকে। মাঝে মাঝেই লড়াই হয় পুলিশে আর চোরে। কখনও চোর মরে, ধরা পড়ে আবার পুলিশও ঘায়েল হয়। কেরলে যেমন নারকোল হল বহুলোকের জীবিকার পথ তেমনি চন্দন কাঠ হল কর্ণাটকের বহুলোকের জীবিকার পথ। কর্ণাটকের মানুষ চন্দন কাঠ দিয়ে নানা সৌখিন জিনিস তৈরি করে। সাবান তৈরি করে। চন্দনের তেল আর চন্দন সাবান হল কর্ণাটক সরকারের বিরাট আয়ের উৎস। মহীশূরে তো দেখেছ। এখানকার সিল্কের তৈরি কাপড় জামার বিরাট চাহিদা রয়েছে বিশ্বের বাজারে।

গাড়ি বন পেরিয়ে এগিয়ে চলছে বাঙ্গালোরের দিকে। কিশোর ঝণ্টুর নানা প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

নতুনদি ধমকে থামিয়ে দিলেন ঝণ্টুকে। আমার ক্লান্তি ততটা নয় তার প্রশ্নের উত্তর দিতে, বেশি ক্লান্ত হয়েছিলাম একটানা বাসের শব্দে আর ঝাঁকুনিতে।

বাঙ্গালোর পেরিয়ে আমাদের গাড়ি চলেছিল তিরুপতির পথে।

তিরুপতিতে চালুক্য হোটেলের তিনদিন অবস্থান আমাদের সবাইয়ের পক্ষেই বেশ আরামপ্রদ মনে হয়েছিল।

তিরুপতি দর্শনের পর আটচল্লিশ ঘণ্টার বিশ্রাম।

এই আটচল্লিশ ঘণ্টায় আমরা ক'জন আটচল্লিশ বছর পেছনে চলে গিয়েছিলাম।

কোথায়?

নতুনদিদি বললেন, বোম্বে থেকে রওনা হয়ে নামলাম মনমদে। মনমদ থেকে যে ছোট লাইনের রেলের রাস্তা ছিল সেকেন্দ্রাবাদ অবধি সেই রেলের যাত্রী আমরা। আগে এটা ছিল নিজামের নিজস্ব রেলপথ।

নির্মলবাবু বললেন, সেবার আমাদের গন্তব্যস্থল ছিল ইলোরা আর অজন্তা। জানেন দাদা, এই দুটি স্থান না দেখলে ভারতদর্শন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। আমাদের বাইরে বের হওয়া কত কঠিন তাতো জানেন। নেহাত সেবার আমার এক শ্যালকের বাড়িতে গিয়েছিলাম। সে-ও প্রায় দশ-বার বছর আগের কথা।

বাধা দিয়ে বললাম, ভারতদর্শন সম্পূর্ণ করতে আমার যাবার ইচ্ছা ছিল ওই দুটি স্থানে। এবার সেটা পূর্ণ হল।

দাদার স্টেশনে রাতের এক্সপ্রেস গাড়িতে উঠতে পারলাম না। রাত্রি বারটার আগে কেনা টিকিট, পরবর্তী ট্রেন সকালবেলার অর্থাৎ তারিখ বদলে যাবে

নতুন ভাবে টিকিট কাটতে হবে। গেলাম স্টেশন মাস্টারের কাছে। ভদ্রলোক বুঝলেন, বললেন, পরের ট্রেনেই যাবেন। কোন অসুবিধা হবে না।

মারাঠা দেশের ওপর আমার একটা আকর্ষণ ছিল বহুকাল থেকে। প্রথম যেবার মহারাষ্ট্রের তথা বোম্বে প্রদেশে গিয়েছিলাম, সেবারেই ছোট ছোট পাহাড়ের ওপর যেসব দুর্গ শিবাজী এবং তার পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছিল তারই কয়েকটি ঘুরে দেখে এসেছি, এবার খাস মারাঠা অঞ্চলে প্রবেশ করার প্রবল কামনা নিয়ে দাদার থেকে পুণের পথে রওনা হয়েছিলাম।

বাংলার প্রাণকেন্দ্র যেমন কলকাতা তেমনি মারাঠা দেশের প্রাণকেন্দ্র পুণে।

কলকাতার গৌরব হল বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির মূলকেন্দ্র তেমনি পুণে হল মারাঠা সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। যদিও বোম্বাই ছিল প্রদেশের রাজধানী এবং এখনও বোম্বে হল মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। কিন্তু বোম্বেতে মারাঠার কৃষ্টি সংস্কৃতি কোন সময়ই বিকাশ লাভ করেনি। বোম্বে শহর হল মিশ্রিত শহর, মারাঠিদের সংখ্যা কত বলা কঠিন, গুজরাটি বিশেষ করে গুজরাটি ভাষাভাষী পার্সিদের প্রাধান্য ছিল সর্বত্র এর সঙ্গে সিন্ধি, পানজাবী এমন কি পাঠান হিন্দু ও পাঠান মুসলমানদের আশ্রয়স্থল এই শহর।

কিন্তু পুণে হল মারাঠিদের শহর।

আপনি কি পুণেতে গিয়েছেন? যাননি, সময় পেলে যাবেন। আপনারা মনমদ হয়ে ট্রেনে চেপে অওরঙ্গাবাদ গেছেন কিন্তু তার চেয়ে আনন্দদায়ক পথ পরিক্রমা উপভোগ করতে হলে পুণে থেকে বাসে করে অওরঙ্গাবাদ যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।

পুণে শহরে ছিল পরবর্তী মারাঠা শাসক পেশওয়াদের রাজধানী। শহর সুরক্ষিত। এই শহরের মধ্যস্থানে রয়েছে পেশওয়াদের বাসস্থান। একসময় অওরঙ্গজেবের নিকট আত্মীয় এবং মোঘল সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ পুণে দখল করে শিবাজীর পুণের বাসস্থান ডেরা বেঁধে নিরাপদে নির্বিবাদে শাসন পরিচালনা করার মতলব করেছিলেন কিন্তু বিধি বাম। কোন এক অন্ধকার রাতে শিবাজী ছদ্মবেশে শায়েস্তা খাঁর এই নতুন আবাস আক্রমণ করে মোঘল সেনাদের কচুকাটা করে আবার দখল করে নেন এই শহর। শায়েস্তা খাঁ কোনক্রমে পালিয়ে প্রাণরক্ষা করলেও তার তরুণ পুত্রকে মারাঠাদের অস্ত্রে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

কয়েকদিন ঘুরে ঘুরে দেখেছি পেশওয়াদের বাসস্থান। অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ধ্বংস স্তূপে পরিণত এই দুর্গরূপী প্রাসাদে এখনও শোনা যায় মারাঠিদের বীরত্ব কাহিনী।

ভামবুরদা নদীর ওপারে কিরকির রণক্ষেত্র। এখানেই শেষ ইঙ্গ-মারাঠা-যুদ্ধ হয়েছিল আঠারশত আঠার সালে। মারাঠাদের পতনের ইতিহাস কলঙ্কিত করে রেখেছে। মারাঠাদের গৃহ বিবাদ আর বিদেশী ফিরিঙ্গিদের উপর যুক্তিহীন বিশ্বাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি ইংরেজের অগ্রগতির ইতিহাস

জানা থাকলে এঘটনা ঘটত না।

নতুনদি বললেন, তুমি যেন মারাঠাদের সম্বন্ধে দুর্বলতা পোষণ কর।

হেসে বললাম, কোন রাজারাজরা সম্বন্ধে আমার কোন দুর্বলতা নেই নতুনদি কিন্তু মারাঠাদের শৌর্যবীর্য সম্বন্ধে আমার খুবই দুর্বলতা আছে।

আপনি যদি দেখতেন এই পাহাড় পর্বতময় বনভূমি পরিবৃত দেশের মানুষ কত কষ্ট সহিষ্ণু তা হলে আপনিও এদের শ্রদ্ধা করতেন।

রায়গড় দুর্গ ছিল শিবাজীর রাজধানী।

এই দুর্গ যে পাহাড়ের মাথায় সে পাহাড়ে কাউকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দিলে গড়াতে গড়াতে যেখানে গিয়ে আশ্রয় নেবে সে স্থানটি হবে পরলোক অথচ অওরঙ্গজেবের সেনাপতি কি করে এই দুর্গ অবরোধ করে শিবাজীকে বশ মানিয়ে দিল্লি নিয়ে গিয়েছিল তা ভাবলেও গা-শিউরে ওঠে। অথচ আমি দেখেছি মারাঠা রমণী মাথার বোঝা নিয়ে অনায়াসে পাহাড়ের পথ ভেঙ্গে দুর্গের সানুদেশে নিজ গ্রামে যাচ্ছে। আমি দেখেছি শুকনো বাজরার একখানা মোটা-রুটি গামছায় বেঁধে মারাঠি কৃষকরা Stair farming করছে হাসিমুখে। এদের ঘরে ঝগড়া কাজিয়া আছে, আছে গ্রাম্য বিবাদ কিন্তু ওরা কেমন প্রশান্ত, কেমন একটা তৃপ্তি ওদের চোখে মুখে। অপুষ্টির শিকার এই সব মানুষ কর্মকে বেছে নিয়েছে, অসম্মান মেনে নিতে পারেনি।

এদের দেশে এই দুর্গ দখল আমার কাছে অকল্পনীয় মনে হয়েছিল।

সেবার আমার সঙ্গী ছিলেন তুলু ভাষাভাষী রামজি পাটকে। এবার সঙ্গী সপরিবারে নতুনদিদি।

পুণে শহরে রামজির ছিল সাইকেল মেরামতের দোকান। যে সময় পুণে পৌঁছেছিলাম সে সময় পুণেতে মোটরগাড়ির সংখ্যা বিরল, টাঙ্গা আর সাইকেল ছিল দ্রুত চলার যান। যে সময় দিল্লিতে ছিলাম তখনও দিল্লি শহরে কোন বাস ছিল না। ছিল টাঙ্গা আর সাইকেলের ছড়াছড়ি। সকাল নটা বাজতে না বাজতে পুরনো দিল্লি থেকে আজমিরি গেটের তলা দিয়ে সাইকেলের সারি ছুটত দপ্তরের দিকে। যাদের আর্থিক সামর্থ্য ছিল তাদের কেউ কেউ টাঙ্গায় যেত দপ্তরে। দিল্লি ছিল সাইকেলের শহর। পুরনো শহরও তাই। রামজি পাটকে সাইকেল ভাড়া দিত ঘণ্টায় চার পয়সা রেটে। আমার সঙ্গে তার ছিল হৃদ্যতা সেজন্য রেটটা কম। উপরন্তু সে আমার সঙ্গী হতেও রাজি হয়েছিল।

রামজি সারাদিন পর একটি টাকা আমার থেকে নিত সাইকেল ভাড়া হিসাবে কিন্তু পথ চলার সময় রামজি আলুর তরকারি আর বাজরার রুটি সঙ্গে নিত যার অর্ধাংশ আমার পেটে যেত যার জন্য কোন মূল্য দিতে হত না। পিপাসা পেলে কোন গ্রামের ধারে সাইকেল দাঁড় করিয়ে রামজি যেত দুধের খোঁজে। কাঁচা অথচ টাটকা দুধ গেলাস ভর্তি এনে খাওয়াতো। যে গাড়ি ভাড়াটা সে নিত তার অধিকাংশ ব্যয় হয়ে যেত তার আতিথেয়তায়।

রাস্তা চলতে চলতে রামজি মারাঠা দেশের গল্প বলত।

তুমি তো মারাঠি নও অথচ তুমি মারাঠাদের সম্বন্ধে এত গদ গদ কেন।

প্রায় দশ বছর বয়স থেকে পুণেতে আছি। ওদের ভাষা শিখেছি। ওদের সঙ্গে উঠাবসা করেছি। আমি ওদেরই একজন। তুমিও যদি কয়েক বছর এখানে থাক তুমিও ওদের একজন হয়ে যাবে।

মারাঠা মেয়েরা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বেশি স্বাধীনভাবে চলাচল করে, কাজকর্ম করে, ওরা পুরুষদের মত কাছা দিয়ে শাড়ি পড়ে অবশ্য শাড়িটা বার হাত নয়, ষোল হাত। সংসারের সব কাজ করে, মাঠে কাজ করে, স্বামীপুত্রের সেবা করে। ওদের মাথায় ঘোমটা দেখেছ কি? যারা ঘোমটা দেয় তারা বিধবা অথবা কুমারী। স্বামী ওদের শির। শির থাকতে শিরে কাপড় মারাঠা কৃষ্টি বিরোধী।

এই যে দেখছ বন, এই বনের মাথায় ওই যে একটা ঘরের মত দেখছ ওটা হল সিংহগড় দুর্গ। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভয়ঙ্কর অথচ করুণ কাহিনী।

মোগলরা সিংহগড় দখল করল।

মোগলদের কামান, অস্ত্রবল, অর্থবল, লোকবল ছিল অপরিমিত।

কিন্তু শিবাজী জননী তাঁর অনুগত জনকে ডেকে বলল এই দুর্গ আমার চাই।

জিজাবাঈয়ের এই প্রার্থনা পূর্ণ করতে তানাজি যা করেছিলেন তা যদি দেখতে চাও তা হলে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে উপরে উঠতে হবে। এই গ্রামে আমাদের সাইকেল দুটো রেখে চল, পা চালিয়ে উঠতে থাকি উপরে।

মারাঠা দেশ পাহাড় পর্বতের দেশ।

যে সব পাহাড়ের মাথায় জলের অভাব নেই সেখানেই মারাঠা বীররা নির্মান করেছে দুর্ভেদ্য দুর্গ। আমরাও পাহাড়ের গা কেটে আঁকা বাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চলেছি ধীরে অথচ সতর্ক পদক্ষেপে এমনি একটি দুর্গ দেখতে।

রামজি বলল, দেখছ তো কেমন দুর্গম এই পাহাড়ি পথ। দুর্গের রয়েছে দুটো প্রবেশ পথ। আমরা যে পথে চলেছি সেটা পৌঁছে দেবে মূল প্রবেশ-দ্বারে। আরেকটি পথ রয়েছে পেছনে, সেটা আরও দুর্গম। এই সুরক্ষিত দুর্গম দুর্গে প্রবেশ অসাধ্য বললে কম বলা হয়। অথচ এই দুর্গ জয় করেছিল তানাজি কয়েকজন সহচর নিয়ে। আজ আমরা এ সব কথা চিন্তাও করতে পারি না অথচ তাই ঘটেছিল এখানে।

নেউল দেখেছ? সাপ আর নেউলের লড়াই দেখেছ কি? তানাজির একটা পোষা নেউল ছিল।

আমি হেসে বললাম, তানাজি নেউলবাহিনী নিয়ে কি যুদ্ধ করেছিল?

রামজি হেসে বলল, অনেকটা তাই। তানাজি তার পোষা নেউলের পেটে সরু শক্ত দড়ি বেঁধে দুর্গের পেছনে খাড়াই পাহাড়ে ছেড়ে দিল। নেউল

পাহাড়ের গা বেয়ে দুর্গের প্রাচীরের ঠিক নিচে একটা গর্তে ঢুকে পড়ল। তুমি বোধহয় জান চার-পাঁচজন এই দড়ি ধরে টানলেও নেউলকে গর্তের বাইরে আনা সম্ভব নয়। তানাজি অস্ত্রশস্ত্র পিঠে বেঁধে ওই দড়ি ধরে উপরে উঠল। সারারাত পাহারা ছিল দুর্গের দুটো প্রবেশদ্বারে। মোগলরা জানত, দুর্গের পেছনটা সুরক্ষিত এবং কোনক্রমেই দুর্গের পেছন দিয়ে কোন শত্রু আক্রমণ করতে পারে না। অন্ধকারে অতি সন্তর্পণে তানাজি পেঁছে গেলেন দুর্গের পেছনের দেওয়ালে। সেই দেওয়ালের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন নিচে।

আমি অবাক হয়ে বললাম, এতো অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তানাজি।

ঠিক তাই। একে-একে তার সহচররা দুর্গে প্রবেশ করে হর-হর-মহাদেব ধ্বনি দিতে দিতে সবার আগে দুর্গের প্রহরীদের হত্যা করে ওপর থেকে নিচে আলোর সঙ্কেত দিতেই যেসব মারাঠা মাওয়ালি সেনা নিচে ছিল তারা টাট্টু ছুটিয়ে এসে গেল। দুর্গদ্বার খোলা পেয়ে তারা আক্রমণ করল মোগল শিবির। এক ঘণ্টার যুদ্ধে পুরো মোগল বাহিনী অতর্কিত আক্রমণে ধরাশায়ী হল। মারাঠারা দখল করল এই দুর্গ।

জিজাবাঈ নিশ্চয়ই আনন্দিত হয়েছিলেন।

অবশ্যই কিন্তু তানাজি মালেশ্বর আর জীবিত ছিলেন না। সিংহগড়ের এই দুর্গে তিনি প্রাণ হারিয়েছিলেন।

এই হল মূল দুর্গদ্বার।

দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখলাম এর গঠন।

দুর্ভেদ্য ছিল এই দুর্গ।

রামজি বলল, ঠিক বলেছ। নিজের বুকের রক্ত দিয়ে তানাজি মালেশ্বর এই দুর্গ দখল করেছিলেন। তাঁর স্মৃতিকে অমর করে রেখেছে মারাঠা দেশের মানুষ। এই দিকে তাকাও। এই যে বেদীর ওপর দেখছ একটা বীরের পাথর দিয়ে তৈরি মূর্তি। ইনিই হলেন তানাজি মালেশ্বর।

তানাজির মর্মর মূর্তির সামনে হাত জোড় করে রামজি দাঁড়াল, আমিও তার দেখাদেখি হাত জোড় করে দাঁড়ালাম। এই শ্রেণীর বীরকে সম্মান দেখাবার জন্য এর বেশি কিছু করার ছিল না। বারবার দেখছিলাম তানাজি মালেশ্বরের মূর্তিটি। বীরত্বের সঙ্গে মিশ্রিত সৌম্য যে মূর্তি তার ভাস্কর্য অনিন্দ্যনীয়। দক্ষিণের ভাস্কর্যের সঙ্গে ভাস্করের শিল্পকলার যে অভিব্যক্তি দেখেছি মারাঠা-দেশে সেই শিল্পকলায় বীরত্বের চেয়ে কিছু রুঠো চেহারা লক্ষ্য করেছি। পাহাড় ঘেরা দেশের মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই শ্রমশীল ও কষ্টসহিষ্ণু হয়ে থাকে। বাঁচতে ও আত্মরক্ষার তাগিদে তাদের হতে হয় কঠোর সেজন্য কোমল চারুকলার চিহ্ন খুব কমই এই সব পাহাড়ি দুর্গে লক্ষ্য করা যায়।

নতুনদি পুরানো দিনের পুরানো কথা শুনছিলেন। আমার কথা অর্ধপথে থেমে যেতেই বললেন, তারপর ?

তারপর আর বিশেষ কিছু নেই।

এমনি করে ঘুরতে ঘুরতে কিরকির মাঠে গিয়েছিলাম।

এখানেই সমাধি ঘটেছিল মারাঠা রাজ্যের। দ্বিতীয় বাজীরাও এই যুদ্ধকালে ছিলেন পার্বতী মন্দিরে। সেখানে বসেই মারাঠা সাম্রাজ্যের পতন দেখে অক্ষমতার জন্য আপশোষ করেননি। ইংরেজের হাতে পেশওয়া শাসিত রাজ্য ছেড়ে দিয়ে বিঠুরের জঙ্গলে ইংরেজের পেনশন ভোগ করে পরবর্তী জীবন কাটিয়েছিলেন।

মোগলদের হাত থেকে বহু রক্তপাত ঘটিয়ে ও কৃচ্ছতা ভোগ করে যে মারাঠা রাজ্যের পত্তন করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজী তার পতন ঘটল গৃহবিবাদে আর পরিচালকের অভাবে।

মহাপ্রাণ তানাজি মালেশ্বর স্থান পেলেন ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তবুও মারাঠারা তানাজির ত্যাগ ও দেশপ্রেমকে স্মরণ করতে এবং পরবর্তী বংশধরদের গর্বিত করতে এই বীরের মর্মরমূর্তি স্থাপন করেছে সিংহগড়ে।

স্বপ্নের মত মনে হয় মারাঠা দেশের সেইসব অভিজ্ঞতা সঞ্চিত স্মৃতি। পথ চলতে বহু মানুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটেছে। দেখেছি কতশত নর-নারী। তাদের কাছে কত কথা শুনেছি, তাদের জীবন যাত্রার নানাভঙ্গীও দেখেছি, তখন অবাক হয়ে ভেবেছি। এই মানুষের মিছিলে কেউ এগিয়েছে, কেউ পিছিয়েছে কিন্তু আজও মিছিলের সমারোহ শেষ হয়নি। মারাঠা দেশের কাহিনী বলতে বলতে থেমে যেতেই নতুনদি জিজ্ঞাসা করলেন, থামলে কেন ভাই!

বললাম, দেখেছি অনেক, সবার কথা মনেও নেই। রামজি পাটকে আর তানাজি মালেশ্বর কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। মনের গভীর থেকে তাদের খুঁজে বের করতে হচ্ছে। রামজি বলেছিল, ইংরেজ যেভাবে এদেশ দখল করেছিল তা নীতি সম্মত নয়, কিন্তু মারাঠা দেশের তারুণ্য কোন ক্রমেই তা সহ্য করেনি, তারাই অস্ত্র হাতে নিয়ে গর্জে উঠেছিল। তার পরিণাম হল চাপেকারদের দুই ভাইয়ের জীবন দান। এই জীবন দানের মাঝ দিয়ে গোটা ভারতের তরুণদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের দুর্দম আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল। তারাই আমাদের নমস্যজন।

নতুনদি আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি এই পন্থায় বিশ্বাস কর।

করতাম বলেই আজ আমরা পাশাপাশি নির্ভয়ে মনের কথা ব্যক্ত করে চলেছি নতুনদি। আমরা যখন স্বাধীনতার জন্য গর্ববোধ করি তখন মানবধর্মী কত শত ভারতের যুবক ছাত্রের অসীম ত্যাগের কথা ভুলে যাই। তাদের জন্য গর্ববোধও করি না।

নতুনদি বললেন, তাদের কথা মনে রাখবার মত বিশেষ কোন সুযোগ আমরা পাই না। অর্থাৎ বর্তমানে যারা স্বাধীনতার উপসত্ত্ব ভোগ করছে তারা চায় তাদের কাজ ও কথাই রচনা করবে ভারতের গৌরবের ইতিহাস, আর সবই ভুয়ো। ত্যাগের চেয়ে ভোগের দাপট বেশি।

তা বটে। বিস্মৃতির অতলে সবাই চাপা পড়ে যায়। প্রাক্ স্বাধীনতা-যুগের চামেলি, ইমান আলি, প্রভা এদের নিয়ে কোন সুখকর রচনা সম্ভব নয়। তাদের ভুলে যাওয়াই সঠিক পথ। লক্ষ লক্ষ চামেলি, ইমান আলি, প্রভা কোথায় যেন হারিয়ে যায় আমাদের অবহেলায়।

এসব বলে লাভ নেই নতুনদি। রামজির সঙ্গে ফিরতি পথে আমাদের আলোচ্য বিষয় ছিল তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। রামজি বলল, আহ্মদ শাহ্ আবদালির পরাজয় ছিল অনিবার্য, জ্যোতিষীরা দিনক্ষণ দেখে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হবার নির্দেশ দিয়েছিল। ঠিক সময়ে সৈন্যদের কুচের আদেশ দিয়েছিল সদাশিব রাও। ঊষাকালে সৈন্য শিবিরে ঘোড়ায় চেপে সদাশিব রওনা হল। প্রথম সাক্ষাৎ পেলে এক বিধবা মহিলার। আমাদের বিশ্বাস শুভকার্যে বিধবার মুখদর্শন নিষেধ। এই জন্যই মারাঠাদের পরাজয়।

বলেছিলাম, এটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। যে পদ্ধতিতে মারাঠারা চিরকাল শত্রুর মুখোমুখি হয়ে জয়লাভ করেছিল সে পদ্ধতি পরিত্যাগ করাটাই ভুল হয়েছিল। উত্তর ভারতের রাজপুত রাজারা মারাঠাদের আধিপত্য সহ্য করতে পারছিল না। তাই তারা মারাঠাদের সাহায্য করেনি। যদি শিবাজীর আদর্শ অনুযায়ী গেরিলা যুদ্ধ করত সদাশিব রাও তাহলে ভারতের ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হত।

রামজি পাটকে আমার যুক্তি মেনে নেয়নি নতুনদি।

কিরকির মাঠের পাশে কিছুটা দূরে সেই কুখ্যাত এরোরা (যারবেদা) জেল। এখানে বন্দী ছিলেন ভারতের বহু মহান নেতা।

আগা খাঁর প্রাসাদের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

রামজি জিজ্ঞাসা করেছিল, এটা বিখ্যাত প্রাসাদ।

তখন বিখ্যাত ছিল কিনা জানি না, পরবর্তীকালে এই প্রাসাদে বন্দীদশায় দেহত্যাগ করেছিলেন কস্তুরবা, গান্ধীজির সহধর্মিনী। পরবর্তীকালে এই প্রাসাদের চত্বরে দাঁড়িয়ে কল্পনায় দেখবার চেষ্টা করেছি একজন ভক্তিমতী পতি-প্রাণা মহিলাকে যিনি বেঁচে থাকলে ভারতীয়দের জননীত্ব লাভ করতেন।

তবে এবার পুণে শহরে এসে দর্শনীয় স্থানগুলো এড়িয়ে মধ্যভারতের দিকে আমার দৃষ্টি ছিল অবশ্য মধ্যভারত হলেও সেটা মহারাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করা হয় ন্যায়সঙ্গত ভাবে।

আমার সঙ্গী শঙ্করবাবু। দূর পথের যাত্রী। সেবার ছিল রামজি এবার স্বয়ং ভোলানাথ।

হোটেলে খেতে বসেছিলাম।

হোটেলের একজন বেয়ারা তদ্বির করছিল খদ্দেরদের খাবার পরিবেশনে। শঙ্করবাবু হঠাৎ আমাকে বললেন, ওই ছেলেটাকে বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে, ডেকে কথা বলে দেখুন তো।

বাইশ তেইশ বছরের ছেলেটিকে ডাকতেই এগিয়ে এল।

তোমার বাড়ি কোথায় ছিল ?

প্রথমেই কেমন থতমত খেয়ে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। পরমুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, বনগাঁয়।

এখানে কেন ?

পেটের ধান্দায় বেরিয়েছিলাম, ঘুরতে ঘুরতে এই শহরে এসেছি, তাও তিন চার বছর হয়ে গেল।

এর চেয়ে ভাল কাজ সংগ্রহ করতে পারনি বুঝি ?

লেখাপড়া ভাল করে শিখিনি, এর চেয়ে ভাল কাজ কি পাব বলুন।

শঙ্করবাবু আর প্রশ্ন করলেন না। কিছু জানতে চাইলেন না। আমি বললাম, পশ্চিম বাংলায় এরকম কাজ তো পেতে পারতে।

পারতাম কিন্তু ফেরার মুখ নেই। সবাই বলল, বোম্বে গেলে অনেক টাকা উপায় করা যায়। টাকার লোভে এসেছিলাম। সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। মায়ের দুটো বালা চুরি করে বিক্রি করে দিলাম, সেই টাকায় বোম্বে এসে চাকরির চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত কোন কাজ জোটাতে না পেরে এই বেয়ারার কাজ নিতে হয়েছে। বাড়িতে ফেরার তো মুখ নেই।

বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে টস্‌টস্‌ করে জল পড়তে থাকে।

কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলাম, ছেলেটার মন চলে গেছে বাংলার সুদূর কোন পল্লীর গৃহকোণে যেখানে ওর মা আজও প্রতীক্ষা করছে ওর প্রত্যাবর্তনের। ঠিক এমনি একজন যুবককে গেট অব্‌ ইণ্ডিয়ার সামনের ফুটপাতে আখ মারাই করার কলের চাকা ঘোরাতে দেখেছিলাম। সেও এসেছিল উচ্চ আশা নিয়ে। বোম্বে গেলে আর কিছু না হোক সিনেমায় চান্স পাওয়া যায় এই আশা নিয়ে সে এসেছিল। দরজায় দরজায় ঘুরে অবশেষে ফুটপাতে আখের রস বিক্রির চক্রে আটকে গেছে। সে-ও ফিরে যেতে সাহস পায় না, সে-ও বোধহয় এই ছেলেটার মতই বাবা-মায়ের টাকা আত্মসাৎ করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে ছিল।

আমি, কিছু বলার সাহস পেলাম না তার চোখের জল দেখে।

শঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করল, এখান থেকে অওরঙ্গাবাদ যাবার সহজ উপায় কি বলতে পার ?

সহজ উপায়। সহজ উপায়! আপনারা শিবাজীনগরে যান। সেখান থেকে সকালবেলায় অওরঙ্গাবাদের বাস ছাড়ে। বিকেলের মধ্যেই অওরঙ্গাবাদ পৌঁছে যাবেন। তবে কাল সকালে যেতে হলে আজই টিকিট কেনার চেষ্টা করতে হবে।

শঙ্করবাবু নিচু গলায় বলল, সারাদিন বাসে যেতে হবে। পেট শুকোবে।

না স্যার। ঠিক দুপুরে বাস আহম্মদনগরে দাঁড়াবে আধঘণ্টা। সেখানে ভাল হোটেল আছে। কোন অসুবিধা হবে না। আর ট্রেনে যেতে পারেন। সে অনেক ঘোরা পথ।

হোটেল থেকে বেরিয়ে সোজা গেলাম শিবাজীনগরে।

নতুনদিদি বললেন, আমরা মনমদ হয়ে ট্রেনে গিয়েছিলাম। এবার বাসেই যাব।

আমরা গিয়েছিলাম বাসে, ফিরেছিলাম ট্রেনে।

অওরঙ্গাবাদ নামের সঙ্গে যিনি জড়িত তিনি হলেন বিখ্যাত বাদশাহ অওরঙ্গজেব। মারাঠা মূষিককে দমন করতে দিল্লির সুখের পরিবেশ ছেড়ে জীবনের শেষ পঁচিশ বছর বাদশাহ অওরঙ্গজেব আলমগীর অওরঙ্গাবাদ শহরের দুর্ভেদ্য দুর্গে বাস করেছিলেন।

এই সেই আওরঙ্গাবাদ।

পথে আহম্মদনগরে দুপুরের খাবার জুটেছিল। অসুবিধা হয়নি।

দুর্গম পাহাড়ের বুক কেটে কালো পীচের রাস্তা এঁকে বেঁকে ছুটে চলেছে কোন অজানার সন্ধানে, কে জানে! মাঝে মাঝে কেমন উদাসীনতা জাগছিল মনে। ভাবছিলাম আর কতদূরে। পাহাড়ের গায়ে কচিৎ দু-একটা গ্রামের চেহারা দেখা গেলেও খুব জনবহুল নয় বলেই মনে হল। পথে মাঝে মাঝে মারাঠি কৃষক ঘরের মেয়েদের ঝুড়ি মাথায় করে যেতে দেখেছি, প্রায় জনশূন্য এই পথে পিঠে শিশুসন্তানকে বেঁধে মাথায় বোঝা নিয়ে পুরুষের মত কাছা দেওয়া শাড়ি পড়ে যাদের মাঝে মাঝে দেখছিলাম তাদের দেহের গঠনে বলিষ্ঠতা থাকলেও মেয়েদের স্বাভাবিক কমনীয়তা চোখে পড়ছিল না। রুক্ষ পাহাড়ের মাথায় বেরসিক বিরাট বৃক্ষগুলো কিছুটা দৃষ্টিতে শ্রান্তি এনে দিচ্ছিল, যা উপভোগ করছিলাম নির্বিকার ভাবে। নির্মলবাবু বললেন, দেখুন দাদা, আশে পাশে জলের কোন চিহ্ন নেই, কোন পাহাড়ি নদী নেই। নেই কোন নদীর ওপর কোন সাঁকো। বারিহীন অঞ্চল মারাঠিদের কর্মপটু করেছে।

আমি কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে বললাম ওই দেখুন একটা জলাধার। রাস্তার পাশে পাশে বোধহয় কয়েক ফার্লং জুড়ে এই খাল তবে জল উপচে পড়ছে না। বেশ শান্ত এই জলাধার। বাতাসে যে সামান্য তরঙ্গ তুলছে তা আপনা থেকেই ঝিমিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের আশে পাশে গাছের তো অভাব নেই। অবশ্যই এই পশ্চিমঘাট পাহাড়ে বৃষ্টির খুব কমতি নেই। নইলে গাছগুলো বাঁচত না নিশ্চয়ই।

দেখতে দেখতে বেলা বারটা নাগাদ আহম্মদনগরে এসে দাঁড়াল গাড়ি।

ভারতের ইতিহাসে আহম্মদনগরের বিশেষ স্থান রয়েছে। এখানেও রয়েছে মোগল আমলের বিরাট একটি দুর্গ। এই দুর্গের অভ্যন্তরে কয়েদখানায় ইংরেজ বিরোধী ভারতীয় নেতাদের বার বার বন্দী করে রেখেছে ইংরেজ সরকার। ভারত স্বাধীন হবার আগেও আজকের যারা ভারত প্রশাসনের বিধাতা তারা আটক ছিলেন এই বন্দীশালায়।

বেশ বড় শহর।

পাহাড়ের উপরে ছোটখাট মালভূমিতে এই শহর। জেলার প্রাণকেন্দ্র। সমগ্র জেলার মানুষ এখানে ভিড় করে রুটিরুজির ধান্দায় অথবা কোন

প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহে। শহর বেশ কোলাহলময়। টাঙ্গার ঘোড়াগুলো বিশ্রাম নিচ্ছে এক পাশে। টাঙ্গাওলা অপেক্ষা করছে সোয়ারি পেতে, পাশেই বাস স্ট্যান্ড। আমরা সবাই নেমে পড়েছিলাম খাবারের ধান্দায়। সরকারী বাস, সময় নির্দিষ্ট। আধ ঘণ্টার মধ্যে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আবার বাসে উঠতে হবে।

বিকেলবেলায় পৌঁছালাম অওরঙ্গাবাদ। এখানে জীবনের শেষ পঁচিশ বছর বাস করেছিলেন আওরঙ্গজেব।

রেল স্টেশনের পাশেই বাস স্ট্যান্ড।

নেমেই শুনলাম, প্রতিদিন সকালে ইলোরার সরকারী বাস ছাড়ে স্টেশন থেকে। দর্শনার্থীদের দ্রষ্টব্য স্থান দেখাবার ব্যবস্থা আছে। গাইড থাকে। সরকারী ব্যবস্থা নিখুঁত। এই পরিদর্শন ব্যয়বহুলও নয়।

সামনেই ধর্মশালা।

স্থান নেই।

রাত কাটালাম বারান্দায় শুয়ে।

পরের দিন সকালবেলায় ইলোরার পথে যাত্রা। অগ্রিম বুকিং করতে ভুল করিনি।

গাড়ি চলতে চলতে দাঁড়ায় একটি লাল পাথরে তৈরি মন্দিরের সামনে।

দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দির।

গাইড বললেন, এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন অহল্যাবাঈ। স্বাধীন ইন্দোর রাজ্যের মহারাণী।

মনে মনে ভাবছিলাম, মহারাষ্ট্রে আর মধ্যভারতে রয়েছে বহু ইতিহাস। কিছু লিখিত আর কিছু অলিখিত। অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে হল। হোলকারদের রাজ্য ছিল এই বিরাট মারাঠাভূমিতে। ধর্মপ্রাণা অহল্যাবাঈয়ের বহু বদান্যতা ও মহত্ত্বের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে তাঁর রাজ্যের কোণায় কোণায়। এই মহীয়সী মহিলা ছিলেন দেশীয় নৃপতি শাসিত হোলকার রাজ্যের গৌরব। তাঁর অক্ষয় কীর্তি এই মন্দির। অভ্যন্তরে প্রবেশ করে দেবতার উদ্দেশে জানালাম অহল্যাবাঈকে প্রণাম যিনি শাসন শোষণ করেই ক্ষান্ত হননি তোষণ করেছেন তাঁর প্রজাবৃন্দকে, রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন প্রজাদের স্বার্থ।

গাইডের তাগাদায় আবার সোয়ারি হতে হল সরকারী বাসে।

বাস ছুটল দেবগিরির পথে।

এই সেই দেবগিরি যেখানে প্রথম বাধা পেয়েছিল আলাউদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর। বিরাট দুর্গের চারিদিকে পাথরের প্রাচীরের ভেতরে আরও একটি দুর্গ। এই দুর্গ জয় কি করে সম্ভব হল তা ভাবা যাচ্ছিল না। এই দেবগিরির দেবত্ব নাশ করে নতুন নামকরণ হয়েছিল দৌলতাবাদ।

নতুনদিদিকে বললাম, আমার সঙ্গী শঙ্করবাবু দুর্গ দেখে অভিভূত।

বাহমণি রাজত্বকালের বিজয় তোরণ সামনে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। বাঁ দিকে

ভারতমাতার মন্দির। এই ছোট একটা জলপূর্ণ পরিখার ওপর অস্থায়ী একটা সেতু। সেতু পেরিয়ে মূল দুর্গ। এই দুর্গে বাস করতেন হিন্দু রাজা শঙ্কর। এঁকে পরাজিত আর নিহত করে কাফুর এই দুর্গ দখল করেছিল আর বন্দী করেছিল পলায়িত আত্মগোপনকারী গুজরাত রাজকে।

সবার আগে একটি কথা মনে হয় নতুনদি। এই সব মধ্যযুগীয় রাজা রাজরাদের কোন আত্মিক সম্পর্ক ছিল না প্রজা সাধারণের সঙ্গে। বিপন্ন রাজাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসত না জনসাধারণ, তাদের মনে কিছুমাত্র দেশপ্রেম ছিল বলে মনে হয় না অন্তত রাজার প্রতি কোন শ্রদ্ধাই ছিল না।

অতীতের এই কাহিনী ও তার বিশ্লেষণ নতুনদি শুনছিলেন, কোন মন্তব্য করছিলেন না কিন্তু তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করছিলেন অবস্থাটা।

আমার কথা শেষ হতেই বললেন, তারপর ?

পাঁচ

মহম্মদ তোঘলক জুনা খাঁ স্থির করলেন, তাঁর রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করবেন। চর অনুচর পাঠিয়ে দেবগিরিকে মনোনীত করে নতুন নগর স্থাপনের নির্দেশ দিলেন। আর নির্দেশ দিলেন আমীর ওমরাহ আর পারিষদ, সৈন্যবাহিনী, ব্যবসায়ী এমনকি ভিখারীদের নতুন রাজধানীতে চলে যেতে।

নতুন রাজধানীর নাম হল দৌলতাবাদ।

অঙ্কের হিসাবে মহম্মদ তোঘলক ভুল করেননি। বাস্তব হিসাবে ভুল হয়ে গিয়েছিল। রাজা থাকবে রাজধানী থাকবে, উপকরণ সব থাকবে, কিন্তু থাকবে না জল। প্রয়োজনমত জলের ব্যবস্থা না থাকলে রাজধানীর লক্ষাধিক লোকের তৃষ্ণা যদি না মেটে তাহলে অমন রাজধানী হবে মনুষ্যবাসের অযোগ্য।

দৌলতাবাদে ও তার আশেপাশে জলের ব্যবস্থা ছিল না। পাথর কেটে হ্রদ তৈরি করেও জলের সমস্যা মেটাতে না পেরে মহম্মদ তোঘলককে ফিরে আসতে হয়েছিল দিল্লিতে।

কিন্তু !

যাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল নতুন রাজধানী যাবার তাদের কথা সুলতান একবারও চিন্তা করেননি।

একদিন শেষরাতে দিল্লির নগররক্ষী দেখল একজন ফকির বেরিয়েছে গ্রামাঞ্চলে ভিক্ষা করতে।

তা হলে তখনও দিল্লিতে একজন অবাধ্য প্রজা বাস করছে। সুলতান ফরমান অগ্রাহ্য করার সাহস পেল একটা ফকির।

নগররক্ষী তাকে গ্রেপ্তার করে দৌলতাবাদ রওনা করে দিল। তাকে পাহার দিয়ে নিয়ে চলল পাঁচজন সেপাই।

বৃদ্ধ ফকির পায়ে হেঁটে পাঁচ-ছয় শত ক্রোশ রাস্তা যে যেতে পারে না তা একথা একবারও কেউ ভেবে দেখেনি। সুলতানের সিপাহীরা তাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল দৌলতাবাদে। পথ চলতে চলতে অনাহারে ক্লান্ত রুগ্ন ফকির পথেই মারা গেল। কিন্তু সুলতানের আদেশ শেষ ব্যক্তিকে জীবন্ত অথবা মৃত অবস্থায় দৌলতাবাদ যেতেই হবে। সিপাহীরা বৃদ্ধ ফকিরকে একটা ঘোড়ার সঙ্গে দড়ি দিয়ে বেঁধে টেনে নিয়ে চলল। রাস্তায় আঘাতে আঘাতে ফকির পঞ্চত্ব লাভ করলেও তার নিস্তার নেই। যখন সেই ঘোড়া নিয়ে সিপাহীরা দৌলতবাদে পৌঁছল তখন মৃত ফকিরের দেহ টুকরো টুকরো হয়ে পথের ধুলোয় মিশে গিয়েছিল। সিপাহীরা সুলতানী আদেশ পালন করতে ফকিরের দেহের কয়েকটি অস্থি নিয়ে গিয়েছিল। ফকির সুলতানের হুকুম পালন করতে বাধ্য হয়েছিল এবং সেই হুকুম পালন করতে ফকিরের কয়েকখানা অস্থি পৌঁছেছিল দৌলতাবাদে। রাজার আদেশ পালনের নির্মম দৃষ্টান্ত।

আকবর বাদশাহও ভারত শাসন ও শত্রুর আক্রমণ থেকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য ফতেপুরসিক্রিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন আগ্রা থেকে কিন্তু রাজধানীর জনসাধারণের জন্য জলের অভাব শীঘ্রই অনুভব করেছিলেন। সুসজ্জিত ফতেপুরসিক্রির দুর্গ পরিত্যাগ করে আবার ফিরে এসেছিলেন আগ্রায়।

অঙ্কের হিসাবে ঠিক থাকলেও বাস্তব হিসাব ঠিক না হলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। আকবর যা করেছিলেন মহম্মদ তোঘলক তা করতে পারেননি। এর পরিণামে তোঘলকী রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

আজও দৌলতাবাদ শহরের ভগ্নাবশেষ সহজেই নজরে পড়ে।

দেবগিরি দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের যে পথ তা সরু এবং অন্ধকার। পাহাড় কেটে আঁকা বাঁকা পথে প্রবেশ সুকঠিন। দিনের বেলায় গাইড মশালচি ডেকে এনে আমাদের দুর্গের উপর তলায় নিয়ে গেলেন। যেখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করে না, একটি মন্দিরের গর্ভগৃহ দিয়ে অন্ধকার সরু পথ দিয়ে যারা দুর্গের সুরক্ষিত উপর অংশে উঠেছিল তাদের কেউ পথ না দেখালে কোন ক্রমেই তা অসম্ভব হত না।

এবার ইলোরা দর্শন।

শঙ্করবাবু বললেন, ইলোরা অজন্তা না দেখলে ভারত দর্শন অসম্পূর্ণ থাকে।

ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যখন প্রাধান্য ঘটেছিল বৌদ্ধ ধর্মের উপর সেই সময় এই পর্বতগাত্রে হাজার হাজার ভাস্করের কয়েক বৎসরের চেষ্টার ও দক্ষতায় ইলোরায় কৈলাশ মন্দির নির্মাণ করা হয়েছিল এই পার্বত্য অঞ্চলের বনানী পরিবৃত অংশে। মুসলমান লুটেরার দল আঘাত করতে নিশ্চয়ই কসুর করেনি। বোধহয় তেমন সাফল্যলাভ করতে পারেনি। তা হলে এই বিশ্ববন্দিত ভাস্কর্য চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেত। ভারত হারাত তার অমূল্য সম্পদ। ইলোরার মন্দির, গুহা ভাস্কর্য যারা দেখেছে তারাই অবাক হয়ে গেছে।

চলতি পথে একটা ছোট পাহাড়ের ওপর দেখলাম তাজমহলের মত একটি সৌধ।

গাড়ি থেকে নেমে দেখতে হল।

বিবিকা মকবরা।

দূর থেকে তাজমহল বলে অনেকে ভ্রম করে থাকে।

অওরঙ্গজেবের পৌত্র আজিম উস্-শান ছিলেন বাংলার সুবাদার। অত্যধিক অমিতব্যয়ী, অপব্যয়ী ও অত্যাচারী এই শাহজাদার সঙ্গে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁয়ের প্রতি নিয়ত মতান্তর চলত। অওরঙ্গাবাদে বসে যুদ্ধ পরিচালনা করছিলেন অওরঙ্গজেব। তাঁর প্রয়োজন ছিল টাকার। বাংলাদেশ চিরকালের টাকার থলি এবং দিল্লির উপনিবেশ। অতীতে যা ছিল বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম আজও ঘটেনি।

দেওয়ান মুর্শিদকুলি বাদশাহের কাছে আর্জি জানালেন। আজিম উস্শানের বিলাসিতার ব্যয় মিটিয়ে বাদশাহী খাজানাচি খানায় দেবার মত টাকা দেওয়ানের তহবিলে আর থাকছে না। মুর্শিদকুলির আর্জি পাওয়া মাত্র অওরঙ্গজেব আজিম উস্শানকে ডেকে পাঠালেন দাক্ষিণাত্যে এবং দাক্ষিণাত্যের সুবেদারি তাকে দিয়ে নিজে অওরঙ্গাবাদে বসে আজিম উসমানের কার্যকলাপের ওপর নজর রাখলেন। বেরোরে পড়ল আজিম। দৌলতাবাদের দুর্গের সর্বোচ্চ গৃহে বাস করতে থাকেন তাঁর পরিবার নিয়ে। এমন সময় তাঁর মাতা দেহত্যাগ করলেন।

আজিম তার মাকে কবর দিলেন এই পাহাড়ের সমতলে। মায়ের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে তাজমহলের ধাচে গড়লেন এই সমাধি মন্দির। নাম দিলেন বিবিকা মকবরা।

আমি দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, কে শ্রেষ্ঠ! প্রেমিক শাহজাহান, অথবা মাতৃভক্ত আজিম-উস্-শান।

আমরা গদগদ হয়ে বলে থাকি শাহজাহানের অজেয় প্রেমের কথা, অবশ্য সে প্রেম যে নিখাদ ছিল এমন কথা কেউ হলফ্ করে বলতে পারে না কিন্তু আজিম-উস-শানের মাতৃভক্তিকে ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই। তার মাতৃভক্তি ছিল নিখাদ।

আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করে শঙ্করবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, কি ভাবছেন দাদা?

ভাবছি কে বড়! শাহজাহান অথবা আজিম-উস্-শান! স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা অথবা মায়ের প্রতি ভক্তি। অবশ্য দুইটিই দুই মেরুর প্রশ্ন কিন্তু বাদশাহ হারেমে মায়ের ভূমিকা কতটা তার ইতিকথা কেউ লেখেনি। মায়েরা সব সময় যবনিকার অন্তরালে থেকে গেছেন। তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা স্বামীর কাছে কতটা পেয়েছেন তাও বলা দুষ্কর তবুও একটি সন্তান যে মাকে এত বড় করে তুলেছেন তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। আজিম-উস্-শানের চরিত্রগত যত দুর্বলতা থাকুক, সব দুর্বলতার উপরে রয়েছে তার মাতৃভক্তি, এই একটি গুণের জন্য তার শত অপরাধ মার্জনার যোগ্য। পর্দার ভেতর থেকে বাইরে মুখ বের করেছিলেন রাজিয়া সুলতানা, মৌলবাদীরা তাকে যথাযথ শিক্ষা দিয়ে ধরাধাম থেকে বিদায়

করেছিল, আরেকজন হলেন নূরজাহান। তাঁকে দমাতে পারেনি কেউ-ই।

শঙ্করবাবু আমার দেখাদেখি বিবিকা মকবরাকে হাত তুলে নমস্কার করলেন। আমরাও ধীরে ধীরে নেমে চললাম পীচের রাস্তায় যেখানে আমাদের কুলদাবাদে নিয়ে যাবার জন্য বাস অপেক্ষা করছিল।

অওরঙ্গজেব দেহত্যাগ করলেন অওরঙ্গাবাদে।

মৃত্যুর আগে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর দাফন হবে তাঁর সঞ্চিত টুপিসেলাই ও কোরাণ নকল করার থেকে অর্জিত অর্থে।

কোন সমারোহ নেই।

নীরবে শববাহকরা তাঁর মৃতদেহ নিয়ে এলো কুলদাবাদের মসজিদে।

মসজিদ প্রাঙ্গণে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

কুলদাবাদের মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে ভারতের সবচেয়ে পরাক্রান্ত ও কূট কৌশলী মোগল সম্রাটের কবরস্থানের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা দুজন। বহুজন আসছে। মাজারে ফুল দিচ্ছে, কেউ কেউ মোমবাতি জেবলে বিগত সম্রাটকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

কিন্তু একি!

সম্রাটের কবর চিহ্নিত করার মত কোন চিহ্নই ছিল না। লর্ড কার্জন যখন ভারতের ভাইসরয় ছিলেন তখন সরকারী খরচে শ্বেতপাথরের ঝড়োকা দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলেন এই মোগল সম্রাটের মাজার। আমি মোগল কায়দায় কুর্ণিশ করতে করতে তিন পা এগিয়ে আবার তিন পা পিছিয়ে এলাম।

শঙ্করবাবু আমাকে কুর্ণিশ করতে দেখে মৃদু হেসে বললেন, কুর্ণিশ করছেন কেন?

বাদশাহকে সম্মান দেখাতে।

সবাই বলে এরকম সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুবিদ্বেষী নৃপতি ভারতের মসনদে এর আগে কেউ বসেনি।

কথাটা সার্বিক সত্য নয়। অওরঙ্গজেব মুসলমান ছিলেন, ছিলেন নিষ্ঠাবান মৌলবাদী মুসলমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ তো নেই। ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী। পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদীর একই চরিত্র। আওরঙ্গজেব কোন ব্যতিক্রম নয়। কূটকৌশলী বলে খ্যাতি থাকলেও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাবেই নিজেও ডুবেছিলেন, ডুবিয়েছিলেন বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে। আওরঙ্গজেব সবই পেয়েছিলেন পাননি মানুষের ভালবাসা। এর ফলে রাজনীতিতে তাঁর পরাজয় ঘটেছিল প্রতি পদক্ষেপে। কিন্তু তিনি যে খাঁটি মৌলবাদী মুসলমান ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমি কুর্ণিস করলাম বাদশাহের নিষ্ঠাকে, এই নিষ্ঠাই তাকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে গেলেও তিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠা কখনও হারাননি। আওরঙ্গজেব চরিত্রের এই বৈশিষ্টকে কুর্ণিশ করেছি।

শঙ্করবাবু বোধহয় মনে করলেন আমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। ইতিহাস

যাকে ক্ষমা করেনি তাকে সম্মান দেখানো তাঁর কাছে আশ্চর্যজনক মনে হওয়া স্বাভাবিক।

কিন্তু যে বাদশাহ ছিলেন সমগ্র উত্তর ও মধ্য ভারতের দণ্ডমুণ্ডকর্তা, যিনি ইচ্ছা করলে বিরাট মর্মর সৌধ গড়তে পারতেন তাঁর সমাধিতে তিনি মনে মনে ছিলেন ত্যাগী ফকির। ইসলামী মতে বাদশাহ ছিলেন মহান।

কিন্তু আমি ভাবছি এই সেই আলমগীর আওরঙ্গজেব!

এই বাদশাহকে কেন্দ্র করে কত কথা, উপকথা, গাথা রচনা হয়েছে, কত মানুষ এর গরিমার কথা বলেছে, কত মানুষ ওকে ঘৃণা করেছে, কত মানুষ কত কাণ্ড করেছে, প্রাসাদে ও প্রাসাদের বাইরে, তার শেষ পরিণতি এই সাড়ে তিনহাত মাটির চেয়ে বেশি প্রয়োজন কি ছিল এই বাদশাহের। তার গরীব প্রজার জন্য যতটুকু মাটি মাপা থাকে তার চেয়ে বেশি এক আঙ্গুল মাটিও বাদশাহের জন্য প্রয়োজন হয়নি, অথচ সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও পরধর্ম অসহিষ্ণু এমন বাদশাহ তার লালসা, জিঘাংসা পূর্ণ করতে কত নগর, কত গ্রামে ধ্বংস করেছে, কত নরনারীর রক্তপাত ও অমর্যাদা ঘটেয়েছে তা স্মরণ করলে শিউরে উঠতে হয়।

মধ্যভারতের নীরস পার্বত্য মালভূমিতে বাদশাহ বাস করেছিলেন সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর কিসের আশায়? সাম্রাজ্য বিস্তারে অথবা হিন্দুদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করতে? কোনটাই করতে পারেননি বাদশাহ। হতাশা নিয়ে আওরঙ্গবাদের পাহাড়ে ঘেরা দুর্গের কোন নিভৃত কক্ষে স্বজন পরিজন কর্তৃক ধিকৃত হয়ে ভারত ঈশ্বর আলমগীর পরিপূর্ণ বার্ধক্যে দেহত্যাগ করেছিলেন। তাঁর পুত্ররা মসনদ দখলের জন্য হাতিয়ার বন্ধ হলেন, সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন, আর আমীর ওমরাহরা নিজেদের নসীব গোটাতে ব্যস্ত হলেন। অত জ্ঞানীগুণী বাদশাহের যতটা দূরদৃষ্টি থাকা উচিত ছিল, তা ছিল না তাই সাড়ে তিন হাত মাটির তলায় শেষ শয্যা পাতার সময় ছিল শুধু ধিক্কার ও হতাশা। কবরই যে শেষ আশ্রয়। কবরে যাবার জন্য, সাধারণ মানুষ যেমন বাঁচার রিহার্সেল দেয় তেমনি রিহার্সেল দিতে হয়েছিল বাদশাহকে। মানুষ হিসাবে বাদশাহ হিসাবে তার পরিচয় রেখে যেতে পারেননি।

বিবিকা মকবরা তাজমহলে নয়। সৌষ্ঠব অতি সাধারণ কিন্তু তাতে স্পষ্ট দেখা গেছে আজিমের মাতৃভক্তি, আর এরই কয়েক ফার্লং দূরে বাদশাহ আলমগীরের কবর শাখায় ফুটে উঠেছে হতাশার কান্না। কান্নার শব্দ আজ আর শোনা যায় না।

এ কান্না শোনা যায় না। এটা বাদশাহের কান্না নয়, অত্যাচারিত ও লাঞ্ছিত প্রজাদের কান্নার শব্দ এই অনাদৃত মসজিদের আশে পাশে ভেসে বেড়াচ্ছে। বাদশাহের মহাপ্রয়ানের দিন কেউ অশ্রুপাত করেছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই, বাদশাহের বংশধর ও আত্মীয়স্বজনরা তখন ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে ব্যস্ত। ঠিক একইভাবে সাম্রাজ্য ভাগ বাঁটোয়ারা পুনরাবৃত্তি। যে পাপের বোঝা মাথায় করে বাদশাহকে পঞ্চাশ বছর কাটাতে হয়েছে উত্তপ্ত মসনদে বসে সে দিনগুলোর উল্লেখ

নেই তারিখি-আলমগীরিতে। কণ্টকশয্যায় রাত কাটিয়ে বাদশাহ শেষ বয়সে ভাল করে বুঝেছিলেন, গোলাপেও কাঁটা আছে তা অহরহ তাঁর বুকে শোলার মত বিঁধছে। আজ শুধু ইতিহাসের পাতায় শোভাবর্ধন করছে তার নাম।

শঙ্করবাবু আমার হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলেন।

এই অখ্যাত শুষ্ক মধ্যভারতের মালভূমিতে বাদশাহ চিরনিদ্রায়। কিন্তু বাদশাহ ভেবেছিলেন অওরঙ্গাবাদের এই দুর্গে বসে গোটা ভারত শাসন করবেন তাঁর সামরিক শক্তি দিয়ে। যারা অতীতকে অস্বীকার করে বর্তমানকে গড়তে চায় তারা ভবিষ্যতকেও তমসাবৃত করে। এটাই হল অভ্রান্ত সত্য।

ইলোরা নামটাই কেমন মোহময়।

নতুনদি বললেন, এই মোহই আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল ইলোরায়। তবে তোমার দৃষ্টিভঙ্গী আমার দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। কৈলাশ মন্দিরের বিরাট শিবমূর্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেছি, এটা মানুষসৃষ্ট না দেবসৃষ্ট। ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাধান্য বিস্তার ঘটেছিল বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লুপ্ত করতে। এই মন্দির তৈরি হয়েছিল সেই যুগেই। ভাস্কর্যে বৌদ্ধযুগের প্রভাব যথেষ্ট থাকায় দুই যুগের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল এই ভাস্কর্য। নারীদের সমাজে কতটা স্থান ছিল তা অনুধাবন করা যায় ইলোরার বিরাট বিরাট মন্দির চত্বরে। নারীকে যথেষ্ট মর্যাদা দেওয়া হত সেই যুগে তার চিহ্ন স্পষ্ট রয়েছে মন্দির গাত্রে। কেমন সৌম্য সমাহিত নারী মূর্তির ভাস্কর্য ছড়িয়ে আছে মন্দির গাত্রে।

বলতে বলতে থেমে গেলেন নতুনদিদি।

এর আগে আবেগ সহকারে এভাবে বাক্যবিন্যাস করতে দেখিনি।

কিছুক্ষণ পরেই বললেন, আজ আমরা রয়েছি তিরুমালাই পাহাড়ের নিচে তিরুপতি শহরে। আমরা কতটুকু জানি তিরুপতি আর তিরুমালাই সম্বন্ধে কিন্তু তিরুপতির মহিমা আমরা বহুদিন আগে বহুদূর থেকে শুনেছি। অন্ধ্রের অধিবাসী মাত্রই তিরুপতির নামে আত্মহারা হয়ে থাকে।

হেসে বললেন, ওটা অন্ধ্রবাসীদের পক্ষে যেমন প্রযোজ্য তেমনি প্রযোজ্য উড়িষ্যার ক্ষেত্রে। জগন্নাথ ভিন্ন অন্য কোন দেব দেবতার অস্তিত্ব ওড়িয়াদের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। যেখানে ওড়িয়ারা দলবদ্ধ ভাবে বসবাস করে সেখানে জগন্নাথ সমিতি, জগন্নাথ কীর্তন ইত্যাদি গড়ে ওঠে। জগন্নাথই ওদের ধ্যানজ্ঞান। নেপালেও লক্ষ্য করা গেছে পশুপতিনাথের প্রভাব, নানা দেশে নানা দেবতার প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক।

শিল্পে সংস্কৃতিতে স্বাভাবিক মানুষের জীবনে যা ঘটা উচিত তা সব সময় ঘটে না। পটপরিবর্তনই তখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। পরিবর্তন কিছুটা কৃত্রিম, কিছুটা অকৃত্রিম। বেছে নেওয়া কঠিন।

তিরুমালাই পাহাড়ে বৈকুণ্ঠেশ্বর মন্দির প্রত্যাগত নরনারীদের মুণ্ডিত মস্তকের দিকে তাকিয়ে নতুনদিদি অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। মুণ্ডিত মস্তকের সংখ্যা কম নয়, আর তাতে রয়েছে বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী ও শিশু। সবাই মানত করেছিল কোন অভিষ্ট লাভের আশায়। অভিষ্টপূর্ণ না হলে এমন পাইকারি হারে মস্তক মুণ্ডন কল্পনা করা যায় না।

নতুনদিদি বললেন, ধর্মের নামে কত কি যে ঘটে তার হিসাব পাওয়া যায় না ভাই। ভারতবর্ষের মত বিরাট দেশের সংহতি রক্ষা করেছে সর্বজনীন মুদ্রা ব্যবস্থা আর ধর্ম।

হেসে বললাম, ওটাই কাল হয়েছে নতুনদি। ধর্মকে রাজনীতির আসরে নিয়ে এসে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছিল জিন্নাহ। আর আমরা এই সব ধর্মব্যবসায়ীদের প্রতারণায় মেনে নিয়েছিলাম হিন্দু ভারত আর মুসলীম ভারতের সর্বনাশা ফর্মুলা। তার ফল ভোগ করছে গোটা দেশ।

নতুনদিদি বললেন, তখন গদীতে বসার লোভে কংগ্রেস মেনে নিয়েছিল এই দ্বিজাতি তত্ত্ব। ইংরেজ ভেবেছিল তাদের অনুগত জনের হাতে ক্ষমতা দিয়ে আর্থিক বনিয়াদ শক্ত করবে। তবুও তারা ভরসা পায়নি, স্থায়ী অশান্তির বীজ বপন করে দিয়ে গেছে হিন্দু ভারত আর মুসলীম ভারত গড়ে দিয়ে। এখন সবাই চায় ধর্মের ভিত্তিতে নিজের নিজের রাজ্য বা রাষ্ট্র। তাই অশান্তি ঘিরে রয়েছে গোটা ভারতকে। অবশ্য ভারত ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে বোগাস প্রচার চালিয়ে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে। কংগ্রেস ধর্ম নিরপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে নিজেদের দুর্বলতা গোপন করে স্বার্থসিদ্ধির পথ খুঁজছিল। আজও স্বার্থসিদ্ধির জন্য একই মন্ত্র জপছে প্রশাসক।

আমি নতুনদিদিকে এভাবে আলোচনা করতে শুনিনি। আজ বিস্মিতভাবে প্রশ্ন করলাম, হঠাৎ এসব কথা কেন মনে হল আপনার ?

হঠাৎ নয়। অনেক আগেই মনে হয়েছে, কাউকে বলিনি ভাই। কংগ্রেস যেমন অ-ধর্ম নিরপেক্ষ, তেমনি অন্যান্য দলগুলোও অ-ধর্ম নিরপেক্ষ। মোট কথা ভারতের যত রাজনৈতিক দল আছে তাদের নাম দেওয়া উচিত ভোট ক্যাচিং পার্টি। যাদের কাজ হল ঘোমটার তলায় ধর্মকে রেখে ধর্ম নিরপেক্ষতার ভণ্ডামি করা। কংগ্রেস কেরলে মুসলীম লীগের সঙ্গে জোট বেঁধেছে, পশ্চিমবাংলায় বাংলা একাডেমি গঠনের আগেই শতকরা তিন চারজন উর্দুভাষী মুসলমানদের জন্য উর্দু একাডেমি হয়ে গেছে। এটা কি ? সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার নামে ভোটের পকেট তৈরি করা ভিন্ন আর কিছু নয় : এই সব অনাচার ও রাজনীতির ব্যভিচার ডেকে এনেছে খলিস্তানী আন্দোলন, কাশ্মীরের অশান্তি। এগুলো সমাধানের পথ মাঠে ময়দানে বক্তৃতা করে যে হয় না সেটা কি নেতারা জানে না। এই পার্থক্য বজায় রাখতেই হিন্দু কোড তৈরি হলেও কোন মুসলমান কোড

করার সাহস পায়নি। সব চেয়ে প্রয়োজন ছিল একটি ভারতীয় সিভিল কোড, এই কোডে থাকবে সব ধর্মাবলম্বীদের জন্য একই দেওয়ানী আইন। ওরা পার্থক্য বজায় রেখে ধর্মনিরপেক্ষ হবার আকাশকুসুম দেখছে। এর সমাধান ওরা চায় না।

বললাম, ঠিক এইভাবে শিক্ষা বিস্তারের নামে অশিক্ষার বোঝা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে। কারণও রাজনৈতিক। বেকার ও অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত যুব সমাজ নেতাদের গামছা-লাঠি ঘাড়ে নিয়ে ভোটের বাজার গরম করবে, আর ক্ষমতালোভীরা বার বার ক্ষমতা আঁকড়ে ধরতে পারবে, পারবে তাদের দুর্নীতিকে সুনীতির নাম দিয়ে চালু রাখতে। সর্বনাশ ঘটবে সাধারণ মানুষের।

এবার গন্তব্যস্থল গোলকুণ্ডা।

বললাম, দেবগিরিতে বাহমনি সুলতানদের বিজয় মিনারের কথা আপনাকে বলেছি, আপনিও নিশ্চয়ই দেখেছেন। এই বাহমণি রাজাদের কেন্দ্র ছিল গোলকুণ্ডায়। গোলকুণ্ডা প্রসিদ্ধ তার দুর্গের জন্য। ইলোরার পথে আহম্মদনগর পেরিয়ে যেতে হয়েছিল। সেটা ছিল চাঁদ সুলতানার শক্তির কেন্দ্র। আহম্মদনগরের পতন ঘটেছিল মোঘলের হাতে তবে খুব সহজে নয়।

মধ্যযুগের সেই সব কলঙ্কময় ইতিহাস আজকের জমানায় যথেষ্ট প্রভাব রেখেছে। মনের আনন্দে পাহাড়ের উঁচু নিচু পথ ভেঙ্গে উপরে উঠবার সময় নতুনদিদি প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলাদেশে এ রকম দুর্গ কিন্তু একটাও নেই।

বললাম, আছে একটা।

কোথায় ?

বকসা দুয়ারে। শোনা যায় এই দুর্গ ছিল ভুটান আর কোচবিহার রাজ্যের পাহারাদার।

কোচবিহার আর ভুটানের দ্বন্দ্বে কোচবিহারের রাজা ইংরেজের সাহায্য প্রার্থনা করল।

ইংরেজের সাহায্য যারা চেয়েছে তাদের গ্রাস করতে মোটেই বিলম্ব করেনি ইংরেজ কোম্পানি। ভুটানের বিরুদ্ধে ইংরেজ সৈন্য এসেছিল যুদ্ধ করতে, যুদ্ধে ভুটান বাহিনী পরাজিত হল, ইংরেজ দখল করল বক্সার দুর্গ। স্থায়ীভাবে বক্সারে ইংরেজ সৈন্যদের আশ্রয় গড়ল। কোচবিহারের রাজা ভুটানের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচল কিন্তু ইংরেজ আধিপত্য স্বীকার করে রাজ্যের মোট রাজস্বের অর্ধেক বার্ষিক কর রূপে দেবার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

পাহাড়ের উপর এখনও সেই বক্সার দুর্গ জীর্ণ অবস্থায় রয়েছে, কিছুকাল এই দুর্গকে বিপ্লবীদের বন্দীশালারূপে ব্যবহার করেছে ইংরেজ সরকার।

বাংলার মাটিতে সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ অসম্ভব।

বাংলাকে রক্ষা করেছে তার নদী। নদীই ছিল স্থায়ী দুর্গ। ঢাকার উল্টো দিকে বুড়িগঙ্গার অপর তীরে মুসলমান সুবেদাররা একটা ইঁটে ঘেরা কেল্লা তৈরি করেছিল। সিরাজকে হত্যা করার পর তার মা ও অন্যান্য পুর-

নারীদের এই কেল্লায় আটক রেখেছিল মীরজাফর। শত্রুকে শেষ করায় রাজনীতিতে বিশ্বাস করত মীরজাফর। একদিন সিরাজ জননী আমিনা ও অন্যান্য পুরনারীদের নৌকায় চাপিয়ে বুড়িগঙ্গার মাঝে নৌকা ডুবিয়ে আলিবর্দীর শেষ নিশানাকে নির্মূল করা হয়েছিল মীরণের আদেশে।

কিন্তু গোলকুণ্ডা।

গোলকুণ্ডার নামের ইতিহাস জানি না, স্থানীয় লোক নানা প্রবাদভিত্তিক যা বলে থাকে তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। গোলকুণ্ডার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোলগম্বুজের ঐতিহ্য। বিশ্বে এত বড় গম্বুজ নাকি আর নাই। হয়ত তাই। কিন্তু এর গোটা গঠন প্রণালীতে রয়েছে পাথরের অতি সূক্ষ্ম কাজ। যারা এর নির্মাণ প্রণালীর প্রশংসা করেন, তারা বোধহয় বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী পাণ্ডুয়াতে নির্মিত একলাখী মসজিদ দেখেননি। ছয় ইঞ্চি আর চার ইঞ্চি মাপের ইঁট দিয়ে যে গোল গম্বুজ বাঙ্গালী প্রযুক্তিবিদরা ইলিয়াস শাহী রাজত্ব কালে নির্মাণ করেছেন অবাক হয়ে দেখতে হয় তার নির্মাণ প্রণালী। এই স্মরণীয় মসজিদে পাথরের নাম গন্ধও নেই অথচ কেমন নির্মাণ নৈপুণ্যে ছোটখাটো ইঁটগুলো দিয়ে এমন নিখুঁত বহুকাল স্থায়ী গোলাকার গম্বুজ। এমন দর্শণীয় গম্বুজ কয়েকশত বৎসর আগে যাঁরা তৈরি করেছেন তাঁরা ছিলেন বাঙ্গালী।

নানা মতভেদ আছে এই মসজিদ নিয়ে।

কেউ কেউ বলে থাকে এখানে ছিল রাজা গণেশের একলক্ষ্মী মন্দির। তার পুত্র যদু ইলিয়াস শাহী বংশের রাজকন্যা ফিরোজা বেগমকে বিয়ে করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে জালালুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন এবং এই মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তরিত করেন। এই জনশ্রুতির সমর্থন পাওয়া যায় মসজিদ গাত্রে হিন্দু-দেবদেবীর টেরাকাটার সংযোজন দেখে। সঠিক ইতিহাস রয়েছে অন্ধকারের গর্ভে কিন্তু মসজিদের মধ্যস্থানে রয়েছে প্রেমিক জালালুদ্দিন ও প্রেমিকা ফিরোজা বেগমের পাশাপাশি কবর আর তাদের পায়ের কাছে রয়েছে পরবর্তী সুলতান জালালুদ্দিনের পুত্র শ্যামসুদ্দিনের কবর। পিতা-মাতা ও পুত্র একই স্থানে সমাহিত হয়ে অপেক্ষা করছেন রোজ কিয়ামতের।

কিন্তু গোলকুণ্ডা!

দক্ষিণের প্রবেশ পথের দ্বারী গোলকুণ্ডা আর আহম্মদনগর। হিন্দুদের রাজত্বকালে দেবগিরি ছিল উত্তর-দক্ষিণের মধ্যস্থলে দ্বারী। দেবগিরির পতনের পর মোগলদের রাজত্বকালের আগে দাক্ষিণাত্য বিভক্ত হয়েছিল কয়েকটি মুসলমান রাজ্যে। এরই একটি গোলকুণ্ডা। মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেও গোলকুণ্ডা তার স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। আকবর বাদশাহের আমলে এই রাজ্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সেই অতীতের দিনগুলোকে আজও স্মরণ করিয়ে দেয় গোলকুণ্ডা দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সিঁড়ির পর সিঁড়ি ভেঙ্গে দৃঢ় ভাবে পা ফেলতে ফেলতে থামতে হল।

এখান থেকে দুর্গের ভেতর সংবাদ প্রেরণ করত গোলকুণ্ডার অধিবাসীরা। এখানে অতি মৃদুস্বরে কথা বললেও পৌঁছে যেত দুর্গাধিপতির কাছে।

কথাটা অবিশ্বাস্য নয়। আগ্রা দুর্গের একটা স্তম্ভে আঘাত করলে বাঁয়া তবলার মধুর শব্দ ভেসে ওঠে। আগ্রা দুর্গের মীনাবাজারের প্রবেশ পথের পাশে এই স্তম্ভে বাদশাহ মীনাবাজারে আসার সময় আঘাত করা হত বাদশাহকে স্বাগত জানাতে। গোলকুণ্ডা দুর্গের নির্মাণ চাতুর্যে এমন সংবাদ প্রেরণের ঘটনাটা অসম্ভব কিছু নয়। বর্তমান বিজ্ঞানসম্মত প্রযুক্তির দুর্গ তখন ছিল অকল্পনীয় অথচ তা সম্ভব করেছিল তৎকালের স্থপতিরা। সহজে এর ব্যাখ্যা করা যায় না।

গোলকুণ্ডা হীরের রাজ্য।

বিশ্ববিখ্যাত কোহিনুরের জন্ম এখানেই।

হীরাময় স্বপ্নরাজ্যের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা।

নতুনদি আমাকে ডেকে বলল, ওদিকে দেখ ভাই!

পাহাড়ের নিচে দু'পাশে ছড়িয়ে আছে কত অবহেলিত মনুষ্যরূপী হীরের টুকরো। আগে ভাবতাম কলকাতার ফুটপাতে যারা পড়ে থাকে তাদের কোন মর্যাদা নেই, এখানে দু'পাশের ঝুপড়িতে যারা বাস করছে, তাদেরও মর্যাদা দেবার কেউ নেই।

পাথর খুঁড়ে যারা হীরের সন্ধান করে তাদের বাঁচতে হয় এই রকম অবহেলায়। পাথরের হীরের লোভে মানুষ সমাজের এইসব হীরে কেমন অবহেলায় ছড়িয়ে আছে দু'পাশে, ধুকছে এক টুকরো শুকনো রুটির আশায়। এক সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিল পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনী। তাদের ধনের জোগানদার ছিল যারা তাদের কি অবস্থা ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায় এই সব অবহেলিত ঝুপড়িবাসীদের দেখে। এরা হীরে নয় অবহেলিত পাথর।

ধীরে ধীরে নেমে এলাম সামনের পিচের রাস্তায়।

বললাম, বিশ্বকবি বলেছেন, কালের করাল স্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান। বিশ্বকবি উপনিষদের যে শাশ্বতবাণী শুনিয়ে গেছেন তা ভারতের কোণায় কোণায়, শহরে গ্রামে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। নিজামশাহী আর নেই। তার রাজাকার বাহিনী এখন কলঙ্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, বাহমনী রাজ্য ধ্বংস স্তূপে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আজ ধূলিলুণ্ঠিত। কিন্তু সেদিনও যারা মেহনত করে উদরান্নের সংস্থান করেছিল আজও তাদেরই উত্তর-পুরুষ মেহনত করছে, অবহেলায় ও গোবনে ওইসব ঝুপড়িতে বাস করে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে দিন গুজরান করছে। গণতন্ত্রের গণ আজও নিষ্পেষিত।

তোমার মানুষ দেখার, মানুষ খোঁজাটা কি ব্যর্থ হবে ভাই?

না। পঙ্কেই পদ্ম জন্মায়। এদের পঙ্কিল জীবনের মাঝে যে প্রাণের-স্পন্দন তাতেই খুঁজে পাব মানুষকে। যদি মানুষের নিতান্তই অভাব হত তাহলে কেরলের সাধারণ গৃহী আমাদের সমাদর জানাত কি? প্রথম

জীবনে সেই যে রায়গড় আর সিংহগড়ের গ্রাম্যবধূদের আপ্যায়ন পেয়েছিলাম তা কি পেলাম। আরও খুঁজতে হবে নতুনদি। অসংখ্য হীরে ছড়িয়ে আছে, খুঁজে বের করতে হবে।

সেকেন্দ্রাবাদ থেকে ট্রেনের যাত্রী আমরা।

বাস রয়ে গেল পেছনে।

আমরা মাত্র পাঁচজন দলবদ্ধ হয়ে এসে নামলাম জালগাঁও স্টেশনে। সবে-মাত্র সকালের আলো ফুটেছে এমন সময় সবাই হুরমুর করে নেমে পড়লাম। অওরঙ্গাবাদের গাইড বলেছিল, অজন্তা যেতে হলে জালগাঁও হয়ে যাবেন, সেখান থেকে অজন্তার বাস ছাড়ে। সকাল সকাল পৌঁছে যাবেন। বিকেলেই ফিরে আসতে পারবেন জালগাঁওতে। যদি রাত কাটাতে চান অজন্তায় তা হলে সরকারী পান্থশালা আছে। অল্পব্যয়ে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে ফিরতি বাস পাবেন।

অল্পবয়স্ক এই সরকারী গাইড সব কিছু আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন তিনটি ভাষায়। হিন্দী, ইংরেজি আর মারাঠি ভাষায় নির্ভুল উচ্চারণে। আমাদের মনোরঞ্জন করতে মোটেই ত্রুটি করেননি। তবে দ্রষ্টব্য স্থানের সামনে নেমে আমাদের দেখা শেষ করার সময়ও মেপে দিচ্ছিলেন।

ইলোরা স্বপ্নের রাজ্যের অধিশ্বরী হয়ে আমাদের চুম্বকের মত টেনেছিল তার চেয়ে বেশি আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল অজন্তা।

সত্যি সত্যি ভারতবর্ষ দেখা অসম্পূর্ণ থাকে যদি অজন্তা ইলোরা দেখা না হয়।

জালগাঁতেও ধর্মশালা।

অওরঙ্গাবাদের ধর্মশালার চেয়েও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন আর ছিল প্রচুর জলের ব্যবস্থা। সবাই মিলে পরিতৃপ্তি সহকারে স্নান করলাম, আর নির্মলবাবু গেলেন সরকারী বাসে অজন্তা যাবার টিকিট কাটতে।

অনেকদিন স্নানের আনন্দ থেকে বঞ্চিত। নদীতে নয়, কলের জলে পরিতৃপ্তি সহকারে স্নান শেষ করতে না করতেই নির্মলবাবু ফিরে এসে বললেন, আর বিশ মিনিটের মধ্যে গাড়ি ছাড়বে। Be ready, আমরা সবাই প্রস্তুত। নির্মলবাবু বললেন, বিশ মিনিট। তোমরা এগিয়ে যাও, আমি আসছি। আমরা বাস স্ট্যান্ড পৌঁছে শুধু পেছনে দেখছি। নির্মলবাবু অল্পক্ষণের মধ্যে স্নান করে ভেজা কাপড় নিয়ে ঠিক সময় মতই পৌঁছলেন।

গাড়ি ঠিক সময় মত চলল গন্তব্যস্থানের দিকে।

গাড়ি চলতে শুরু করতেই বললাম, একটা ঘটনা মনে পড়ছে নতুনদি।

নতুনদি মুখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন, কোন ঘটনা।

মণিপুর গিয়েছিলাম। মণিপুরে যাবার বিশদ কথা পরেও বলেছিলাম।

বভ্রুবাহনের দেশ।

মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা এই দেশের রাজকন্যা। বিয়ে করেছিল তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনকে। বব্রুবাহন এদের সন্তান।

ইম্ফলের শর্মাজির হোটেলে ছিলাম।

বিকেলবেলায় হোটেলে ফিরে এসে শর্মাজির সঙ্গে বসে গল্প করতাম। গল্পগুলো মণিপুরের অতীত ও বর্তমান নিয়ে।

শর্মাজি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব মতাবলম্বী।

মণিপুরের রাজারা বৈষ্ণব ধর্মে বিশ্বাসী। রাজগৃহের পাশেই গোবিন্দ-মন্দির। শর্মাজি সকালবেলায় রাজবাড়ির সংলগ্ন দীঘিতে স্নানের পর গোবিন্দ-দর্শন করে আসেন। অন্য সময় তাকে কোন ধর্মকর্ম করতে দেখিনি। গোবিন্দ মন্দির থেকে এসে কপালে তিলক দিতে ভুল করেন না।

একদিন বললাম, মহাভারতে মণিপুরের উল্লেখ আছে।

শর্মাজি হেসে বললেন, জানি। মণিপুরী ভাষায় মহাভারতের অনুবাদ আমরা পড়ি। কিন্তু রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার কথা মণিপুরের ইতিহাসে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। মণিপুর জনজাতি অধ্যুষিত দেশ, আর্যসভ্যতার সঙ্গে পরিচয় বহু পরে ঘটেছে। মহাভারত রচনার অনেক পরের কথা। আমার মনে হয় আর্য সভ্যতার প্রভাব ও প্রাধান্য বিস্তার করতে মহাভারতে চিত্রাঙ্গদার কাহিনী জুড়ে দিয়েছে। হয়ত মূল মহাভারতে এ ঘটনা ছিল না।

বললাম, আপনারা চিত্রাঙ্গদা বব্রুবাহনের কাহিনীকে স্বীকার করেন না।

ওটা বিতর্কিত বিষয়। হিন্দু ধর্ম মণিপুরের মেইতি সম্প্রদায়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। হিন্দু কালচার ও সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশীদার মণিপুরের অধিবাসী। আমরা যারা এখানে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ভুক্ত তারা কোন সময় বাংলাদেশ থেকে শিলচরের পাহাড় পেরিয়ে এখানে এসেছিলাম, সঙ্গে এনেছিলাম বাংলা হরফ আর বৈষ্ণবধর্ম। মণিপুরের রাজারা বৈষ্ণব। মণিপুরের রাজকার্যে বহু বাঙ্গালী নিযুক্ত ছিল, কালক্রমে সবই মণিপুরের ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিয়েছে। মণিপুর হল স্ত্রী স্বাধীনতার দেশ। বলা যায় কিছুটা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এখানে আছে। হাটে বাজারে সর্বত্র দেখবেন মণিপুরী মেয়েরা যেমন কর্মরত তেমনি চাষের ক্ষেত্রে বয়নশিল্প প্রভৃতিতে মণিপুরের মেয়েরা এগিয়ে থাকে সর্বদা। আমাদের এই রাজ্যে মেয়েদের বিয়েতে সব চেয়ে বড় যোগ্যতা হল কন্যার তাঁত বুনতে জানা।

কিছুক্ষণ থেমে শর্মাজি আবার বললেন, মণিপুরের মেয়েরাই মণিপুরকে সতেজ রেখেছে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন উখরুল পৌঁছে গেল তখন বৃটিশ সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনী যাতে খাবার না পায় সেজন্য মণিপুর থেকে চাল পাচার করছিল বাইরে। মণিপুরের মানুষ কি খাবে সে চিন্তা করেনি ইংরেজ সরকার। মণিপুরের ঘরে ঘরে মায়েরা মাথায় হাত দিয়ে বসল সন্তানের খাবার সংগ্রহ করতে না পেরে।

তারপর বিদ্রোহ করল মণিপুরের মেয়েরা। এই বিদ্রোহকে বলা হয়

'নূপী লাল' অর্থাৎ মহিলাদের বিদ্রোহ। খাদ্যের গুদাম ঘেরাও করল মেয়েরা। মণিপুর রাজার আত্মীয় ও মন্ত্রী ঐরাবত সিংহ এসে যোগ দিলেন ও নেতৃত্ব দিলেন এই নারী বিদ্রোহে। ইংরেজ সরকার মাল পাচার করতে পারল না। যত রোষ গিয়ে পড়ল ঐরাবত সিংহের ওপর। ঐরাবত দেশ ছেড়ে আশ্রয় নিল বর্মার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায়। দেশ স্বাধীন হবার পরও ঐরাবতকে সম্মান দেখায়নি কেউ। ঐরাবত কম্যুনিস্ট। তাই ঐরাবতের ভারতে ফিরে আসার পথ রুদ্ধ হয়েছিল চিরকালের জন্য। শোনা যায় ঐরাবত দেহত্যাগ করেছেন বর্মায় কোন এক অখ্যাত স্থানে।

শর্মাজি অনেকক্ষণ এক নাগারে কথা বলে থামলেন।

আমি কথা বলার সুযোগ খুঁজছিলাম। হঠাৎ শর্মাজি বললেন, মণিপুরে এসেছেন মণিপুরের কালচারের সঙ্গে পরিচয় করে যান। আজ স্থানীয় থিয়েটার হলে রাসনৃত্য ও নাগানৃত্য হবে। দু'টাকা মাত্র টিকিটের দাম। যাবেন?

বললাম, আজ বড়ই শীত।

মণিপুরে শীত বেশি। তাতে কি? গরম কাপড় জামা জড়িয়ে বসবেন।

তা হলে এই নিন টাকা, দু'খানা টিকিট সংগ্রহ করার দায়িত্ব আপনার। কটায় আরম্ভ।

আটটায়।

অনেক রাতে অনুষ্ঠান শেষে শীতে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে পৌঁছে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম। শর্মাজি কয়েকবার খাবার কথা বলে ফিরে গেলেন। লেপ কম্বল জড়িয়েও শীত কাটছিল না। এপাশ ওপাশ করে রাত কাটল। কোন দুশ্চিন্তা ছিল না, চেষ্টা ছিল শীতকে জয় করার। সকালবেলায় হাত পা প্রায় জমে থাকার জোগাড়। হোটেলের চাকর এসে গরম চা সামনে রেখে বলে গেল চা খেয়ে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে।

বেশ রোদ উঠেছে।

রাতের কাঁপুনি সকালের মিঠে রোদে অনেকটা কেটে গেছে।

শর্মাজি বললেন, চলুন বেরিয়ে আসি।

বললাম, আরেক কাপ চা।

সঙ্গে সঙ্গে চায়ের ব্যবস্থা হল। বের হলাম দুজনে।

হাঁটতে হাঁটতে ইম্ফল নদীর ধার ধরে ধীরে এগোতে এগোতে শর্মাজি বললেন, আর যাব না।

কেন?

সামনে শ্মশান। সহ্য করতে পারবেন না।

খুব পারব। কিন্তু ওকি! নদীর কিনারায় চাঁদোয়া টাঙ্গানো কেন?

অভিজাত পরিবারের শবদেহ দাহ করা হয় চাঁদোয়া খাটিয়ে। কোন রাজ-পরিবারের লোক বোধহয় মারা গেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, অভিজাত ভিন্ন আর কারও জন্য চাঁদোয়া টাঙ্গানো হয় না।

হয়। আর্থিক সঙ্গতির ওপর নির্ভর করে।

চাঁদোয়া কেন টাঙ্গানো হয়?

জানি না, এটা tradition পুরাতন রীতি। এখনও কেউ কেউ মেনে চলে।

নতুনদিদি মণিপুরী প্রথা শুনে আশ্চর্য হলেন না। বললেন, প্রিয়জন হারাবার ব্যথার সঙ্গে ভালবাসার পাত্রকে অসম্মান করতে চায় না মানুষ। মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গে রাজা ও রাজপরিবারের সম্মানীয় ব্যক্তিদের কবরে মৃতের সম্মানে আহার্য, বস্ত্র এবং অলঙ্কার দেওয়া হত। ভালবাসা এমন একটি অনুভূতি যা পার্থিব লেন-দেন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

আমি মাথা নিচু করে নতুনদির কথা ভাবতে ভাবতে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল।

হিমালয়ের পায়ের তলায় ঘন বনানী। এই বনানীর কিছু অংশ ধ্বংস করে ইংরেজ বণিকরা হাজার হাজার হেক্টর জমিতে চায়ের চাষ করে আসছে চা আবিষ্কার হবার সময় থেকেই। জলপাইগুড়ির এই চা গোটা দেশে ডুয়ার্স চা নামে খ্যাত, এই খ্যাতির সঙ্গে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছিল ইংরেজ বণিকরা। এই রকম কয়েকটি চা বাগানের পাহারাদার একটি থানা, আর সরকারী রাজস্ব আদায়ের জন্য ছিল তহশীল অফিস।

কোন এক সময়ে এই থানার হেপাজতে ছিল এক তরুণ, পুলিশের খাতায় ছোটখাট বিপ্লবী বলে উল্লেখ ছিল।

জঙ্গলের দেশের এই থানার জনসংখ্যা আট-দশজন। একজন সাব-ইনস-পেক্টার। উনিই হতেন অফিসার ইন্‌চার্জ, একজন সহকারী সাব-ইনসপেক্টার। তৎকালে এদের বলা হত দারোগা আর জমাদার। আর ছিল একজন হাবিলদার ও ছয়জন সিপাহী। থানার চৌহদ্দি ছিল বিরাট। ইংরেজ এই সামান্য পুলিশের ভরসায় থানা প্রশাসন কায়েম রেখেছিল। অস্ত্রশস্ত্র বলতে ছয়টি মাস্কেট, আর দারোগা ও জমাদারের কাছে দুটো পিস্তল। তবে বনদেশে অস্ত্রের অভাব ছিল না। পাশেই রেনজ্‌ অফিস, বনবিভাগের সাব ডিফিস্যানাল অফিস, সেখানেও ছিল অনেকের ব্যক্তিগত বন্দুক আর ফরেস্ট গার্ডেদের ছিল মাথা পিছু একটি করে এক নলা বন্দুক আর চারটি বাক্‌শট্‌ গুলি। অর্থাৎ অস্ত্রের অভাব ছিল না সেখানে।

তরুণ রাজবন্দীর দায়দায়িত্ব ছিল দারোগা আর জমাদারের। থানার পাশে একটি ঘরে থাকত তরুণ রাজবন্দী। তার খাবারের ব্যবস্থা ছিল সিপাহীদের কিচেনে। দিন যেমন কাটে, তেমনি কাটছিল। নতুনত্ব নেই, উত্তেজনা নেই, সবাই কেমন মিইয়ে থাকত।

তরুণ সারাদিন তাকিয়ে থাকত বনের দিকে, মাঝে মাঝে রবারের বল নিয়ে থানার মাঠে একাই ছুটোছুটি করত। যখন ক্লান্তি অনুভব করত তখন বিছানায় শুয়ে পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বসত। কঠিন শাসনে তাকে থাকতে হত। জন-

সাধারণের সঙ্গে মেলামেশা দূরের কথা বলারও সুযোগ তাকে দেওয়া হত না। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া তাকে শয্যাশায়ী করলে সরকারী খরচে কুইনাইন জোগান দিত।

দারোগা কাজি নূরুদ্দিনের ছিল শিবাজীর মত দাড়ি। সরকারী ব্যয়ে পোষা হত টাট্টু ঘোড়া। কাজিসাহেব যখন ঘোড়ায় চেপে তদন্তে যেতেন তখন তাকে শিবাজী বলে ভ্রম করলে বিশেষ দোষের হত না। কাজির মেজাজটা ছিল মোগল দরবারের আমীরের মত।

কাজিসাহেবের পাঁচ বছরের মেয়ে দিলরুবা যখন থানার মাঠে ঘুরে বেড়াত সেই সময় সেই বন্দী তরুণ যেন একজন সঙ্গী পেত। শিশুর সঙ্গে খেলা করে তার বন্দীজীবনের অনেক গ্লানি মোচন হত। কথা বলার সেই ছিল একমাত্র সঙ্গী।

বর্ষার প্রথম।

কদিন এক নাগাড়ে বৃষ্টি হবার পর সকালে বৃষ্টি থেমেছে।

দিলরুবা এসেছিল বন্দীর ঘরে। এসে দেখল বন্দী শুয়ে আছে। দিলরুবা ঘরে ঢুকে অনেক ডাকাডাকি করে বন্দীর হুঁস ফিরিয়ে এনে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি হয়েছে। খেলবে না বন্ধু?

বন্দী একবার দিলরুবার দিকে তাকিয়ে শুকনো হাসিতে মুখ ভরিয়ে বলল, আমার খুব জ্বর। আজ খেলতে পারব না বন্ধু।

দিলরুবা ফিরে গিয়ে তার মাকে বলল, আজ খেলা হবে না আম্মা। বন্ধুর খুব জ্বর। শুয়ে আছে। ডাকলেও উঠল না।

প্রবল জ্বরে বেহুঁস হয়ে শুয়েছিল বন্দী।

কিছু কিছু হুঁস যখন ফিরেছিল তখন অনেক রাত। বন্দীর মনে হল কে যেন তার মাথার কাছে বসে তালপাখা দিয়ে বাতাস করছে আর তার কপালে জলের পট্টি।

বন্দী চোখ মেলে দেখল। লণ্ঠনের মৃদু আলোতে দেখতে পেল একজন সেবাপরায়ণা মহিলাকে। বন্দী নিজের মনে বলে উঠল, মা।

মহিলাটি বন্দীর বুকে হাত রেখে দেহের তাপ অনুভব করতে করতে বলল, এখন কেমন বোধ করছ খোকন?

খোকন!

ঠিক এই নামেই তার মা তাকে ডাকতেন। সে তো অনেকদিন আগের কথা। মা মারা গেছেন যখন বন্দীর বয়স ছিল দশ বৎসর। সে সময়ই মা তাকে আদর করতেন খোকন সোনা বলে। বন্দী অসারে আবার ডাকল, মা।

এই যে আমি, বলে মহিলাটি তার মাথাটা কোলে তুলে নিলেন।

বন্দীর চোখের পাতা ভিজে উঠল, টস্ টস্ করে জল পড়তে থাকে গাল বেয়ে।

কেঁদ না খোকন। আমি বাগানের ডাক্তারকে ডেকে পাঠিয়েছি। শীগ্‌গীরই

এসে যাবেন। তোমার কোন ভয়ের কারণ নেই।

বন্দীর মনে হল মূর্তিমতী করুণা মায়ের রূপ নিয়ে তার মাথা কোলে তুলে নিয়েছেন।

কাজি নুরুদ্দিনের বিবি সালেহা খাতুন এই মহিলা। দিলরুবার কাছে শুনতে পেয়ে সবার নিষেধ সত্ত্বেও এবং পর্দার বাধা অগ্রাহ্য করে সিপাহীদের চামেরিতে বন্দীকে দেখতে এসেছিলেন সালেহাবিবি। বন্দীর মুখে 'মা' ডাক শুনে তার হৃদয়ে যে মূর্ছনা সৃষ্টি করেছিল তার তুল্য মূর্ছনা পৃথিবীতে আর কিছু আছে বলে মনে হল না বিবিসাহেবার।

পরদিনই মশারি এল বন্দীর জন্য।

পথ্য এল কাজিসাহেবের গৃহ থেকে। সেই পথ্য দিয়ে যেতেন সালেহা বিবি। সকালে বিকালে ওষুধ পথ্য খাওয়াতেন নিয়ম বেঁধে। বসে বসে গল্প করতেন বন্দীর সঙ্গে।

সালেহা বিবি বলেছিলেন তাঁরা হুগলি জেলার লোক। তার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন তাদের বিয়ে হয়েছিল। বি-এ পরীক্ষা দিয়েই দারোগার চাকরি পেয়ে গেলেন সর্দায় ট্রেনিং-এ। সে সময় দিলরুবা ছিল তার পেটে। দিলরুবার জন্মের পর দু-তিনটে থানা ঘুরে কাজিসাহেবকে এই দুর্গম অঞ্চলে বদলি করা হয়েছিল শাস্তি দেবার জন্য।

পুলিশসাহেব এসেছিলেন ইন্সপেকশনে।

দারোগার কাছে আগেই সাহেবের খাবারের তালিকা এসেছিল। সেই তালিকায় ছিল ডাক্ মানে হাঁসের মাংসের রোস্ট। সব কিছু সংগ্রহ করার কথা স্মরণ ছিল না কাজিসাহেবের। খেতে বসে ইংরেজ পুলিশসাহেব রেগে আগুন। সেই আগুনের তাপ সহ্য করতে ভুটানের নিচে এই অস্বাস্থ্যকর এলাকায় কাজিসাহেবকে পাঠিয়েছে সরকার।

বন্দী সুস্থ হতেই সালেহা বিবি বলেছিলেন, আমরা মুসলমান. তোমার খাবার যদি আমি পাঠাই তাতে কোন আপত্তি আছে কি।

মোটেই না। আপনি মা, মায়ের কোন জাত নেই দুনিয়াতে।

সালেহার স্নেহ যত্নে বন্দী জীবনের কষ্টলাঘব হয়েছিল ঠিকই তার চেয়ে লাভ হয়েছিল অনেক বেশি, মাতৃহারা বন্দী পেয়েছিল একটি নিখাদ মা। আর সালেহাবিবি পেয়েছিলেন প্রাণপ্রিয় পুত্রকে।

এরপর আরও বাইশ বছর কেটে গেছে।

দেশ বিভাগ সম্পূর্ণ।

মুসলমান সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সবাই চলে গেছে পাকিস্তানে, আবার পাকিস্তানের অমুসলমান কর্মচারীরা এসে গেছে ভারতে। দাঙ্গা হাঙ্গামা মিটে শান্তির পরিবেশ বিরাজ করছে সর্বত্র। সবাই রক্তপাতের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোর কথা প্রায় ভুলেই গেছে। এমন একদিনে সেই বন্দী গিয়েছিল পশ্চিম বাংলার প্রত্যন্ত একটি মহকুমা শহরে।

এখানে এসে বন্দী জানতে পেরেছিল এখানকার পুলিশের ডেপুটি সুপার একজন মুসলমান, নাম তার কাজি নুরুদ্দিন। নামটা শুনেই চমকে উঠলেন প্রাক্তন বন্দী। মনে সন্দেহ, ইনিই কি সেই কাজিসাহেব।

হাঁটি হাঁটি পা-পা করে ডেপুটি সুপারের বাংলোর দরজায় হাজির হলাম যাচাই করতে।

সাহেবের আর্দালিকে আগে সেলাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, সাহেব আছেন কি!

সাহেব গোসলখানায়, বসতে হবে।

মেমসাহেব আছেন কি!

আছে।

আমার এই স্লিপটা তাঁকে দিলে উপকার হত।

কাগজে লেখা ছিল, খোকন।

বিদ্যুৎগতিতে কাজ সম্পন্ন হয়েছিল। স্লিপ পেয়ে আলুথালি বেশে ছুটে এসেছিলেন সালেহাবিবি। ছুটে এসে আমাকে জাপটে ধরে বলল, খোকন সোনা। কোন রকমে হাত ছাড়িয়ে তার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বন্দী বলল, মা।

তারপর কত কথা।

কথার আর শেষ নেই।

সবাই যখন পাকিস্তানে গেল তখন মিঞাকে বললাম, আমরা যাব না। এটাই আমাদের দেশ, এর মাটিতে শুয়ে আছে আমাদের বুজরুগ।

হারানো মাকে ফিরে পেয়ে বন্দী খোকন সোনা আত্মহারা। সালেহাবিবিও হারানো ছেলে পেয়ে স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করছিলেন।

সালেহা বললেন আগামী মাসের বাইশ তারিখে কাজিসাহেব অবসর নেবেন।

কোথায় যাবেন অবসর নিয়ে।

ফুরফুরার পীরের দরগায় মানত মিটিয়ে নিজেদের গ্রামে যাব। ধনেখালি থানায় কাজিদের আদি বাস। সেখানেই শেষ জীবন কাটাব। একমাত্র বাঁধন আমার মেয়ে দিলরুবা। তার বিয়ে দিয়েছিলাম সার্কেল অফিসারের সঙ্গে, সে তার স্বামীর সঙ্গে পাকিস্তান চলে গেছে। আছে নোয়াখালিতে। মাঝে মাঝে চিঠি পাই। ভাল আছে জানতে পারলেই খুশি। তবে বড়ই নিঃসঙ্গ বোধ করছি। এরপর নসীবে কি আছে তা আল্লায় জানে।

কাহিনী শেষ হতেই নতুনদিদি বললেন, তা হলে মানুষের সন্ধান তুমি পেয়েছে।

আমি হাসলাম।

পৃথিবীটা হল ভালমন্দের সংমিশ্রণ। মন্দ না থাকলে ভালর মহিমা জানা যেত না ভাই। সারবস্তুটি খুঁজে নিতে পারলে মানুষকে পেতেও দেরি হয় না।

বাস এসে দাঁড়াল অজন্তার গেস্ট হাউসের পাশে।

কোথাও সমতল, কোথাও পাহাড়, কোথাও ছোট নদী, কোথাও উন্মুক্ত প্রান্তর, কোথাও মাঠে রাখাল বালক গোমহিষ চরিয়ে বেড়াচ্ছে, কোথাও পথের ধারে বড় বড় গাছ, কোথাও ঝোপঝাড়। সারা পথই প্রকৃতি নানা সম্পদ দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে আর মনোরঞ্জন ঘটাচ্ছে পথিকদের। মারাঠা দেশের পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সঙ্গে মারাঠা দেশের মধ্য ভারতীয় অংশের প্রাকৃতিক পরিবেশের অনেক অদলবাদল ঘটেছে। সেটাই আনন্দদায়ক।

মাটির রং কালো। চিনাবাদামের ক্ষেত।

বর্ষায় এই রুক্ষ দেশটা শস্যশ্যামল হয়। জোয়ার-বাজরা এদেশের সাধারণ মানুষের প্রধান খাদ্য, তাই জোয়ার বাজরার চাষ বেশি। পশ্চিমঘাটে আখের চাষ যেমন হয় মধ্যভারতের মালভূমিতে তুলার চাষও হয়। পাথুরে জমিতে কঠিন মেহনত করে মারাঠা দেশের মেয়ে পুরুষ। মারাঠা মেয়েরা পর্দানশীন নয়, তারা যে বীরাঙ্গনা তা তাদের প্রতিটি কাজের মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দেয়।

এতটা পথ চলা বিরক্তিকর হলেও আমাদের কাছে মোটেই বিরক্তিকর মনে হয়নি। আমাদের সকলের চোখে ছিল জানার আকাঙ্ক্ষা, তাই যতই দেখছি, যতই চলছি ততই চলার আনন্দ উপভোগ করছি। যেটুকু অবসাদ ঘটার সম্ভাবনা ছিল তা পূর্ণ করলাম জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী আলোচনা করে। নতুনদিদি ছিলেন শ্রোতা হিসাবে প্রথম শ্রেণীর। প্রতিবাদ করেন না। মাঝে মাঝে সমালোচনা ও টিকাটিপ্পনি জুড়ে দেন কথা বিষয়গুলো আরও মনোজ্ঞ করতে।

পথ চলতে সব চেয়ে বেশি লাভবান হয়েছি মা-বোন পেয়ে।

এই মা-বোন স্বার্থহীন ভাবে আমাকে যে ভাবে আপন করে নিয়েছে তা বিস্মৃত হতে পারিনি আজও, আবার মেয়েদের কাছ থেকে অনাদর ও ঘৃণালাভও করেছি সীমাহীন। ভালমন্দ নিয়ে এই পৃথিবীতে আমি নিজেও তো ভাল নই, তাই মন্দের সান্নিধ্যলাভ করতে অসুবিধা হয়নি।

কলকাতা শহরের মত মাদ্রাজ শহরের ফুটপাতেও বহু নরনারীকে সংসার পেতে বসতে দেখেছি তবে বিশেষ বিশেষ এলাকায় ফুটপাতবাসীর ভিড়, কলকাতার মত সর্বত্র নয়। বাঙ্গালোর, মহীশূর, তিরুবন্তপুরমেও এদের দেখা গেছে কিন্তু সংখ্যায় কম। বরং এদের তুলনায় পুরাতন দিল্লিতে এদের সংখ্যা অনেক অনেক বেশি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বাংলার সমাজ জীবনে যে ভাঙ্গন ধরেছিল তারই চরম ব্যবস্থা আজ বাংলার মানুষ হাড়ে হাড়ে অনুভব করছে। ভেঙ্গে গেছে সমাজ ব্যবস্থা, পারিবারিক জীবন। অর্থনৈতিক বৈষম্য, কঠিন দারিদ্র, বেকারত্ব বাংলার মানুষকে কোথায় নিয়ে চলেছে তা আজকের প্রশাসকরা জেনেও অজ্ঞতার

ভান করছে।

মানুষ কখনও মরেনা। মনুষ্যত্বকে যারা কণ্ঠরোধ করে, হত্যা করে তারা প্রস্তুত থাকে এর বদলা পেতে। আজ যারা মনুষ্যত্বহীন উপরতলার মানুষের অনাচারের শিকার, তাদের উত্তরপুরুষ আরেকদল মানুষ গজিয়ে উঠবে অনাচারের প্রতিবিধান করতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই সব ভাবছিলাম।

ঝণ্টু আমার হাত ধরে বলল, মামা, টিকিট কাটা হয়ে গেছে। চলুন।

কিসের টিকিট।

অজন্তার গুহা দেখতে হলে টিকিট কাটতে হয় তা বুঝি জান না? বাবা আরও পাঁচটাকা জমা দিয়েছে লাইটের জন্য।

লাইট!

হাঁ। গুহাগুলো অন্ধকার। সরকার থেকে ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা রেখেছে। পাঁচটাকা দিলেই সরকারী লোক আলো জেবলে সব দেখিয়ে দেবে।

যেতে যেতে বললাম, ইলোরার হিন্দু স্থাপত্য দেখেছি। বই কেতাবে পড়েছি অজন্তার সব কিছু বৌদ্ধযুগের। চলুন নতুনদি, বৌদ্ধযুগকে ভাল করে দেখে আসি।

অর্ধচন্দ্রকার পাহাড়ের বিরাট অংশের মাঝে মাঝে গুহাকেটে বৌদ্ধযুগের চিত্রাবলী আঁকা আছে এই সব গুহায়, কোথাও আছে প্রস্তর মূর্তি, আবার বাইরেও আছে চৈত্য।

প্রথম গুহায় প্রবেশ করে ভয় পেয়ে গেলাম।

অন্ধকার। গভীর অন্ধকার। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না।

হঠাৎ জ্বলে উঠল ফ্লাস লাইট।

বিস্মিতভাবে সামনে পেছনে দু' দিকে দেখছি?

ভাবছিলাম আহা কি দেখিলাম!!

মনে হল খৃষ্ট পূর্ব আড়াই হাজার বছর আগে আমি যেন জন্ম নিয়েছি কপিলাবস্তুর কোন পর্ণকুটিরে। লুম্বিনিতে যে মহাপুরুষ জন্মেছিলেন তাঁর পদধূলি মাথায় নিয়ে আমি যেন ধন্য হয়েছি।

জাতক কাহিনী, বুদ্ধের জীবন কাহিনী সবকিছু নানারঙে আঁকা আছে গুহার অভ্যন্তরে। লাইটম্যান ফ্লাস লাইট জ্বালতেই সব কিছু স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বুদ্ধের সন্ন্যাস গ্রহণ, সুজতার আকুল আবেদন, মায়াদেবীর সন্তান সহ মহানিদ্রা, সবই আছে মহানির্বাণকাল পর্যন্ত।

কতশত শিল্পী পাহাড় কেটে এই গুহায় প্রবেশ করে কত বৎসরের অক্লান্ত পরিশ্রমে গুহাগাত্র অঙ্কিত করেছিলেন বুদ্ধের জীবনকাহিনী নিয়ে তার সাক্ষ্য প্রমাণ আজ কোন ইতিহাসেই পাওয়া যায় না। খৃষ্টাব্দ পাঁচ অথবা চারে যখন বৌদ্ধধর্ম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল সে সময় রাষ্ট্রকূট বংশীয় রাজারা এই গুহায় বুদ্ধের জীবন কাহিনীকে স্থায়ীরূপ দিতে কতশত শিল্পীকে নিযুক্ত

করেছিলেন। সেকালে এই অন্ধকার গুহায় প্রদীপের আলোতে এই চিত্র অঙ্কন! বিচিত্র নানা রঙের সমাহার যারা করেছিলেন তাঁরা চির নমস্য জন।

অর্ধচন্দ্রাকার এই পাহাড় এমনভাবে ঘন বনাচ্ছাদিত দিন কয়েকশতাব্দী ধরে, এমনভাবে আত্মগোপন করেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে যার পরিচয় আবিষ্কার করেছিল ইংরেজ শিকারীর দল। যদি কোন সময় আলাউদ্দিন অথবা অন্য কোন লুটেরার দৃষ্টি পড়ত এই বনাঞ্চলের পাহাড়ে তা হলে ভারতের এই অমূল্য সম্পদ রক্ষা পেত কিনা সন্দেহ। লোকালয় থেকে বহুদূরে একদল ইংরেজ শিকারী ঘুরতে ঘুরতে এই পাহাড়ে এসে বিশ্রাম লাভের আশায় গুহায় প্রবেশ করে পেল এই অমূল্য সম্পদের হদিস। তারা দেখেছিল গ্রামের কিছু রাখাল গরু চরাতে এসে এই গুহায় বিশ্রাম করছে এবং গুহা মুখে বসে দ্বিপ্রাহরিক জোয়ারের রুটি খাচ্ছে।

শিকারীরা গুহায় প্রবেশ করতে গেলে রাখালরা বাধা দেয়।

যেও না সাহেব, এই গুহায় চিতা বাঘ আর সাপের খুবই উৎপাত। তোমাদের প্রাণ যাবে।

জেদী ইংরেজ শিকারিরা মশাল জেলে ভেতরে ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। তারাও বোধহয় বুদ্ধের জীবনীর জীবন্ত আলেখ্য দেখে আড়াই হাজার বছর পেছনে চলে গিয়েছিল। তাদের রিপোর্টের ওপর ভারত সরকার এই অজন্তা পাহাড় এলাকাকে সংরক্ষিত এলাকা বলে ঘোষণা করে। রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয় ভারত সরকার।

কিন্তু এই গুহাই তো সব নয়।

পরস্পর অনেকগুলো গুহা।

একটার পর একটা দেখছি আর থমকে দাঁড়াচ্ছি।

গুহা ছেড়ে বাইরে আসার ইচ্ছা যেন লোপ পেতে থাকে।

নির্মলবাবু বার বার তাগাদা দিচ্ছেন। ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নামতে হবে।

কিন্তু চৈত্যগুলো না দেখে ফিরে যাবার কোন বাসনাই আমার ছিল না। নতুনদিকে বললাম, সব না দেখে যাব না নতুনদি। আপনারা যদি ফিরতে চান তাতে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমি সব দেখব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। দরকার হলে পান্থশালায় একরাত বাস করে কাল ফিরব।

নতুনদি আমার ইচ্ছাপূর্ণ করতে অনাগ্রহী ছিলেন না।

বললাম, বিস্ময়কর বস্তু হল যারা এই গুহা দেখতে আসেন তারা বনাকীর্ণ পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে কল্পনাও করতে পারেন না, এই পাহাড়ের অভ্যন্তরে কয়েক হাজার বর্গ গজ স্থানে বৌদ্ধধর্মের সারবস্তু অঙ্কিত আছে, আর এই পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো পিলারের ওপর। স্থপতিরা পাহাড় কেটেছেন, পাহাড় যাতে ধসে না পড়ে তার জন্য জ্যামিতিক সার্ভে করে নির্দিষ্ট দূরত্বে একটার পর একটা পিলার রেখেছিলেন। গর্ভগৃহে এবং ছড়িয়ে ছিটিয়ে

যে সব বুদ্ধমূর্তি, জাতক-কাহিনীর-মূর্তি খোদাই করা আছে তাও ওই পাহাড়ের পাথর থেকে খোদাই করা হয়েছে। এই গর্ভগৃহে বুদ্ধের প্রশান্ত মূর্তির সামনে আমরা সবাই হাতজোড় দাঁড়িয়ে সম্মান জানাতে মোটেই ত্রুটি করিনি। আনন্দের আতিশয্যে নতুনদিদি কেঁদেই ফেললেন। চোখ মুছে আমাকে বললেন, সবটাই দেখতে হবে ভাই। এরজন্য একদিন কেন পাঁচদিন অবস্থানও নিরর্থক হবে না।

নির্মলবাবু বললেন, অওরঙ্গাবাদে আমাদের ট্যুরের বাস অপেক্ষা করছে। আমরা নির্দিষ্ট দিনে না পৌঁছালে বাস চলে যেতে পারে।

নতুনদিদি বললেন, ত্রিচিনাপল্লীর সেই মন্দিরে গিয়েও তুমি এই একই কথা বলেছে। বাস চলে গেলে আমরা ট্রেনে ফিরে যাব মাদ্রাজে।

আমি বললাম, এ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই নতুনদি, আমরা একটু জোরে পা ফেললে আর আবেগকে জয় করতে পারলে আজ ফেরা সম্ভব। জালগাঁও অনেক দূর নয়।

চৈত্যের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এই প্রবেশদ্বার কলকাতায় দেখেছি।

নতুনদিদি বললেন, কলকাতার মহাবোধি সোসাইটির প্রবেশদ্বার এরই অনুকরণে করা হয়েছে। চৈত্যবিহার সর্বত্রই এক। তবে এখানে সারনাথের মত স্তূপ নেই। বৌদ্ধবিহার, স্তূপ আর চৈত্য হল বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্ন। এখানে স্থানীয় পাথর খোদাই করলেও মনে হয় বাহির থেকে কিছু পাথর এনে চৈত্যর প্রবেশ পথে ব্যবহার করা হয়েছে।

অনেকক্ষণ দেখে বললাম, না। মহাবলীপুরমে যেমন পাহাড় কেটে একটি পাথরে মন্দির ও দেবতা খোদাই করা হয়েছে, এখানেও একই ভাবে পাহাড় কেটে বিশেষ নৈপুণ্যে চৈত্য এবং বুদ্ধের জীবন কাহিনী খোদাই করে পৃথিবীর সর্বোৎকৃষ্ট প্রযুক্তির নিদর্শন রেখেছেন অতীতের স্থপতিরা।

নতুনদি বললেন, এসব দেখে মনে হয় অতীতে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পে দক্ষিণ ভারতের শিল্পীরা সর্বাধিক দক্ষ ছিল, উত্তর ভারতের শিল্পকলায় ভারতীয় ও পারসিক শিল্পের মিশ্রণ দেখা যায় কিন্তু দক্ষিণ ভারতে ও ওড়িশায় সবটাই ভারতীয় শিল্পকীর্তি।

নির্মলবাবু গিয়েছিলেন ফিরতি বাসের সন্ধানে।

এসে বললেন, জালগাঁও যাবার শেষ বাস সাড়ে পাঁচটায় চলে গেছে। আজ ফিরতি বাস পাওয়া যাবে না।

আমি নিরুৎসাহ না হয়ে বললাম, আমি একবার ডিপোর ইন্সপেক্টারের সঙ্গে কথা বলে আসি। অন্তত আজ রাতে নিরাপদে থাকার ব্যবস্থাটাও করা দরকার।

ইন্সপেক্টার সোজাসুজি বললেন, আজ কোন গাড়ি জালগাঁও যাবে না তবে!

তবে কি?

দুপুরে খবর পেয়েছি, সাড়ে ছটা নাগাদ একটা বাস আসতে পারে। যদি আসে তা হলে আপনাদের ব্যবস্থা করতে পারব।

যদি না আসে তা হলে পান্থশালায় থাকার ব্যবস্থাটা করলে বিশেষ উপকৃত হব।

ভদ্রলোক গুরুত্ব দিয়ে বললেন, আর আধঘণ্টা অপেক্ষা করুন। অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করব। আজকাল ভিজিটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে সেজন্য বাসের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমার মনে হয় একটা বাস আসবে, সেটাই ফেরত যাবে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আরও কয়েকজন যাত্রী রয়েছেন, গাড়ি এলে সবার ব্যবস্থা করে দেব।

ছটার পরে একটা সরকারী বাস এল।

নির্মলবাবু সপরিবারে হাসিমুখে এসে বসলেন গাড়িতে।

সেদিনের ভ্রমনের মধুর স্মৃতি নিয়ে ফিরে এলাম জালগাঁও স্টেশনে।

সেখান থেকে অওরঙ্গাবাদ।

ছয়

অওরঙ্গাবাদ এসে পরদিন নতুনদিদি ছেলেমেয়ে নিয়ে গাড়িতে বসলেন। নির্মলবাবু তখনও রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আমি বাসে উঠে প্রণাম করলাম নতুনদিদিকে।

হঠাৎ প্রণাম করছ কেন ভাই।

বিদায় নিতে। কয়েকদিন আপনাদের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে আমি ধন্য। চিরকাল মনে থাকবে আপনার কথা, মনে থাকবে ঝণ্টু মিণ্টুদের।

অবাক হয়ে নতুনদিদি বললেন, তুমি আমাদের সঙ্গে তা হলে যাবে না?

যাবার ইচ্ছা যে নেই এমন নয় কিন্তু আমি যে উদ্দেশ্য নিয়ে বের হয়েছি তার আংশিক পূরণও এখনও হয়নি। এবার আমার গতি হবে উত্তর পশ্চিমে। নতুনদিদি কোনমতেই আমাকে যেতে দিতে চান না। সজল নয়নে তাকালাম।

তুমি বড়ই নিষ্ঠুর।

মাথা নিচু করে বললাম, আজ হোক, কাল হোক, আমরা তো বিচ্ছিন্ন হবই। সেটা একটু সময় থাকতে করলে বিচ্ছিন্নতার ব্যথাটা প্রগাঢ় হতে পারবে না। পথে আমাদের পরিচয় পথেই তার যবনিকা ঘটুক। যা হবে তা হতে দেওয়াই তো বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। ভগ্নীর ভালবাসা, মায়ের স্নেহ আর স্বার্থহীন উদার ব্যবহারে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে আরও ঘনিষ্ঠভাবে এই স্বর্গীয় বস্তুগুলো লাভ করতে, উপভোগ করতে।

নির্মলবাবু এগিয়ে এসে বললেন, আমরা এটা আশা করিনি।

হেসে বললাম, আমিও। বাড়িতে একটা বেড়াল পুষলেও মায়া জন্মায়,

আর কয়েকদিনের সহচরের ওপর মায়া জন্মানো স্বাভাবিক। উভয় পক্ষেই। যার ঘরের বাঁধন থাকে, তাকে অতি নিকটজনও শাসন করতে পারেনি, প্রিয়জন স্নেহের ডোরে বাঁধতে পারেনি তাকে সময় মত নিজের পথে চলতে দেওয়াই উচিত।

কারও মুখে কোন কথা নেই।

হঠাৎ মিণ্টু নেমে এসে আমার হাত ধরে বলল, তোমাকে যেতে দেব না মামা।

তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, ও কথা বলতে নেই মিণ্টু।

কেন! আমি যদি যেতে না দিই।

চুপ করে গেলাম। মিণ্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে তার প্রাক্-কৈশোরের রাঙ্গা মুখ দেখে কেমন আত্মহারার মত অবস্থা হল। এই বালিকা একদিন বড় হবে তারপর সংসার পাবে, সন্তান পাবে, তখন মমতাময়ী হয়ে স্বামী-সন্তান ও সংসারকে আঁকড়ে ধরে পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

মিণ্টুকে যতই বুঝাবার চেষ্টা করছি ততই সে আমার হাত শক্ত করে ধরছে।

গাড়ির ভেতর থেকে নতুনদি বললেন, তোমার মানুষ দেখা তো শেষ হয়নি, এই ছোট মেয়েটাও একটা মানুষ। মানুষকে জানতে হলে মানুষকে মর্যাদা দেওয়া উচিত। তা সে ছোটই হোক আর বড়ই হোক। মানুষ চিরকালই মানুষ।

নির্মলবাবু বললেন, উঠুন গাড়িতে। মাদ্রাজে গিয়ে আমরা নিজের নিজের পথে রওনা হব! পথের মাঝে এভাবে ঝগড়া হলে কারও মঙ্গল হবে না দাদা। আপনার দিদি আপনাকে কাছ ছাড়া করতে চান না। আর ঝণ্টু মিণ্টু তো আপনাকে পেয়ে তাদের নিজেদের মামার কথাও ভুলে গেছে।

কি ভাবছ ভাই? জানতে চাইলেন নতুনদি।

হেসে বললাম, মায়া।

তুমি তো শঙ্কর পথ নিয়ে ব্যস্ত। এদিকে গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। তোমার তো আপনি আর কোপনি। এবার তোমার পোটলাটা ঝণ্টুর বাবার হাতে দিয়ে উঠে এস। আর মাত্র দু-তিনটে দিন। তারপর।

তারপর! সেই তো অনির্দিষ্ট অনিশ্চিত যাত্রা। সেটা এখন হলে খুব অসুবিধা হবে কি!

অকস্মাৎ নতুনদিদির গলার শব্দ বদলে গেল। ধমক দিয়ে বললেন, হবে। চলে এস।

কাঁচ পোকার আকর্ষণ ছিল ওই ধমকে। আমি দ্বিরুক্তি না করে বাসে উঠে নতুনদিদির পাশে গিয়ে বসলাম। নির্মলবাবু কিছু খাবার সংগ্রহ করে এসে গেছেন।

আবার সেই একঘেয়ে যাত্রা।

যাত্রা পথের সঙ্গে কিছু পরিচয় ছিল। গাড়ি ধীরে ধীরে অওরঙ্গাবাদ ছেড়ে সেকেন্দ্রাবাদের পথ ধরল।

কি ভাবছ ভাই ? প্রশ্ন করলেন নতুনদিদি।

কত কথাই ভাবছি নতুনদি। এমনি একটা আলোকোজ্জ্বল দিনে পেঁছেছিলাম পাঠানকোটে।

পাঠানকোট ! মানে কাশ্মীর যাচ্ছিলে ?

হাঁ। শিয়ালদহ থেকে পাঠানকোট এক্সপ্রেসের যাত্রী আমরা প্রায় দুশজন। কোন একটা বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যাচ্ছি।

সকালবেলায় গাড়ি পেঁছাল লক্ষ্ণৌ।

চা পিপাসুরা সংরক্ষিত গাড়ির দরজা খুলে চায়ের তালাশে বের হওয়ামাত্র কয়েক ডজন যুবক জোর করে গাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করতেই হাঙ্গামা আরম্ভ হল। মুখের কথার চেয়ে হাতের কথা প্রবল হয়ে উঠতেই অনেকে শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। বিদেশে বিভুঁইয়ে হাত চালানো উচিত অথবা অনুচিত তা নিয়ে অনেকেই গবেষণা করছিলেন, ইতিমধ্যে প্রহার জর্জরিত আগন্তুকরা গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল, ট্রেনও চলতে শুরু করেছিল। অযোধ্যার নবাবদের দেশের উত্তর পুরুষরা অবশ্য কিছুক্ষণ গাড়ির পাশে ছুটতে ছুটতে চোস্ত উর্দুতে আমাদের আপ্যায়ন করে প্রহার জনিত দুঃখ লাঘব করতে ত্রুটি করেনি। আমরা দরজা ভাল করে বন্ধ করে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম গবেষকদের নীতি বাক্য শুনতে।

কিছুক্ষণ আগে অযোধ্যার মাঠে অসংখ্য ময়ূরের নর্তন দেখে যে মানসিকতা আমাদের আচ্ছন্ন করেছিল, সে মানসিকতার ওপর হাঙ্গামার সাময়িক ঘটনা বেশ ছায়াপাত করেছিল তা বুঝতে অসুবিধা হল না। বাংলার সাহিত্য ক্ষেত্রে কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিও ছিলেন গাড়িতে, পরিচয় পেয়ে অনেকেই ঝুঁকে পড়লেন এই সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মুখ নিসৃত অমৃতবাণী শুনতে। আর আমার মত অভাজনরা তখন নিজ নিজ সংরক্ষিত আসনকে আরও সুরক্ষিত করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। প্রতিশোধ স্পৃহা আর প্রতিহিংসা হল আদিমকাল থেকে মানুষের জন্মগত আচরণ। পরবর্তীকালে আহত নরকুল যে হামলা করবে না এমন কোন গ্যারান্টি ছিল না। অবশ্য সে দিন আর রাত্রি নিরাপদেই কেটেছিল।

আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞেস করলেন, কি বুঝলে ?

বুঝলাম, পথ চলতে হলে সতর্ক হতে হয়। তুমি সতর্ক ছিলে না তাই কাল রাতে গাড়ির কনডাক্টার আমাদের রাতের খাবার টিফিন কেরিয়ার থেকে বের করে উদরপূর্তি করেছিল। শ্রীকান্তের বর্মা যাবার পথে মিস্ত্রি আর তার বোস্টুমি টগরের কথা তো পড়েছ। কাবলিওলা তাদের খাবার খেয়েছিল কিন্তু মোটা মোটা রুটিও রেখে দিয়েছিল কিন্তু রেলের কনডাকটার সবই চেঁছে মুছে খেয়েছে টিফিন ক্যারিয়ারটা ধুয়ে পরিষ্কার করার দায়িত্বটা আমাদের দিয়ে গেছে। অতি সজ্জন লোক।

সঙ্গিনী মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, মুখে আগুন।

কার মুখে, তা বললেন না।

সহযাত্রী সবাই আমাদের এই হাস্যকর দুর্দশার কথা শুনে হেসে উঠল। একজন বললেন, কোথায় সেই সততাধর্মী কনডাকটার ?

মোগলসরাইতে নিশ্চয়ই নেমে গেছে। পূর্ব রেলের শেষ, উত্তর রেলের শুরু, কর্মী বদল তো নিশ্চয়ই ঘটেছে। ওই সততাধর্মীকে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন না।

সঙ্গিনীকে বললাম, তোমার কপাল ভাল, টিফিন ক্যারিয়ারটা নিয়ে যায়নি। আম ও বস্তা সবই যাওয়া উচিত ছিল।

তুমি ঠাট্টা করছ।

থামতে হল। সঙ্গিনীর রক্তচক্ষু বিপর্যয় ঘটাবে মনে করে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলাম। পরিষ্কার আকাশ, আমবাগানের ফাঁকে ফাঁকে ময়ূরের ছোটাছুটি, কোথাও কোথাও ছোট ছোট গ্রাম, কোথাও ছোট ছোট নালা, কোথাও কোন উপনদী, সব পেরিয়ে ছুটছে আমাদের গাড়ি। আবার রাতের অন্ধকার। চোখ আর চলে না। ছোট ছোট স্টেশনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে, স্টেশনের মৃদু আলো জোনাকির মত ছিটকে যাচ্ছে চোখের সামনে থেকে। সহযাত্রীদের অনেকেই গানের আসর বসিয়েছে, কেউ কেউ তাস খেলছে। আমরা এই রসের সাগর থেকে বঞ্চিত। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখা ভিন্ন অন্য কোন কাজ পেলাম না। সঙ্গিনী হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল, এবার খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়।

বললাম, আমরা দুজন। আরও চারজন আছে এই কামরায় তারা কোথাও আড্ডা বসিয়েছে, তাদের ফিরে আসতে দাও।

আমি বড়ই ক্লান্ত। কে এল আর কে না-এল তা দেখতে গেলে অনেক রাত হয়ে যাবে। তার চেয়ে শুয়ে পড়ি, রাতে ঘুমের ব্যাঘাত হবে মাঝে মাঝে, তবুও গা এলিয়ে তো আরাম পাব।

খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছিলাম।

রাতে ঘুমের কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। সকালবেলায় যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন গাড়ি পাঞ্জাব সীমান্তে পাঠানকোট থেকে পনের বিশ কিলোমিটার দূরে। আমাদের অনেক আগেই সহযাত্রীদের ঘুম ভেঙ্গেছে, তারা ব্যাগ-ব্যাগেজ বেঁধে তৈরি। পাঠানকোটেই তখন ছিল রেলপথের শেষ, তাড়াহুড়া অনর্থক।

আমরাও প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

হিসাব করলাম, শুক্রবার দুপুরে রওনা হয়েছি, শনিবার দুপুরে চব্বিশ ঘণ্টা পেরিয়ে জম্মুতে পুরো আটচল্লিশ ঘণ্টায় পেঁছিলাম। সহযাত্রীদের কাছে শুনলাম, রবিবার রাত কাটাতে হবে পথে একটা সরাইখানায়। সোমবার দুপুরবেলায় পেঁছিব শ্রীনগরে। পুরো বাহাত্তর ঘণ্টা পথেই কাটবে। হতাশ হবার কিছু ছিল না। বয়সও হতাশ হবার মত নয়। দেহও ছিল শক্ত সমর্থ। প্রতি পদে পদে নতুনত্ব এবং তা ছিল উপভোগ্য।

কাশ্মীর সরকার অনুষ্ঠানের ডেলিগেটদের জন্য কয়েকখানা বাসের ব্যবস্থা

করে রেখেছিল।

হুরমুর করে সবাইকে মালপত্র নিয়ে বাসে উঠতে হয়। সবাই চায় ভাল জায়গায় বসতে। এই বাসগুলোতে লিনিং চেয়ার রয়েছে। আগে পেছনে ভালমন্দ এই সব বাসে সবই সমান।

সঙ্গিনী হঠাৎ বললে, সস্ত্রীক ভদ্রলোকটিকে চিনতে পারছ ?

বললাম, আমার চোখের জ্যোতি কমে গেছে। তুমি চিনেছ কি ? আর চিনতে হবে না।

লোকে ওঁকে বলে, কি যেন ভোঁস।

ছিঃ, ওকথা বলতে নেই। মাননীয় লোককে সম্মান দেখানো উচিত। আমাদের মত কীটপতঙ্গের চেয়ে উনি উচ্চস্তরের লোক। সপরিবারে চলেছেন কাশ্মীর ভ্রমনে। মানুষকে অসম্মান করার আগে বহুবার ভাবা উচিত।

বারটা নাগাদ পেঁছিলাম জম্মুতে।

সঙ্গিনী বললেন, এখানে বৈষ্ণোদেবীর মন্দির। উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। লক্ষ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর আসে তীর্থ দর্শন করতে। আজ এখানে নেমে দেবীদর্শন করে কাল শ্রীনগরে গেলে কেমন হয় ?

কথা শেষ করেই সঙ্গিনী বললেন, না, না। ফেরার পথে এখানে হল্ট দেওয়া যাবে।

অবশ্যই। জম্মু ছিল কাশ্মীর রাজ্যের শীতকালীন রাজধানী। এখন কাশ্মীর-জম্মুর রাজ্যপাল আর রাজ্যের মহাকরণ জম্মু থেকেই কাজকর্ম করে শীতকালে।

কিন্তু এই রাজ্যের ইতিহাস যেমন বিচিত্র তেমনি করুণ।

আবার পেছন হাঁটতে আমি রাজি নই, তাই বাধা দিয়ে বললাম, অতীতকে ভুলে যাও শ্রীমতী।

ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না। আজকের আফগানিস্তান ছিল বৌদ্ধদের কর্মকেন্দ্র, বহু হিন্দুও ছিল এবং এখনও সামান্য সংখ্যক পাঠান-হিন্দু আফগানিস্তানে বাস করে স্থায়ীভাবে। এক সময় যে বৌদ্ধধর্ম ছিল প্রবল তার স্মৃতি বহন করছে বহু ভগ্ন চৈত্য ও বিকৃত বুদ্ধমূর্তি। এই পথেই এসেছিলেন চীনা পরিব্রাজক হুয়েনসাং, এই পথেই চলত ভারত চীনের বাণিজ্য।

এসব কথা আজকের আফগানরা ভুলে গেছে।

কিন্তু কাশ্মীর। এক সময় কাশ্মীর ছিল বেদ-বেদান্ত ভারতীয় সাহিত্য ইত্যাদির বিবরণ ক্ষেত্র। কাশ্মীর পণ্ডিত কলহনের কথা আজও আমরা ভুলিনি অথচ কাশ্মীর ও আফগানিস্তান বর্তমানে ইসলাম চর্চার বিরাট কেন্দ্র। কেন হল জান ?

জানি। ইসলাম ভাববাদী নয়। বস্তুবাদী। ভাববাদ প্রভাব হারায় মানুষের সুস্থ বাঁচার মত বাঁচার আকাঙ্ক্ষায়। ইসলাম এ বিষয়ে খুবই উদার। এইসব দেশের মানুষ সহজে ইসলামের ছত্রতলে আসছে কারণ ইসলামের শ্রেণীভেদ কম,

জাতিভেদ নেই।

কাশ্মীর রাজ্য ললিতাদিত্য জয়াপীড়ের কথা তো শুনেছ এঁরা গৌড় থেকে এসেছিলেন। অনেকে বিশ্বাস না করলেও আজও পানজাব ও কাশ্মীরে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ এবং সারস্বত ব্রাহ্মণের অভাব নেই। পরবর্তীকালের ইতিহাস বড়ই গোলমেলে।

পরবর্তীকালে কাশ্মীরের ভাগ্য বিধাতা হয়েছিলেন রঞ্জিত সিংহ। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ক্ষতিপূরণের দায় মেটাতে শিখদের কাশ্মীরকে বিক্রি করতে হয়েছিল ডোগরি সেনাপতি গোলাব সিংহকে। তখন ইংরেজ কাশ্মীরকে স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকৃতি দিলেও, পরবর্তীকালে ইংরেজ চাতুরী করে এই রাজ্যকে অধীনতামূলক মিত্রে রূপায়িত করেছিল।

বললাম, ওসব কথা থাক। কাশ্মীর ইজ্ কাশ্মীর, ভূস্বর্গ। আমরা এখনও ভূস্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে। এর হৃদিভূমি পৌঁছে এসব অতীতকে স্মরণ করব।

সঙ্গিনী অসন্তুষ্ট হলেও আমরা সবাই গেলাম নিকটবর্তী হোটেলে ক্ষুধা মেটাতে।

জম্মু সাজানো শহর। মূলত ডোগরিদের শহর। কাশ্মীরকে তিনটে ভাগে ভাগ করে রেখেছে অধিবাসীরা। জম্মুতে হিন্দুদের প্রাধান্য, কাশ্মীর উপত্যকায় মুসলমান আর কাশ্মীরি পণ্ডিতদের প্রাধান্য আর লাদাক অঞ্চলে বৌদ্ধদের প্রাধান্য। গভীর ভাবে চিন্তা করলে এটাই হবে সহজ সত্য যে কাশ্মীরে শান্তি বজায় থাকলে এরকম সর্বধর্ম সমন্বিত রাজ্য ভারতে আর দ্বিতীয়টি নেই। আরবীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় সংস্কৃতি কিছুটা চৈনিক সংস্কৃতির এমন মিলন ক্ষেত্র পৃথিবীতে বিরল।

জম্মু পেরিয়ে গাড়ি দুর্গম পার্বত্য পথে চলতে থাকে।

রাস্তায় দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবল বেগে বিতস্তা নদীর জল নেমে আসছে সমতলের দিকে। নদীর কিনারা দিয়ে যে ভীতি সঞ্চারক পথ তৈরি করা হয়েছে তাতে বাসের যাত্রীদের উৎকণ্ঠাই ছিল বেশি, যে কোন মুহূর্তে সামান্য ভুলে গাড়ি যদি গড়িয়ে যায় একজনেরও প্রাণ রক্ষা হবার আশা কেউ করবে না।

বানিহাল।

ভারত থেকে শ্রীনগর স্থলপথে যাবার একমাত্র বাধা ছিল বানিহাল পাহাড়। প্রাক্ স্বাধীনতা কালে শ্রীনগর যাবার একটি মাত্র সহজ পথ ছিল, রাওয়ালপিণ্ডি হয়ে। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে মুরী। এখান থেকেই কাশ্মীর রাজ্যের সীমানা আরম্ভ। আজ সে পথ বন্ধ, একমাত্র যাতায়াত চলত বিমানে। কাশ্মীর প্রশাসনকে চাঙ্গা রাখতে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অন্যান্য দ্রব্য সরবরাহের কোন পথ ছিল না। বানিহাল পাহাড় টপকে যেত কেবল মাত্র সামরিক বাহিনীর যান-বাহন। সহজ পথ তৈরি করল প্রযুক্তিবিদরা।

বানিহালের বুক কেটে সুরঙ্গ তৈরি হল। এই সুরঙ্গ সহজ করে দিল পাঞ্জাব থেকে শ্রীনগরে চলাচল।

বানিহালের সুরঙ্গ দিয়ে গাড়ি যখন অতি ধীরে সতর্কভাবে চলছিল তখন আমার মনে হল পাথরও অশ্রুপাত করে, যদিও বেদনার অনুভূতি পাথরের নেই তবুও সুরঙ্গের গা বেয়ে স্থানে স্থানে যে জলের ধারা নামছিল তা পাথরের বেদনার অশ্রু বলে মনে হয়েছিল। পাথর কথা বলে না। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে স্বাভাবিকতার বিরোধী সুরঙ্গ পাথরের চোখের জলের সঙ্গে অস্বাভাবিকতায় প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

বানিহাল সুরঙ্গের সামনে এসে গাড়ি দাঁড়ায়। বিপরীত দিকের গাড়ি বেরিয়ে এলে শ্রীনগর যাবার গাড়িকে পথ ছেড়ে দেয়। গোটা সুরঙ্গ আলোকমালায় সাজানো। সে আলোর তেজ এত ক্ষীণ যে সুরঙ্গের অন্ধকার ঘোচাতে পারে না ঠিক মত। হেডলাইট জেবলে, গাড়ির ভেতরের আলো জেবলে অতি সতর্কতার সঙ্গে বানিহাল পার হয়ে গাড়ি এসে দাঁড়াল উন্মুক্ত আকাশের তলে। সামনে বনাকীর্ণ পাহাড়ের গা কেটে পীচের রাস্তা আর খোলা আলো বাতাসের হাতছানি যাত্রীদের নতুন ভাবনা চিন্তার রাজ্যে পেঁছে দেয়।

পথ চলার অসুবিধা অনেক। বিশেষ করে মহিলা সহযাত্রী নিয়ে পথ চলতে যে সব অসুবিধা তা সমাধান করতে পথের মালিকরা প্রায়শই চায় না। যে অবস্থার সম্মুখীন হতে পারে পুরুষরা সে অবস্থা মহিলারা সামাল দিতে পারে না।

রামগঙ্গা নদীর সাঁকো পেরিয়ে যখন বাজারের পাশে গাড়ি দাঁড়াল তখন সবাই ছুটল চা বিস্কুটের সন্ধানে।

সঙ্গিনী বললেন, দেখতো বাথরুম কোথাও আছে কিনা।

কয়েক মিনিট ঘুরে এসে বললাম, নেই।

তা হলে ?

কোন অসুবিধা নেই, পাহাড়ের ও পাশটায় বেশ ঝোপঝাড় আছে। মগভর্তি জল নিয়ে চলে যাও, কেউ ওপথে পা দেবে না।

সঙ্গিনী তথা গৃহিণী ফিরে আসতেই সেই স্বনামধন্য ভদ্রলোকের স্ত্রী সঙ্গিনীর হাতের মগ আর জল নিয়ে রওনা হলেন সেই ঝোপঝাড় ভর্তি টিলার দিকে। ইতিমধ্যে সরকারী বাস থেকে বারবার হর্ন দিয়ে যাত্রীদের স্থান গ্রহণ করার ইঙ্গিত দিতেই সেই খ্যাতনামা ব্যক্তিটি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। একবার টিলার দিকে এগোচ্ছেন আবার ফিরে আসছেন। কপালে কুঞ্চিত রেখা, নিজের মনেই বিড় বিড় করছেন। প্রায় দশ মিনিট পরে মহিলাটি ফিরে এলেন, আর সেই খ্যাতনামা ব্যক্তিটি যেভাবে সর্বসমক্ষে তাঁকে আপ্যায়ন করলেন তা শুনে সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলেন, ভদ্রমহিলা কে ?

ওর স্ত্রী।

আমি মনে করেছিলাম ওঁর বাড়ির চাকরাণী। বোধহয় চাকরাণীকেও এ ভাষায় আপ্যায়ন কেউ করে না।

বললাম, চুপ চুপ। লোকে শুনলে তোমাকে নাজেহাল হতে হবে।

খ্যাতনামা ব্যক্তির পার্শ্বচর নিশ্চয়ই আছে, তাদের কাছে এসব উক্তি সঙ্গত আদর ও ভালবাসা। বুঝলে।

সঙ্গিনী বুঝেছিল কিনা জানি না।

আবার গাড়ি ছুটল।

সন্ধ্যাবেলায় জানা গেল, রাতের বেলায় এই দুর্গম পথে গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ।

অর্থাৎ রাতের আশ্রয় খুঁজতে হবে।

গেস্টহাউস ইতিমধ্যে ভর্তি হয়ে গেছে। আমরা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত অধিক ভাড়া কপচে একটা বাড়ির দোতলায় রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করলাম। পথে আরও একজন সঙ্গিনী পেয়েছিলাম, তিনি বধির। তবে কানে যন্ত্র লাগালে কিছুটা শুনতে পান। তাকেও সঙ্গে নিলাম।

আশ্রয়স্থল পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আরও একজন ভদ্রলোক ছুটে এলেন।

আপনারা জায়গা পেয়েছেন? আমি পাইনি। আমাকে একটু থাকার জায়গা দেবেন?

বললাম, অবশ্যই দেব। আপনি আসছেন কোথা থেকে?

দিল্লি থেকে আসছি। Statesman কাগজে কাজ করি। অনুষ্ঠান Cover করতে এসেছি।

আর কোন প্রশ্ন করা অবান্তর।

ছোট ঘরখানায় যে যার মত বিছানা করে শুয়ে পড়তে হল।

মাঝরাতে গৃহিণী ধাক্কা দিয়ে বললেন শুনতে পাচ্ছ?

কি?

আওয়াজ।

ওটা কিছু নয়। Statesman কাগজের ব্যানার্জীবাবুর নাসিকা গর্জন। Statesman প্রেসে এখন কাগজ ছাপা হচ্ছে।

অনেকের নাক ডাকা শুনেছি। এরকম তো বাঘের ডাক শুনিনি।

এবার শোন, তবে আজ রাতে আর ঘুম হবে না। তার চেয়ে বসে বসে গপ্প করি। তোমার বীথিদিদি কানে শোনেন না। তাঁর কোন হাঙ্গামা নেই। নিশ্চিন্তে ঘুমাবেন। আমরা দুজন পাহারাদারী করে রাত কাটাব।

রাত কাটালাম অনিদ্রায়।

সকালে বাসে উঠে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ গৃহিণী ধাক্কা দিয়ে বললেন, এখন গাড়ি সমতল দিয়ে চলছে। দুপাশে সরল গাছ, চিনার গাছ মাঝ দিয়ে পথ, শীতের নামগন্ধ নেই, চারিদিকে কেমন ব্যস্ততা।

আমরা কাশ্মীর ভ্যালিতে পৌঁছে গেছি। দুর্গম এলাকা পেরিয়ে নিরাপদ এলাকায় এসেছি। পাশে চাষের ক্ষেত, ওগুলো বোধহয় আপেলের বাগান। ওঠ দেখ দলবেধে ভেড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে মাঠে মাঠে, একজন রাখালও রয়েছে ভেড়া চড়াতে।

শ্রীনগর পৌঁছে সবাই ছুটে চলল হাউসবোটের সন্ধানে। কাশ্মীর সরকার হাউসবোটের ব্যবস্থা করেছিল। ঝিলাম নদীর বুকে সারি সারি হাউসবোট। তার জন্য ছোটাছুটি। কিন্তু আমরা?

আমরা উঠলাম ক্যানাল হেভেন হোটেলে। ডাললেকের মাঝে এই হোটেল। যেন দ্বীপ রাজ্য।

রওনা হবার আগে সবাই বলেছিল, কাশ্মীরে খুব শীত।

জুলাই মাসে কাশ্মীরে যে খুব গরম একথা কেউ বলেনি। আমরা অনর্থক মোটা মোটা বেডিং ঘাড়ে করে এসে বোকা বনে গেলাম। রাতের বেলায় উৎকট গরমে ঘুমোতে পারিনি। ঘরে বিজলী বাতি থাকলেও কোন ফ্যান নেই। গরমে ছটফটানোর সঙ্গে উৎকট ব্যাঘ্র গর্জন ব্যানার্জীবাবুর নাসিকা ভেদ করে যখন বহির্গত হচ্ছিল তখন মনে হচ্ছিল, কাশ্মীর ভ্রমনের আনন্দ যতটা তার চেয়ে বেশি নিরানন্দ। আমরা অসন্তুষ্ট কিন্তু কিছু বলতে পারছি না।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনি চিকিৎসা কেন করেন না?

অনেক চিকিৎসা করিয়েছি। কিছুই হয়নি। আমি দুঃখিত কিন্তু নিরুপায়। আপনারা সহ্য করছেন অন্য কেউ সহ্য করত না। এমন কি আমার স্ত্রী আমার নাক ডাকার শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে শেষ পর্যন্ত আদালত থেকে ডিভোর্স নিতে বাধ্য হয়েছেন।

ইউরোপীয় দেশে কথায় কথায় সামান্য কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে থাকে। ভারতবর্ষে সামান্য কারণে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা বোধহয় একটিই। ব্যানার্জী-বাবুর সঙ্গে দিল্লি অবধি এসেছিলাম, সারাটা পথ উনি ওঁর এই দুঃখজনক পরিণতির কথা বার বার বলেছেন, বেশি করে বলেছেন তাঁর স্ত্রীর প্রতি কি আকর্ষণ ছিল তাঁর। কতটা ভালবাসতেন মহিলা কে। বোঝাপড়া করার জন্য বার বার চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি, রাতের বেলায় ভিন্ন খাটে শোওয়া, শেষ পর্যন্ত ভিন্ন কামরায় শোওয়া, এসব করেও অনীহা দূর করতে পারেননি।

যৌবনকে যখন ভোগমুখী করে তখন প্রেম ভালবাসা হয়ে যায় অতি নগণ্য বস্তু। ভোগে পরিতৃপ্তি না ঘটলে কেউ কেউ মনে করে প্রেম ভালবাসা জন্মায় না, বোঝাপড়াও হয় না। হয়ত তাই। এ বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নেই, তবে জানি স্বামী স্ত্রী যদি সমধর্মী না হয় তারা সহধর্মিনী হতে পারে না, যারা বিপরীত কথা বলে, তারা সমাজ ও পরিবেশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করতে না পেরে অসমধর্মীর সঙ্গে ঘর বাঁধে। ব্যানার্জীবাবুর ক্ষেত্রেও বোধহয় অসমধর্মীর আঘাত পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য করেছিল।

ঝিলাম সিন্ধুর উপনদী।

শতদ্রু (সাট্‌লেজ) বিপাশা (ঝিলাম) বিপাশা (বিয়াস) আর ইরাবতী, চন্দ্রভাগা এই পাঁচটি নদীর সঙ্গম গড়েছে সিন্ধু নদী। সিন্ধু নদীর তীরে আর্যরা প্রথম বসবাস করে। সিন্ধু নদীর তীরে বসেই তারা বেদ বেদান্ত

উপনিষদ আরও কত দর্শন কাব্য, সাহিত্য, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ চর্চা করেছে। এই সিন্ধুর উপনদী ঝিলাম শ্রীনগর শহরের বুক কেটে বেয়ে চলেছে সমতলের দিকে, কাশ্মীর উপত্যকায় ঝিলাম কিছুটা শান্ত কিন্তু পাহাড়ি পথ দিয়ে আসার সময় এই ঝিলামের ভয়ঙ্কর চেহারা দেখেছি। প্রায় পাঁচ সাত শত ফুট নিচ দিয়ে ঝিলাম বয়ে চলেছে, আর অতটা উচ্চতায় পর্বতের গা কেটে তৈরি হয়েছে শ্রীনগর যাবার ভীতিপ্রদ পথ। বাসের জানালা দিয়ে নিচে তাকিয়ে যাত্রীদের কেউ কেউ চক্কর খেয়ে যায়, অনেকে বমি করে ফেলে। ঝিলামের দুপাশে সুউচ্চ পর্বত বনাবৃত, সবুজের সমাহার। মাঝে মাঝে মেঘ রোদ্দুরের খেলা প্রকৃতিকে জীবন্ত করে তোলে, যাদের দেখার তারা এই সৌন্দর্য নয়ন মন দিয়ে উপভোগ করে।

ঝিলামের বুকে হাউসবোটের শহর।

এখানে বাস করতে আসে বহু ভ্রমনার্থী।

অনেকের কাছেই শুনেছি রুচিসম্মত লোকেরা হাউসবোটের পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন মনে করতে পারেনি অনেক ক্ষেত্রেই। ভূস্বর্গের শহরের রাস্তাঘাট পরিষ্কার তবে সর্বত্র নয়। ডাললেক ও সন্নিহিত জায়গা যত মনোরম তত নয় শহরের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলো। নোংরা দুর্গন্ধময় নর্দমা, ভাঙ্গাচোরা পথ। আর বস্তিবাসীদের কৃচ্ছ্রতাময় জীবন, অতি অপরিষ্কার সাধারণ মানুষের বেশভূষা বড়ই বেমানান কাশ্মীরের পুরুষ, ও সুন্দরী নারীর পক্ষে। গৌরবর্ণ উচ্চ নাসা আয়ত চক্ষু পুরুষ-নারী যেন শহরের কোণায় কোণায় সৌন্দর্যের পাপড়ি মেলে ধরেছে কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশভূষা দারিদ্রের ছাপ বহন করে, সৌন্দর্যকে ম্লান করে দেয়। ভারত সরকার ভরতুকি দেয় অনেক, কিন্তু পশম ও রেশম বিনা অন্য শিল্পের অপ্রতুলতা এদের কর্ম সংস্থানের পরিপন্থী।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পিপাসু ছিলেন বাদশাহ জাহাঙ্গীর।

মাঝে মাঝে জাহাঙ্গীর আসতেন নুরজাহানকে নিয়ে কাশ্মীরে অবসর কাটাতে।

ফলফুলে ভর্তি মনোরম পরিবেশে শহর থেকে কিছুটা দূরে জাহাঙ্গীর পত্তন করেছিলেন শালিমার উদ্যান। সেদিনের সৌন্দর্য আজও আছে কিনা জানি না কিন্তু শালিমার উদ্যান তার পূর্ণ গৌরব নিয়ে আজও বিরাজ করছে, দর্শককে তৃপ্ত করছে। আমাদের মত অভাজনরাও শালিমার দেখার লোভ ছাড়তে পারেনি, গৃহিণী নিয়ে ক্যামেরা হাতে করে শালিমার পৌঁছালাম দুপুরে তখন বাগান ভর্তি হয়ে গেছে কাশ্মীরি পুরুষ আর মেয়েতে। ভ্রমনকারীর সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। আমরা গিয়ে বসলাম একটা গাছতলায়। পাশেই একটি ছোট পরিবার। স্বামী-স্ত্রী ও তিনটে বাচ্চা নিয়ে বাগানে গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমরা একটু দূরে বসতেই মহিলাটি উঠে বসলেন। বলা বাহুল্য কাশ্মীরে বোরখা বিশেষ দেখা যায়নি, এই মহিলারও বোরখা ছিল না। গৃহিণীর সঙ্গে ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে বেশ আলাপ জমিয়ে নিয়েছিল।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভাইসাব চা খাবেন ?

বললাম, মন্দ কি। কিন্তু চায়ের দোকান তো এখানে নেই।

দোকান নেই, আমাদের সঙ্গে চা আছে।

বলেই অনেকটা ইক্‌মিক্‌ কুকারের মত একটা পিতলের পাত্র নিয়ে এসে পেয়ালা করে চা দিলেন।

চা গরম কিন্তু পেয় নয়। অন্তত আমাদের মত চাপায়ীদের নয়।

চিনির বদলে নুন দিয়ে চা, লিকার ও দুধ থাকলেও উৎকট নোনতা চা। কস্মিন কালেও খাইনি, কিন্তু ফেলতেও পারছিলাম না। কোন রকমে গলাধ-করণ শেষ করে দম্পতিকে অশেষ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে পড়লাম যাতে আমাদের ধন্যবাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আরও এক পেয়ালা চা খেতে না হয়।

বিবিজি তাঁর বাড়ির ঠিকানা দিয়ে আমন্ত্রণ জানাতে ত্রুটি করেননি।

সেই কাশ্মিরী দম্পতি লবণাক্ত চা খাওয়ালেও তাদের আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। শেষ পর্যন্ত অজ্ঞাতকুলশীকে তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে সামাজিকতা ও আতিথেয়তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখেছিল। অবশ্য আমাদের স্বল্পকাল কাশ্মীর থাকার সময় তাদের বাড়িতে যাওয়া হয়নি, কিন্তু তাদের আতিথেয়তাকে আজও ভুলতে পারিনি।

পরবর্তী ঘটনাই আমাদের চিন্তিত করেছিল।

আমরা বাসে উঠলাম শহরে ফিরে আসতে। বাসে বেশ ভিড় ছিল। কোন রকমে রড ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। ডান হাত রডে বাঁ হাতে ক্যামেরা।

পাশে বসেছিলেন একজন সুদর্শন কাশ্মীরি ভদ্রলোক। নাম বলেছিলেন গোলাম বক্স। আমার অবস্থা দেখে করুণাপরবশ হয়ে এই ভদ্রলোক চোস্ত ইংরেজিতে বললেন, আপনার ক্যামেরাটা আমার কাছে দিয়ে দুহাত দিয়ে রড ধরুন।

আমি বললাম, আমার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

ভয় পাবেন না। This is not India, this is Kashmir.

অবাক হয়ে গেলাম তাঁর কথা শুনে।

কাশ্মীরি জনসাধারণের এই কি মনোভাব। তারা নিজেদের ভারতীয় মনে করে না। অনিচ্ছাতেও তাঁর হাতে ক্যামেরাটা দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, সত্যিই কি কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। ইতিমধ্যে তাঁর পাশের যাত্রী নেমে যেতেই আমাকে ডেকে পাশে বসালেন।

গোলাম বক্সের রেশমের ব্যবসা আছে।

তার বাড়িতে রেশমের চাষ হয়। বাড়িতেই তাঁতে কাপড় বোনা হয় ইত্যাদি শোনালেন। শেষে বললেন, কাশ্মীর শীতের দেশ, সিল্কের মার্কেট ছোট। Silk is exported to India. থামলেন ভদ্রলোক। আবার বললেন, কাশ্মীরি শালের চাহিদা সব চেয়ে বেশি India's Bengal area. অর্থাৎ প্রত্যেকটি কথা দিয়ে উনি বুঝিয়ে দিলেন, কাশ্মীর ভারতের অংশ নয়।

গোলাম বক্সের কথাগুলো হজম করতে পারছিলাম না।

ফিরতিপথে ব্যানার্জীবাবুকে ঘটনাটা বলতেই উনি তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। বললেন সব দোষ জওহরলালের। কাশ্মীরের ভারতভুক্তি সমাপ্ত। পাকিস্তান হানাদার পাঠিয়ে কাশ্মীর দখল করার চেষ্টা করতেই ভারত সশস্ত্র সংগ্রামে নেমে পড়ল।

জিন্নাহ তখন কাশ্মীর সীমান্তে অপেক্ষা করছে শ্রীনগরে পাকিস্তানের পতাকা তুলতে আর হজরত বলে মসজিদে নমাজ পড়তে। বলা বাহুল্য জিন্নাহ জীবনে কখনও নমাজ পড়েছেন এমন প্রমাণ নেই। কিন্তু জিন্নার আশা আর পূর্ণ হল না। ভারতীয় সেনারা কাশ্মীর থেকে তাড়াতে শুরু করেছে পাকিস্তানীদের। মাউণ্টব্যাটেন তখন গভর্নর জেনারেল। ইংরেজ পার্লামেণ্টে ইংরেজের প্রধানমন্ত্রী এটিলি তখন চিন্তিত। কাশ্মীর যদি পাকিস্তানের হস্তগত হয় তা হলে যতটা বৃটিশ স্বার্থ রক্ষা হবে, ভারতভুক্ত কাশ্মীরে ইংরেজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই হবে মুশকিল। মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে ভারতীয় মুসলমানরা হয়েছিল ইংরেজের সুয়োরাণী। যারা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব কায়েম রাখতে খেদমত করেছে তারাই ইংরেজের বিশ্বস্ত। মুশকিল আসান করতে মাউণ্টব্যাটেনের পরামর্শে জওহরলাল কাশ্মীর সমস্যা পাঠালেন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে। রাষ্ট্রসংঘ বলল, তিষ্ঠ। যে-যেখানে আছ তিষ্ঠ। জওহরলাল বললেন গণভোট হবে। অথচ আর সাতটা দিন অপেক্ষা করলেই গোটা কাশ্মীর ভারত নিজের আয়ত্বে আইনানুগ ভাবে আনতে পারত। মাউণ্টব্যাটেন ও জওহরলাল দুজনে মিলে স্থায়ী সমস্যা ও অশান্তির বীজ বপন করল। তারই প্রতিফলন দেখা দিয়েছে কোন কোন কাশ্মীরির মনে। এরা স্বাধীন কাশ্মীরের খোয়াব দেখতে অভ্যস্ত।

ব্যানার্জীবাবু আরও কিছু বলতেন কিন্তু আমাদের তিনদিন যাত্রার শেষ অবসর যাপনের স্থান জম্মুতে গাড়ি পৌছতেই বন্ধ হয়ে গেল আলোচনা।

বীথি আমাদের কথা কিছু কিছু অনুধাবন করে বলেছিল, দাদা, কাশ্মীরেই তো অমরনাথ তীর্থ। কাশ্মীর যদি ভারতের অংশ না হত তা হলে এখানে অমরনাথ তীর্থ হত কি। হাজার হাজার হিন্দু তীর্থযাত্রী সেই আদিকাল থেকে এখানে তীর্থ করতে আসত কি?

কিছুক্ষণ থেমে বলল, শঙ্করাচার্যের মন্দিরে গেছেন কি? শ্রীনগরের মাথায় ওই মন্দির কয়েক শত বৎসরের পুরনো। এদেশ যদি মুসলমানদের হত, তা হলে শঙ্করাচার্যের মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখতে পেতাম। শৈব ধর্মের প্রভাব এসেছিল বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির সময়। ভারতীয় কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ভাষা, সব কিছুই এখানে ভারতীয়। অথচ সব ভুলে পাকিস্তানের দাবীদার মুসলীম মৌলবাদীর।

বললাম, ধর্মটা সব কথা নয়। ভারত অখণ্ড ছিল, তাকে টুকরো করেছে, মৌলবাদীরা। ধর্মকে রাষ্ট্র নির্ধারণের সূচক মনে করে তাই ওরা দাবী

জানাচ্ছে কাশ্মীরের ওপর। ধর্ম আর রাজনীতির মিশ্রনে দেশের অগ্রগতি নষ্ট হয়। এর ফল পাকিস্তান হাড়ে হাড়ে বুঝছে পাকিস্তানের জনগণের সামান্য অংশের ব্যক্তি স্বাধীনতাটুকুও নেই। ধর্মের ভিত্তিতে বাংলা বিভাগের ফলাফল আমি সে দেশে গিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি। এই বিভাগ যে সুখের নয় তা ওরা বুঝছে, আরও বুঝবে. তবে বিলম্বে বুঝবে, তখন আর ফেরার পথ থাকবে না।

দাস্যবৃত্তি যেভাবে মনুষ্যত্ববোধকে হত্যা করে। তেমনটা একমাত্র স্বার্থান্ধ ক্ষমতালোভীরা করে থাকে। দু'হাজার বছর ধরে যে দাসত্ব ভারতের স্কন্ধে স্থান করে নিয়েছিল তা ভারতীয় জীবনে নৈতিক অধঃপতন যে ভাবে ঘটিয়েছে তারই ফসল আহরণ করছে বর্তমান প্রজন্ম এবং করবে ভবিষ্যত প্রজন্মও। এটাই স্পষ্ট হয়েছিল চশমাশাহীর বাগানে গিয়ে। এই বাগানের যে গৃহে কোনসময় অভিজাতরা নর্ম সহচরী নিয়ে কেলি করতেন সেই গৃহে বন্দী ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ এবং এই গৃহেই তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

শ্যামাপ্রসাদের অপরাধ কি ?

কাশ্মীরকে বিশেষ সুবিধাদান ও ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকের জন্য কাশ্মীরের দ্বার অর্গলবন্ধ রাখা।

শেখ আবদুল্লা তখন কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি ভারতের একটি রাজ্যে তখন প্রধানমন্ত্রীর সিংহাসনে একটা হাস্যকর ব্যাপার হলেও দিল্লির তক্তে-উ-তাউল বিরাজমান নতুন মোগল বাদশাহ জওহরলাল নেহেরু এই সোনার পাথরের বাটিকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন সজ্ঞানে ব্যক্তি এবং পরিবারগত স্বার্থ বজায় রাখতে। শ্যামাপ্রসাদ এই বিচ্ছিন্নতাকে স্বীকার করেননি এবং তার প্রতিবাদে কাশ্মীর প্রবেশমাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করে চশমাশাহীতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত বন্দী করে রাখা হয়েছিল। হঠাৎ এই মৃত্যুকে দেশের লোক মেনে নিতে না পারলেও এবিষয়ে কোন তদন্ত না করে অথবা কোন ব্যবস্থা গ্রহন না করে জওহরলাল ঘটনাকে ধামাচাপা দিয়ে কাশ্মীরের শের শেখ আবদুল্লাকে খুশি করেছিলেন। জওহরলাল মেনে নিয়েছিলেন a State within a State. নৈরাজ্যের পথ উন্মুক্ত করে।

এই সেই চশমাশাহী যার সামনে দাঁড়িয়ে বাঙ্গালী ভ্রমনকারীরা স্তব্ধ হয়ে স্মরণ করে সেই অপমৃত্যুকে যা চিরকালের জন্য কলঙ্ক লেপন করেছে ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসকে।

রেঙ্গুন শহরের সংসদভবনে বর্মার মানুষ সেই আততায়ীর হদিস করতে না পারলেও এর পেছনে কোন অদৃশ্যশক্তি কাজ করেছিল তা জানতে বাকি ছিল না, তারা যে হলঘরে আউঙ্গসান নিহত হয়েছিলেন সেই হলঘরকে সেই হত্যাকাণ্ডের দিনের মত সাজিয়ে রেখেছে তা নিজের চোখে দেখেছি কিন্তু চশমাশাহীর কোথাও কোন চিহ্ন নেই যা দিয়ে শ্যামাপ্রাসাদের স্মৃতিকে স্মরণ

করা যায়। শ্যামাপ্রাসাদ হিন্দু মৌলবাদী কিন্তু ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের কতজন ভারতীয় আর কতজন পাকিস্তানী সে হিসাবটা জওহরলাল জানতে চাননি। এখন এই সমস্যার সমাধান হয়নি।

ফিরতি পথে জম্মুতে থামতে হল।

ভারত বিখ্যাত তীর্থস্থান বৈষ্ণোদেবীর দর্শন করতে সবাই আগ্রহ প্রকাশ করছিল। ভেরিবলে জাহাঙ্গীরের প্রমোদ উদ্যান যতটা আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল সেই অনুপাতে শতগুণ আগ্রহ ছিল এই দেবী দর্শনের। কিন্তু যে সুরঙ্গপথে কয়েকশত বৎসর আগে এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তৎকালীন হিন্দুরাজারা, তারপর এসেছিল মুসলমান শাসক, তারপর শিখ শাসক, সবার শেষে আবার হিন্দুশাসক। এই শাসক পরিবর্তনেও বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে কোন পরিবর্তন হয়নি। সব সময় বৈষ্ণোদেবী নিজের মহিমায় বিরাজ করছেন।

সবাই যখন মন্দির অভ্যন্তরে।

আমার সামনে একজন সন্ন্যাসী পাথরে হেলান দিয়ে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গেলাম।

সন্ন্যাসীর সাদর আহ্বান, কেয়া বেটা!

তারপর কথোপকথন।

সন্ন্যাসী হিমাচল প্রদেশের বাসিন্দা। বহুকাল আগে এসেছিলেন সংসার ত্যাগ করে এই মন্দির ও দেবী দর্শন করতে। এখানেই শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠান হয়েছেন। কোন নির্দিষ্ট বাসগৃহ নেই, কোন আশ্রম নেই। শীত গ্রীষ্মের সহচর কয়েকখানা মোটা কম্বল, একটা কলণ্ডলু।

জিজ্ঞেস করলাম মহারাজ, আপনি কেন ঘর ছেড়ে বের হয়েছেন?

ওপর আলার নির্দেশ ছিল। তাই বেরিয়ে পড়েছি।

সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছেন কি?

হেসে বলল, না বাবুজি, অত সহজ কাজ নয়। সব ইন্দ্রিয় জয় করে মোটামুটি শান্তিতে আছি।

অতি বিনীতভাবে বললাম, সংসারে বাস করলে কি শান্তিলাভ হয় না?

না বাবুজি। জরুগরু বর্তন কি শান্তি দেয়!

তা ঠিক। তবে সংসার ছাড়ার অর্থ স্বার্থপরতা আর কাপুরুষতা।

নেহি, নেহি, বলে সন্ন্যাসী চিৎকার করে উঠল।

কিছুক্ষণ থেমে বলল, দুনিয়াতে যারা পয়দা হয় তাদের কিসমৎ একেক জনকে একেক পথে নিয়ে যায়। আমরা মুক্তিমার্গ খুঁজতে বেরিয়েছি। ঈশ্বরের নির্দেশে আমি এই পথে এসেছি।

পেয়েছেন কিছু? জীবনে কিছু প্রয়োজন আছে, নইলে এই কম্বল বর্তনের দরকার হত কি!

জিন্দা থাকতে কিছু কিছু সামান দরকার হয়।

সেই সামান পেতেই তো সংসার।

সন্ন্যাসী হঠাৎ চুপ করে গেলেন। আমার সঙ্গে আলোচনার কোন আগ্রহ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে গৃহিণী মন্দির থেকে বেরিয়ে এসেছেন। আমাকে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল, সন্ন্যাস নেবার পথ খুঁজছ বুঝি?

বললাম, আমি তো চিরকাল সন্ন্যাসী। আমার ঘর নেই সংসার আছে। তাতে সং আছে সার নেই, আমার চেয়ে বড় সন্ন্যাসী আছে কি! তবে নিজের মুক্তি চিন্তা করি না স্বার্থপরের মত। প্রথম জীবনে ভারতের মুক্তির চিন্তা করেছি। এখন! যাক্ ওকথা। সাধু সন্ন্যাসী নিয়ে ব্যঙ্গ করতে হয় না। ভারতে বেকার আছে আর আছে পরগাছা। এ দুটোই মনুষ্যসৃষ্ট অভিশাপ, প্রথমটি রাজনীতির অভিশাপ, দ্বিতীয়টি স্বার্থের অভিশাপ। পা চালাও এখনও হোটেলে গেলে কিছু পেটে দেবার সংস্থান হবে।

এই ধরনের কুটকাঞ্চালি অনেকবার হয়েছে নতুনদিদির সঙ্গে।

কখনও মনে হয়েছে উনি আধুনিকা।

কখনও মনে হয়েছে রক্ষণশীলা।

মাদ্রাজে এসে নতুনদিকে বলেছিলাম, আর্য সভ্যতার ওপর আরবীয় সভ্যতা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল উত্তর ভারতে।

পরবর্তীকালে এই সংমিশ্রণই বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা বলতেই নতুনদিদি বললেন, দৃষ্টান্ত দিতে পার।

নিশ্চয়ই। দেবনগরী অক্ষর ব্যবহার হয়েছে সমগ্র ভারতে, দেবনগরীর বিভিন্ন রূপ আমরা দেখেছি বিদেশীদের আগমনের পরেও। সিন্ধুতে হিন্দু মুসলমান সবাই আরবি অক্ষর ব্যবহার করে, কাশ্মীরেও আরবি অক্ষর ব্যবহার করা হয়, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাবের বিভিন্ন অংশে যে উর্দু ব্যবহার করা হয় তারও অক্ষর আরবি। আমরা এগুলো অস্বীকার করতে পারি না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষার লিপি আলাদা হলেও প্রত্যেক ভাষাতেই অ আ, ক-খ শব্দ রয়েছে, এগুলোর লিপি আলাদা হলেও মূলত শব্দগুলি সবই ভারতীয়। আবার যারা আরবি হরফ গ্রহণ করেছে তাদের বর্ণমালায় আলেক-বে, পে-তে ইত্যাদি রয়েছে।

নতুনদিদি হেসে বলল, এগুলো আমরা নানা ভাবে নানা রাজ্যে গ্রহণ করেছি। এটাই তো সংস্কৃতির লক্ষণ।

বললাম, আমার একজন সহপাঠী ছিলেন নওসের আলি। নওসের বাংলা-দেশ হাসিল হবার পর আমাকে চিঠি দিয়ে নেমন্তন্ন করেছিল তার কাছে যেতে। চিঠিতে আবেগ আর আন্তরিকতার কোন অভাব ছিল না। একদিন গুটি গুটি পায়ে পাশপোর্ট হাতে করে নওসেরের দরজায় হাজির হতেই ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

একটি অমূল্য শব্দ বের হয়েছিল তার মুখ থেকে, কতদিন পরে!

বহুদিন বহুবৎসর কেটে গেছে যাযাবর বৃত্তি করে, কখনও সময় পাইনি তার মত অতি সুহৃদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার। আমি যেন একটা অপার্থিব বস্তু যাকে নানাভাবে তোষণ করার জন্য সে যেন তার খাজানাচি খানার সঙ্গে মনের দরজা খুলে দিয়েছিল। নওসের যেন হারিয়ে যাওয়া মেঘঢাকা চাঁদকে হাতে পেয়ে উল্লসিত।

একদিন বলল এই শহর হল এই রাজ্যের রাজধানী।

তারপর।

তারপর এখানে অনেক কিছু আছে দেখার। সেগুলো দেখতে যাবি তো?

সময় পাব কি?

সময় করতে হবে।

বিকেলবেলায় নওসেরের মেয়ে আজিজাকে সঙ্গে নিয়ে আমি আর নওসের গেলাম কাটরার দিকে। নওসেরের মেয়ে আজিজা হাস্যময়ী তরুণী। শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ একটি বাঙ্গালী মেয়ে বলা যায়, বাঙ্গলার সনাতন একটি নারীমূর্তি।

ছোট কাটরার প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে একটা সমাধি দেখিয়ে আজিজা বলল, চাচাজি শায়েস্তা খাঁর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন, যার সুবেদারিতে বাঙ্গলায় টাকায় আট মণ চাল পাওয়া যেত। সেই শায়েস্তা খাঁ।

বললাম, শুনেছি। এই শায়েস্তা খাঁকে শিবাজী শায়েস্তা করেছিলেন। তার জওয়ান ছেলেকে ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিয়ে শায়েস্তা পালিয়ে ছিলেন। বাদশাহ শায়েস্তা খাঁকে তারপরই বাংলার সুবেদার করে পাঠিয়ে ছিলেন। যখন টাকায় আট মণ চাল ছিল তখন মানুষের গড় উপার্জন ছিল আট আনা।

সেই শায়েস্তা খাঁর অতি পেয়ারের মেয়ে চম্পাবিবির মাজার এটা। কেউ বলে চম্পাবিবি শায়েস্তা খাঁর মেয়ে কেউ বলে তার বোন। আমরাও বিভ্রান্ত কন্যা আর ভগ্নীকে আলাদা করে চেনার জন্য কেউ কোন চিহ্ন রেখে যায়নি। লোক মুখে শুনে শুনে আমরা যার যেমন ইচ্ছা তা বলে থাকি। ভালবাসার পাত্র-পাত্রীকে সে দিনের মানুষ যথাযথ মর্যাদা দিতে পারেনি। সামান্য সত্যকেও স্মৃতি চিহ্ন দিয়ে বেঁধে রাখতে পারেনি।

আমার দৃষ্টি তখন বুড়িগঙ্গার দিকে। অন্যমনস্ক ভাবে বললাম, হুঁ।

কি দেখছেন?

নদী।

নদীতে কতকগুলো নৌকা আর স্টিমার বিনা আর কি আছে! চলুন ওপারে যাই। ওপারে জিনজিরার প্রাসাদ বা কেল্লা আছে অবশ্য ভগ্নদশা তার। বাংলার সেকালের সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর ওটা ছিল বিলাসভবন। নবাবী আমলে ওটাই হয়েছিল কারাগার।

কারাগার? কেন?

সেটাই দেখে আসি। মীরজাফর বাংলার নবাব। সব ক্ষমতা তখন তার পুত্র মীরণের কুক্ষিগত। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার হতভাগ্য নবাব সিরাজদৌল্লার

মা-মাসী আর কন্যা সহ স্ত্রীকে ইংরেজের নির্দেশে ওখানে বন্দী করে রাখা হয়েছিল। জিনজির মানে শেকল। অর্থাৎ বন্দীর জন্য শেকল। তাই ওই প্রাসাদ তথা কেল্লার নাম জিনজিরা কেল্লা। আমাদের কাছে ওই কেল্লা তীর্থস্থান, বুঝলেন চাচাজি।

ভাবছিলাম, মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকা অনেকটা পথ।

বন্দী করে রেখেও শান্তিতে বাস করতে পারছিল না মীরজাফর আর ইংরেজ। সিরাজ বনিতা লুৎফা ও কন্যা জহরতুন্নেসাকে বাদ দিয়ে আলিবর্দী পরিবারের সবাইকে বুড়িগঙ্গার জলে ডুবিয়ে হত্যা করেছিল মীরজাফর।

ইতিহাস কি ক্ষমা করেছে এইসব অন্যায়কারীদের।

জয়চাঁদ ডেকে এনেছিল মহম্মদ ঘোরিকে। পৃথ্বীরাজকে হত্যা করে ঘোরি জয়চাঁদকেও হত্যা করেছিল। লাহোরের শাসক ডেকে এনেছিল বাবরকে, বাবর ইব্রাহিম লোদিকে হত্যা করে কাজ শেষ করেনি লাহোরের শাসক দৌলত খাঁ লোদিকেও পর্যুদস্ত করেছিল। মীরজাফর ডেকে এনেছিল ইংরেজকে। সিরাজকে উৎখাত করে থেমে যায়নি ইংরেজ, তারা মীরজাফর ও তার উত্তর পুরুষদের পরাধীন জীবন যাপন করতে বাধ্য করেছিল। আর মীরণ? তাকে হত্যা করেছিল মীরকাশিমের অনুচররা রাজমহলের নারকোল বনে।

আমার কথা শুনে আজিজা বলল, যার শেষ ভাল তার সব ভাল। এদের কারও পরিণতি ভাল হয়নি চাচাজি।

আমি কেমন সন্দেহাবিষ্টভাবে বললাম, ওপারটা নিরাপদ কি?

নিরাপত্তা কোথায় আছে বলুন। আমরা মনে করতাম, পাকিস্তান হল মুসলমানদের বেহেস্ত। কার্যকালে দেখলাম, ইংরেজ শাসনের পরিবর্তে খানদের শাসন ঘাড়ে চেপেছে। পাকিস্তানের অধিবাসীর গরিষ্ঠ সংখ্যক হল বাঙ্গালী অথচ লঘিষ্ঠ পানজাবীরা কেবলমাত্র হাতিয়ারের জোরে অপশাসন চাপিয়ে দিয়েছে আমাদের ওপর। কোথায় ছিল নিরাপত্তার প্রশ্ন? আমরা অত্যাচারিত, পর্যুদস্ত, ধর্ষিত, লাঞ্ছিত এবং শোষিত! এই শাসকদের প্রতিটি রক্ত বিন্দুতে ছিল ব্যক্তিগত লাভ লোকসানের হিসাব। এতকাল মোগল পাঠানের ঐতিহ্য বজায় রেখে নিজেদের মধ্যে হানাহানি করেছে ক্ষমতা হস্তগত করতে। গণতন্ত্রবাদের কেতাবে কেউ লেখেনি, এরা স্বৈরাচারি, নৃশংস ও ভয়ঙ্কর শোষক নয়। অবশ্য মুক্তি পেয়েছি শ্বেতকায় ইংরেজ শাসকদের হাত থেকে এবং কৃষ্ণকায় খান শাসকদের হাত থেকেও। এবার নসীবের খেলা দেখবার অপেক্ষায় আছি। আমাদের এই মুক্তির জন্য কত মূল্য দিতে হয়েছে তা তো জানেন। কত বিপদ-বিঘ্ন কাটিয়ে আমরা এগিয়েছি তা কারও অজানা নেই। তবুও নিরাপদ একথা বলতে পারছি না। আপদ নিয়ে আমরা চলেছি।

জিনজিরার কেল্লায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি নওসেরের বাড়ি থাকার কালে। ফিরে আসতে হয়েছিল একটা ব্যথাতুর মন নিয়ে।

আজিজা তো আমার মেয়েও হতে পারত। তার ভবিষ্যত গড়ে দেবার

দায়িত্ব আমাকেও নিতে হতে পারত। যা হয়নি, হবে না, তা ভেবে কাজ কি?

বিদায় দেবার সময় নওসের কেঁদেছিল।

আজিজা অভিমান করে আমার সামনে আসেনি।

শেষ কথা নওসেরের, আবার আসিস ভাই।

তোরাও যাস। তোদের জন্য অপেক্ষা করব।

সেই সন্ন্যাসীকে বলেছিলাম, আপনি অত্যধিক স্বার্থপর।

কাহে?

যে নিজের জন্য মোক্ষলাভের পথ খোঁজে সে স্বার্থপর বিনা আর কি হতে পারে। উপরন্তু আপনি কাপুরুষ। সংসারের দায় বহন করার ভয়ে আপনি বেড়াচ্ছেন সন্ন্যাসীর ভেক ধরে। মহারাজ, ঘরে ফিরে যান। আপনার মা-বোন সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।

নেহি।

এরকম অনীহা যারা ব্যক্ত করে তাদের আমি করুণার পাত্র মনে করি।

অথচ প্রভা, কা-ক্কি, এরামা, চাখলি এরা আমার কাছে প্রতিষ্ঠিত নারী। যারা সমাজের অন্যায়কে সহ্য করতে না পেরে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, এরা অতি সামান্য হলেও অনেক বেশি মর্যাদার দাবীদার। এরা ভীরুর মত পালিয়ে বেড়ায়নি।

মাদ্রাজ এসেই নতুনদিদি প্রিয়জন হারানোর ব্যথা নানাভাবে প্রকাশ করতে থাকেন। বার বার বলতে থাকেন, ভাই তুমি ফিরে গিয়ে সংসার সাজাও। হেসে বলেছিলাম, সাজানো সংসার আমার শুকিয়ে গেছে নতুনদি। অনাদর, অশ্রদ্ধা আর অবহেলা নিয়ে মানুষ কতদিন চলতে পারে। লড়াই করার তো একটা সীমা আছে।

নতুনদি অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, নতুনদি, মাদ্রাজ ও উপকণ্ঠ ঘুরে দেখেছেন কি?

না, এবার দেখব। তুমি থাকবে তো ভাই?

দেখবার তো অনেক কিছুই থাকে, সময় থাকে না দেখবার। এর আগে ইংরেজদের কেল্লা দেখে গেছি। মাদ্রাজের সেই দুর্গ বর্তমানে তামিলনাড়ু সরকারের মহাকরণ। সেদিনের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ আজ সচিবালয়।

কারণ, মাদ্রাজের সামরিক গুরুত্ব কমে গেছে। কলকাতার সামরিক গুরুত্ব আছে বলেই এখনও ফোর্ট উইলিয়ম সুরক্ষিত।

কিন্তু গঠন প্রণালী এক। কলকাতায় যেমন মাটির পাহাড় তৈরি করে তার পেছনে কেল্লা, তেমনি মাটির পাহাড়ের পেছনে মাদ্রাজের দুর্গ। মাটির পাহাড় তৈরি করে ইংরেজদের সর্বপ্রথম সুরক্ষিত দুর্গ ছিল কলকাতায়। তখন তো আকাশ পথে হামলা হত না। সোজা কামান দাগালে দুর্গকে আঘাত

যাতে শত্রুরা করতে না পারে সেজন্য এইভাবে কেল্লা তৈরি করতে হয়েছিল।

বর্তমান মাদ্রাজ হল আন্নাদুরাইয়ের মাদ্রাজ।

তার প্রতিষ্ঠিত দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগাম প্রশাসন পরিচালনা করেছে কিছুকাল। তারপর বিভাগ। এখন আন্নাদুরাইয়ের অল ইণ্ডিয়া দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগাম প্রশাসনের শীর্ষে। তামিল ছায়াছবির হিরো রামচন্দ্রন এই দেশকে পরিচালনা করতেন। রামচন্দ্রন দেহত্যাগ করার পরই আবার আরম্ভ হয়েছিল দল বিভাজন। একদল রামচন্দ্রের বিধবা জানকীকে সামনে রেখে ক্ষমতা দখল করতে চেষ্টা করেছিল, অপর দিকে রামচন্দ্রের অতি স্নেহ-ভাজন অভিনেত্রী জয়ললিতাকে ক্ষমতায় বসাতে সচেষ্ট হয় গরিষ্ঠ দল। শেষ পর্যন্ত জয়ললিতার জয় হয়েছে। সেই পরিচালনা করছে প্রশাসন।

বিকেলবেলায় আন্নাদুরাইয়ের সমাধিক্ষেত্রে বহুক্ষণ কাটিয়ে ফিরে এলাম।

নতুনদি জিজ্ঞাসা করলেন, কি দেখলে ?

আন্নাদুরাইয়ের সমাধি। সুন্দর একটি উদ্যানে শুয়ে রয়েছেন আন্নাদুরাই, দ্রাবিড়শ্রেণীর জাগরণের নেতা। তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে আন্নাদুরাইয়ের আবির্ভাব হঠাৎ ঘটেনি। তামিল সমাজে জাতপাত ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপক, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য উচ্চবর্ণের মানুষের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে উঠেছিল দেশের নিম্নস্তরের আপামর জনসাধারণ। সরকারের উঁচুপদগুলো যেমন তারা দখল করে রেখেছিল, তেমনি নিম্নবর্ণের প্রতি অনাদর অশ্রদ্ধা জানাতে ত্রুটি করেনি। বিশেষ করে দেবস্থানে প্রবেশ করার পথ আজও অনেক মন্দিরে উচ্চবর্ণের দয়ার ওপর নির্ভর করে। আন্নাদুরাই ছিলেন এই অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদের নেতা। উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতে উচ্চবর্ণের অনাচার বেশি। বর্তমান যুগেও অত্যাচারিত নিম্নবর্ণের দুইটি গ্রামের সব মানুষ পাইকারী হারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে উচ্চবর্ণের অত্যাচার থেকে নিস্কৃতি পেতে।

তামিলনাড়ুর ভূমি ব্যবস্থা আরও বেশি দুঃখ দুর্দশা ডেকে এনেছে নিম্ন-বর্ণের দরিদ্র মানুষদের। তামিল বেপরোয়া যুবক ও তরুণরা দেশছেড়ে ছুটে বেরিয়েছে। উপনিবেশ স্থাপন করেছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে। তারা গেছে জাভায়, সুমাত্রায়, মালয়ে, বর্মায়, কম্বোজ ও চম্পায়। সেখানে তারা গড়ে তুলছিল নতুন উপনিবেশ। কালক্রমে তারা স্থানীয় জনগণের সামিল হয়ে থেকেও ঐ সব দেশে আজও ভারতীয় সভ্যতার রমরমা রক্ষা করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তামিলরাই বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতিকে নানা দেশে বহন করেছে, বহন করেছে হিন্দু তথা আর্য সভ্যতার পতাকা। বরবুদুর ও অঙ্গরভাটে আজও অনেক কীর্তি জ্বলজ্বল করছে। শ্রীলঙ্কার তামিলরা উপনিবেশ স্থাপন করলেও তারা সিংহলীদের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি। সেখানে স্থায়ী দ্বন্দ্বের পথ খুলে রেখেছে তামিল ও সিংহলীরা।

তামিলজাতির ইতিহাস, কেবলমাত্র তামিল কেন, অন্ধ্র, কেরল ও

কর্ণাটকের অতীত ইতিহাস গৌরবাজ্জ্বল। উত্তর ভারত আর দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে অতীতের যোগসূত্র ছিল ধর্মের বন্ধনে। বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটলে আর্য সভ্যতা গোটা দক্ষিণ ভারতে প্রসার লাভ করে। দক্ষিণ ভারতের মন্দির, মঠ, দেবস্থান মনে করিয়ে দেয় আর্যসভ্যতার গৌরবের কথা আর তৎকালীন দক্ষিণ ভারতে ছিল শান্তির পরিবেশ। শান্তির পরিবেশ না থাকলে পৃথিবীর সর্বোচ্চ মন্দির মাদুরাইতে গোপুরম নির্মাণ সম্ভব হত না।

ভাবতে ভাবতে থমকে গেলাম।

ফুটপাতে যারা ছাউনী করে থাকে তারা কারা?

কলকাতা বা পশ্চিমবাংলার বড় বড় শহরে যে সমস্যা, ভূমিহীন দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের ভিড়, সে সমস্যা রয়েছে তামিলনাড়ুতে। যেমনটা দেখেছি অন্ধ্র অর্থাৎ দারিদ্রের ভয়ঙ্কর অভিশাপ মুক্ত নয় ভারতের কোন অংশই। বিহার আর অন্ধ্র বর্তমানে সবচেয়ে গরীব রাজ্য।

দিল্লির যমুনার দুই কিনারায় অসংখ্য ঝুপড়ি যে সঙ্কেত বহন করে সেই সঙ্কেত ভারতের সর্বত্র। ভারতের বড় বড় শহর হল যাযাবরদের আস্তানা। সর্বাধিক হল দিল্লিতে। দিল্লি ও নতুন দিল্লির শতকরা আশীজন হল বহিরাগত। তারপরই বোম্বে। কলকাতার স্থান তৃতীয়। চতুর্থ স্থানে মাদ্রাজ।

দারিদ্র সবাইকে ঘরছাড়া করেছে সত্য কিন্তু যারা শহরে পেটের দায়ে আশ্রয় নিয়েছে তাদের পূর্ব পুরুষরা কি সত্যিই ভূমিহীন দরিদ্র ছিল? কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস হল কৃষির ওপর অর্থবানের হৃদয়হীন লোভ—ছোট ও প্রান্তিক চাষীদের গৃহহীন ভূমিহীন করেছে ভূমি লোভীর দল যুগ যুগান্তরের অত্যাচারে। তাদের উত্তর পুরুষরা ছুটে আসছে শহরে আহার্যের সন্ধানে। এদের সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে গেছে। এদের মাটির বন্ধন নেই। নেই জীবনের কোন স্বাদ আহ্লাদ, নেই কোন আদর্শ আছে শুধু ক্ষুধা। এই ক্ষুধা অমানুষ করে তুলছে এই সব মনুষ্য দেহধারীদের।

মানুষ কোথায়?

নতুনদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, মানুষের দেখা পেয়েছ কি ভাই।

ঠিক গুছিয়ে বলতে পারিনি। শুধু বলেছিলাম, মানুষ আছে নতুনদি, মানুষকে অবিশ্বাস করা মহাপাপ, মানুষকে ছোট করে দেখা মহাপাপ।

নতুনদি বলেছিলেন, যারা অবিশ্বাস করে তাদের পাপের পরিমাপ করেছ কি, যারা মানুষকে ছোট না করে বড় করার ব্রত নেয় তারা যখন নতুন বড় হওয়া মানুষের কাছে আঘাত পায় তখন তাকে কি নামে পরিচিত করবে?

আপনি অযৌক্তিক কথা বলেননি নতুনদি। হাজার হাজার বছর আগে যখন মানুষ সম্পদের মোহে মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছিল তখন ব্যক্তি স্বার্থটাই তাদের জীবনে প্রবল হয়ে দেখা দেয়। তারই চরম অবস্থা আমরা আজ দেখতে পাচ্ছি। জানেন নতুনদি, আমাদের ছোটবেলায় একটা মন্ত্র জপতাম, আমরা স্বাধীনতা চাই। এখন এই মন্ত্র জপ করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে

এখন সবাই চায় নিজের স্বার্থ বুঝে নিতে। আদর্শহীন এই মনুষ্য সমাজ সহজেই দুর্নীতিকে আশ্রয় করতে মোটেই পিছ পা হয় না। আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সামনে কোন আদর্শ তুলে ধরতে পারিনি, এর পরিণতিই সমাজকে দুর্নীতির কলঙ্কময় পঙ্কে টেনে নিয়ে চলেছে। তবুও মানুষ আছে, থাকবে মানুষের অভিমান। সেই অভিমান সমৃদ্ধ মানুষকে খুঁজে বের করতে হবে। যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য হাসি মুখে ফাঁসিতে প্রাণ দিয়েছিলেন তাঁদের এই প্রজন্ম ভুলে গেছে। তাদের কথা রাজনীতির ব্যবসাদার ভোট ভিখারিরা ভুলিয়ে দিয়েছে এই সব ত্যাগী মহান চরিত্র যাঁরা ছুটেছিলেন আদর্শকে সম্বল করে। তাঁদের ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়নি। এই মানুষগুলোকে আমরা শ্রদ্ধা করি। ওরাই মনুষ্যত্ববোধকে জাগিয়ে রাখবে যুগ যুগান্তর ধরে।

নতুনদির সঙ্গে ছাড়াছাড়ির সময় আগত।

একদিন দ্বিপ্রহরে সদলে নতুনদি কলকাতা ফেরার গাড়িতে উঠে বসলেন। আমি স্টেশনে দাঁড়িয়ে তাদের বিদায় অভ্যর্থনা জানালাম। গাড়ি ধীরে ধীরে আমার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল। উভয় পক্ষ হাত নেড়ে মনের শেষ চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটালাম। নতুনদি যাবার সময় ঠিকানা দিয়ে বললেন, কলকাতায় গেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে ভুল না যেন ভাই।

আমি মাথা নেড়েছিলাম। হাঁ—না দুটো ইঙ্গিতই ছিল তাতে।

ধীরে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল স্টেশন থেকে বেরিয়ে পথ ধরলাম। অনিশ্চিত পথ। কোথায় যাব তা তখনও স্থির করিনি।

যাবেন বাবু সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে।

রিক্সাওলার আহ্বানে সম্বিত ফিরে পেলাম। শহরের মানুষ কিছুটা সম্পন্ন, উপর তলার সমৃদ্ধির কথা বলছি না, নিচের তলার মানুষরাও একেবারে নিরন্ন নয়। বিশেষ করে মৎস্যজীবিরা পেটের ভাত সংগ্রহ করে থাকে বিপদ মাথায় নিয়ে সাধ্যাতীত পরিশ্রম করে। উড়িষ্যার উপকূলে এই মৎস্যজীবি সম্প্রদায় খাস উড়িষ্যার বাসিন্দা নয়। এদের অধিকাংশই তেলেগুভাষী অন্ধ্রপ্রদেশের অধিবাসী। কলকাতার পথে ঘাটে উড়িষ্যার বহু শ্রমিককে আমরা দেখতে পাই, অথচ উড়িষ্যার বড় বড় শহরের শ্রমিক শ্রেণীর অধিকাংশই অন্ধ্রের বাসিন্দা। এদেরই অংশ বিশেষ নুলিয়া।

নন্দনকানন দেখতে যাবেন বাবু ?

জবাব দিলাম না।

নন্দনকানন হল উড়িষ্যার নতুন সৃষ্টি। অতীত গৌরব লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারক সূর্য মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির যেমন দর্শকদের আকর্ষণ করে ততোধিক আকর্ষণ করে নন্দনকানন।

নন্দনকানন সিংহ ও ব্যাঘ্রের অভয়ারণ্য।

বাসের যাত্রী সবাই নন্দনকানন দর্শনার্থী।

নন্দনকাননের প্রবেশপথে জানা গেল অভয়ারণ্য তথা সাফারিতে যাবার বিশেষ ব্যবস্থা করে থাকে উড়িষ্যা সরকার।

উড়িষ্যার সব সৌন্দর্যকে হার মানিয়েছে নন্দনকাননের সাদা বাঘ।

সাদা বাঘটা কেমন সুন্দর তার তিনটে বাচ্চা নিয়ে খেলা করছে।

দেখুন, দেখুন। সিংহীটা একেবারে আমাদের গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে কটমট করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।—আবেগের সঙ্গে বলছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। কেউ ভীত নয়।

প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে এত নিকট থেকে ভয়ঙ্কর বন্য প্রাণী দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়। সবাই উৎসাহিত কিন্তু নিরাপদ গাড়ির লোহার শিকের বাইরে কেউ হাত বাড়াতে সাহস পাচ্ছে না। এত কাছে বাঘ সিংহ! এযেন কল্পনাতীত। সার্কাসের বাঘ সিংহ নয়। সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক পরিবেশের বাঘ সিংহ! বন্যরা বনে সুন্দর! সত্যিই এই সুন্দর জীবনকে উপদ্রবহীন করে রেখেছে সরকারী ব্যবস্থা। এতগুলো সাদা বাঘ এক সঙ্গে চোখের সামনে ঘুরে বেড়াতে দেখা কম ভাগ্যের কথা নয়। বাঘের সাফারি আর সিংহের সাফারি আলাদা। এক সাফারিতে রাখলে এরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করার সম্ভাবনা নেহাৎ কম নয়। উভয়েই হিংস্র এবং বৈরি ভাবাপন্ন। বিশ্বাস নেই।

কি দেখলেন?

বাঘ আর সিংহ।

আর কিছু দেখেননি?

দেখলাম বাঘিনী মা তার সন্তানদের আদর করছে। মনে হল পৃথিবীর সব মা তার সন্তানকে একইভাবে আদর করে, সে মা বন্য পশু হোক আর গৃহস্থ মানুষই হোক। মাতৃত্ব চিরন্তন আর বিশ্বব্যাপী, সেই মাকে দেখলাম।

সিংহ তুলনামূলক ভাবে শান্ত।

যাত্রীরা তাদের কথা শেষ করার আগেই সরকারী গাড়ি সাফারির গেট পেরিয়ে খোলা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

আমিও একদিন দাঁড়িয়েছিলাম একটা আতঙ্ক নিয়ে।

দিলরুবার বয়স তখন তিন অথবা চার। শক্ত পায়ে তখনও হাঁটতে শেখেনি। দুলতে দুলতে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। আমি মুখ তুলতেই আধো আধো ভাষায় বলল, বাগ্। বোন্দু বাগ্।

বাঘ! কোথায়?

উঃ যে। বলে হাত মেলে দেখাল একটা গরুর গাড়ির দিকে।

অবাক কাণ্ড। বাঘ। গরুর গাড়ি! দিলরুবাকে কোলে তুলে নিয়ে

এগিয়ে গেলাম। ইতিমধ্যে থানার সেপাইরা ভিড় করেছে গাড়ির আশেপাশে।

গিয়ে দেখি দুটো গরুর গাড়ি পাশা-পাশি দাঁড় করানো আছে। একটাতে দুটো জওয়ান মরদের লাশ আরেকটাতে বিশালদেহী একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের লাশ। একটু দূরে বসে একটি আদিবাসী মহিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর চোখ মুছছে।

ঘটনাটা জানার ইচ্ছা গোপন করতে না পেরে সিপাই এনায়েত শেখকে বললাম, কি ব্যাপার এনায়েত মিঞা ?

এনায়েত তেইশ চব্বিশ বছরের জওয়ান মরদ। সবে ট্রেনিং শেষ করে পোস্টিং পেয়েছে এই দুর্গম স্থানের থানায়। মনটা এখনও কচি। তার পাঠ্যজীবনের পরিবেশের গন্ধ তার দেহে ও মনে, উপরন্তু আমরা প্রায় সমবয়সী। সেজন্য এনায়েতের বিশেষ দুর্বলতা ছিল আমার সম্বন্ধে। ইংরেজ শাসনকে সে পছন্দ না করলেও বাদশাহী যুগের সুরমা তার চোখে তখনও মোহ সৃষ্টি করে রেখেছিল, মাঝে মাঝে বাদশাহী আমলে ফিরে যাবার খোয়াব দেখত। বর্ধমানের বাসিন্দা এনায়েত প্রবেশিকা পাশ করে এল-সি, অর্থাৎ লিটারেট কনেস্টবলের চাকরি পেয়েছে, আশা করছে কিছুকালের মধ্যেই জমাদার অর্থাৎ এ-এস-আই হতে পারবে। সময় পেলেই এনায়েত আমার কাছে এসে বসত। সবাই তাকে সন্দেহ করত। এমন কি তহশীলদার মাঝে মাঝে বলত, এনায়েত আই-বি-র লোক। আপনার সঙ্গে মেলামেশা করে গোপন খবর সংগ্রহ করতে।

তহশীলদারের আশঙ্কা অযৌক্তিক নয় কিন্তু আমি এনায়েতকে অবিশ্বাস করিনি। এমন কিছু সে করেনি যাতে তাকে অবিশ্বাস করা যায়। এনায়েত তার গ্রামের গল্প করত, তার বাবা মায়ের গল্প করত। তার বাবা ছোট হিন্দু জমিদারের নন্দীর কাজ করে, আর বলত সেই ছোট হিন্দু জমিদারই তার পড়ার খরচ বহন না করলে সে প্রবেশিকা পাশ করতে পারত না। আজও তার বাবা হিন্দু জমিদারের নন্দীর কাজে ইস্তফা দেয়নি, এখনও লাঠিবাজি করে মনিবের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে।

এনায়েত কোনদিন কোন সময়ই একবারও আমার বিষয়ে আগ্রহ দেখায়নি। বিবিসাহেবা যেদিন থেকে মাতৃস্নেহে আমার ভালমন্দ দেখাশোনা করতে আরম্ভ করেন সেই সময় থেকেই এনায়েত হয়ে উঠেছিল আমার একান্ত আপন। আমার প্রত্যেকটি প্রয়োজন মেটাতে এসে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকত।

আমার প্রশ্নে এনায়েত হেসে এগিয়ে এল।

বললাম, হাসছ কেন ?

হাসছি কেন! শুনুন।

এনায়েত যা বলল তার গলিতার্থ হল: পাহাড়ের ঢালে অনেক খাটাল আছে। খাটালগুলোর কোনটা এই জেলায় কোনটা ভুটানে। এই লাশ দুটো নেপালী দাজুর। আর ওই কানছিটা ওদের বউ। খাটালে ওরা গোপালন করে। বাঁশের মোটা বেড়া দিয়ে খড়ের ছাউনিতে গরু রাখে রাতের বেলায়।

পাশের কুপড়িতে থাকে ওই দুটো নেপালী যুবক আর তাদের স্ত্রী ওই কান্‌ছি।

গত রাতে এই বাঘটা কোনক্রমে ঢুকে পড়েছিল খাটালে।

বাঘ ঢুকতেই খাটালের গরুগুলো লাফালাফি চিৎকার করতে থাকে। এই নেপালী দুজন সহোদর ভাই আর কান্‌ছি ওদের দুজনের স্ত্রী। নেপালী দুজন বেরিয়ে এল কুপড়ি থেকে, পেছন পেছন কান্‌ছি বের হল একটা তেলের কুপি হাতে করে। ছোটভাইটা খাটালের ঝাঁপ খুলে নজর না দেওয়া মাত্র শোনা গেল তার আর্ত চিৎকার, অপর ভাই তখন হতভম্বের মত এগিয়ে গেল চিৎকার শুনে। এবারও শোনা গেল আর্ত চিৎকার। কান্‌ছি তেলের কুপির আলোতে দেখতে পেল বাঘটাকে, সে তাড়াতাড়ি খাটালের ঝাঁপটা ভাল করে বন্ধ করে ছুটে গেল ফরেস্ট গার্ডের আস্তানায়।

ফরেস্ট গার্ডদের বন্দুক থাকে আর থাকে হরিণ মারার মত পাঁচ ছয়টা কার্টিজ। বাঘ অথবা হাতি তাড়াতে ওরা বন্দুকের আওয়াজ করে। ওই যে লোকটা বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে, ওই হল ফরেস্ট গার্ড। কাল ওর কাছে ছিল মাত্র একটা কার্টিজ। একটা কার্টিজের ভরসায় বাঘ মারতে যাওয়া বাতুলতা তবুও সাহস করে গার্ড কান্‌ছির পেছন পেছন গেল। বাঘ তখন খাটালে আটক। মনের সুখে মাংস ও হাড় চিবোচ্ছে। গার্ড অতি সন্তর্পণে খড়ের চালে উঠে, চাল ফুটো করে বাঘের মাথা বরাবর বন্দুকের নলটা এগিয়ে দিল ট্রিগার টেনে। বাঘও সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চিৎকার করে লাফ দিয়েছিল। আর গার্ড ভয়ের চোটে গড়াতে গড়াতে খড়ের চাল থেকে মাটিতে। ওরও হাত-পা জখম হয়েছে।

সকালবেলায় কান্‌ছি খাটালে উঁকি মেরে দেখল তার দুই পতি দেবতা আর বাঘ পুঙ্গব পাশাপাশি শুয়ে। কারও প্রাণের স্পন্দন নেই। তিনজনই পরলোকের চিন্তায় চিরনিদ্রায়।

কথা শেষ করে এনায়েত বলল, এরা আপনাদের দ্রৌপদী। দু-তিন ভাই মিলে একটি মেয়েকে বিয়ে করা এদের সমাজ ব্যবস্থা। এক সঙ্গে দুটো স্বামী হারানোর ব্যথা খুবই কিন্তু আমি হাসছিলাম শিকার ও শিকারীর দুরবস্থা দেখে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে এনায়েতের কথা শুনছিলাম। বিবিসাহেবার ডাক শুনে দিলরুবা আমার কোল থেকে নেমে থানার মাঠে ছুটে গেল।

অনেক বাঘ দেখেছি ছোটবেলায় তবে সে সব বন্দী বাঘ, চিড়িয়াখানার বাঘ

আমার বন্ধু সেকেন্দার ভাল শিকারী বলে আমাদের অঞ্চলে খ্যাত।

সেকেন্দার মাঝে মাঝে চিতা বাঘ মেরে আনত কাছের কোন জঙ্গল থেকে কোন গ্রামে চিতা বাঘের উৎপাত হলে সেকেন্দারকে খবর দিত। সেকেন্দার সঙ্গে সঙ্গে শিকারীর পোশাক পড়ে বন্দুক আর খুব একটা ধারাল ছোরা সঙ্গে একবেল্ট কার্টিজ নিয়ে রওনা হত চিতা শিকারে।

আমিই দেখেছি তাকে তিন চারটে চিতা মেরে আনতে।

বলতাম, হাঁরে সেকেন্দার, চিতা বাঘ বড় দুষ্ট বাঘ। রয়েল বেঙ্গলের চেয়ে জোরে দৌড়তে পারে, আর যে কোন গাছে সর্‌-সর্‌ করে উঠতে পারে। তুই সাবধানে কাজ করিস তো ?

সেকেন্দার গাছের ওপর বসে শিকার করত। বলত জানিস, চিতা গাছে উঠলে তার জন্য এই ছোরা কাজ করবে। তবে চিতা এত জোরে ছোটে যে বন্দুকের নিশানা ঠিক করা অনেক সময়ই কষ্ট হয়। তবে আমিও ইউসুফজাহী পাঠান, আমার নিশানা খুবই কম ভ্রষ্ট হয়।

এসব পুরানো কথা।

আজ বাঘের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, বনের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করতেই রয়েল বেঙ্গল টাইগার বিধাতার সৃষ্টি। এমন ডোরাকাটা মখমলের মত নরম দেহ বাঘই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে। এদের বিনাশ ঘটলে প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাবে, প্রাণীজগৎ হারাবে এমন একটি সম্পদ যার কোন পরিপূরক পাওয়া যাবে না।

প্রায় দশ এগার ফুট লম্বা বাঘের লাশের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখলাম। গার্ডের গুলিটা বাঘটার মাথা টুকরো টুকরো করে দিয়েছে।

প্রাকৃতিক স্বাভাবিক পরিবেশে বাঘকে কখনও দেখিনি। পরবর্তী কালে নন্দনকাননে সাদা বাঘ দেখলাম। কালো ডোরাকাটা হলুদ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে খাঁচায় দেখেছি। সেদিন থানার সামনে যে বাঘ দেখেছিলাম সেটা মৃত বাঘ। গতকালও এই বাঘ বনে ঘুরে বেড়িয়েছে আহারের সন্ধানে। আহার্য পেয়েছে। পাওয়াই তার মৃত্যু ডেকে এনেছে। বাঘিনী নয় বাঘ। বাঘিনী খুবই ধূর্ত কিন্তু বাঘ ধূর্ততায় বাঘিনীর চেয়ে ন্যূন। সে কারণে এই বাঘটা পালাবার চেষ্টা না করে মরণের সামনে নিজেকে এগিয়ে দিয়েছিল।

বাঘের সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করা যায় না। মরা বাঘের গায়ে হাত বুলিয়ে তার দৈহিক সৌন্দর্যটা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে উপলব্ধির চেষ্টা করছিলাম। এনায়েত আলি বাধা দিয়ে বলল, চলুন দাদা, কি উৎকট গন্ধ। এখানে দাঁড়ান যাচ্ছে না।

বললাম, তা ঠিক। কিন্তু বাঘটাকে ছেড়ে যেতে মন চাইছে না এনায়েত। এমন নিবীড়ভাবে বাঘটাকে দেখা আর কখনও সম্ভব হবে না।

এনায়েত কোন কথা না বলে আমার সার্টের হাত ধরে টান দিয়ে বলল, চলুন, বিবিসাহেবা চিন্তা করছে। আপনাকে না খাইয়ে উনি পাণিটুকুও মুখে দেবেন না। কতদিন দেখেছি বিবিসাহেবা আপনার জন্য প্রতীক্ষা করেছেন। আপনার খাওয়া হলেই উনি খেতে বসেছেন।

বিবিসাহেবার এই উদার হৃদয়ের কথা কোনদিনই ভুলব না। নতুনদিদিকে বার বার বিবিসাহেবার কথা বলেছি। কালস্রোতে কোথায় ভেসে গেছেন কাজিসাহেব ও তাঁর বিবি, কোথায় কার ঘর আলো করছে

দিলরুবা, সবই স্বপ্নের মত মনে হয় আর নিজেকে হারিয়ে ফেলি সাময়িকভাবে।

নন্দনকাননের খোলামেলা আকাশের তলায় প্রকৃতির স্বাভাবিক পরিবেশে বাঘ সিংহকে দেখে পেছনে তাকাতে হয়েছে। বাঘ, বাঘ, বাঘ! সিংহ, সিংহ, সিংহ! প্রকৃতির সৌন্দর্য তো এরাই বহন করে আসছে আদিম কাল থেকে।

আরও গভীর ভাবে যখন প্রকৃতিকে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলাম চিল্কাহ্রদের পাখীর অভায়ারণ্যে গিয়ে, হাজার হাজার পাখীর নিরাপদ বিহার দেখে। লঞ্চ থেকে পাখীর অবস্থান দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, মানুষ মাটির ওপর নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যত নিষ্ঠুর তত নিষ্ঠুর হতে পারে না যদি পশুপক্ষী হত্যা করার আদিম প্রবৃত্তি জয় করতে পারে। আদিম যুগে পশুপক্ষীর মাংস ছিল একমাত্র আহার্য, সে সময় মানুষ হয়েছিল ঘাতক সেই বৃত্তি ধীরে ধীরে লোপ পেতে থাকে কৃষি আবিষ্কারের পর। কৃষি ও বাসস্থান গড়ে তুলতে মানুষকে কম নিষ্ঠুর হতে হয়নি। বন কেটে আবাদ বাসস্থান গড়ার আদিম লিপ্সা আজও মানব সমাজে রয়েছে। তবুও মানুষ পশুপক্ষী প্রেমী, বৃক্ষপ্রেমী। অনুপাত কম হলেও অগ্রাহ্য করার মত নয়। চিল্কার পাখীর আলয় মনুষ্য হৃদয়ের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও সৌন্দর্যবোধের বহিঃপ্রকাশ।

তিন দিক পাহাড় ঘেরা বঙ্গোপসাগরের খাড়ি এই চিল্কা হ্রদ।

লঞ্চে বসেই মনে হল তিনদিকের পাহাড়গুলো যেন আকাশকে চুম্বন করছে। প্রেমিক-প্রেমিকা মহামিলনের অপেক্ষায় পরস্পরের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে।

উড়িষ্যা মন্দিরময় রাজ্য।

চিল্কার কিনারায় পাহাড়ের গায়ে মন্দিরের অভাব নেই। লঞ্চে চেপে মন্দির দর্শণ একটা উপভোগ্য পরিক্রমা। উড়িষ্যার আনাচে কানাচে মন্দির, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য বেশি। বেশির ভাগ মন্দিরই শিবের আরাধনা স্থল। ভাবছিলাম বহুকাল মুসলমান লুটেরার শাসনে থেকেও এই সব মন্দিরের অস্তিত্ব বজায় রইল কি করে! সুলতান বাদশাহরা দুর্জন নয়। তাদের স্তাবকরাই হত লুটেরা, কখনও কখনও লুটেরাও সংযত হত।

একটা প্রবাদ আছে, ব্রাহ্মণপুত্র কালাপাহাড় মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে হিন্দু-মন্দির ধ্বংস করার অভিযানে নেমেছিলেন। বাধা পেয়েছিলেন দুটি স্থানে। কালাপাহাড় স্বীকার করেছিলেন, বোদে পাথর জগা কাঠ, আর সব ফুটফাট। বৈদ্যনাথ বিগ্রহ পাথরের শিবলিঙ্গ আর পুরীর নিম কাঠে তৈরি জগন্নাথকে অপবিত্র করতে পারেননি কালাপাহাড়। অবশ্য এসব প্রবাদের কোন সত্যতা আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতের সর্বত্রই দেখেছি দেবতা নির্লোভ কিন্তু পাণ্ডা, পুরোহিত,

ছড়িদার ইত্যাদির লোভের সীমা নেই। একমাত্র নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের মহাদেব যেমন নির্বিকার নির্লোভ তেমনি নির্লোভ বিগ্রহের পুরোহিতরা। যে কোন উপাচার দেবপূজায় কেউ দিলে তা নিবেদন করে পুরোহিত ফেরত দেন ভক্তিমান যজমানকে। এমন কি কোন দক্ষিণাও গ্রহণ করেন না পুরোহিতরা। পৃথিবীতে ধর্মের নামে যে ব্যবসা চলে তা কম বেশি সবাই প্রত্যক্ষ করে থাকেন। মন্দির, পীরের দরগা, রাস্তার দেবতার পায়ে, মাজার, গির্জায় প্রণামী দিতে আমরা অভ্যস্ত কিন্তু নেপালের পশুপতিনাথের মন্দির হল বিরল দৃষ্টান্ত যেখানে দেবতা কোন উৎকোচ গ্রহণ করেন না, পূজারীরা তাদের দক্ষিণাও নেন না। ধর্মীয় অনুভূতিকে কলুষিত করার সুযোগ নেই পশুপতিনাথ মন্দিরে।

নেপালের উৎকট দারিদ্র প্রপীড়িত জনসাধারণের মাঝে এমন আদর্শ যারা স্থাপন করে চলেছেন যুগ যুগান্ত ধরে তারা নিশ্চয়ই নমস্যজন। হয়ত কঠিন রাজকীয় নির্দেশ নির্লোভ করেছে পূজারীদের।

॥ সাত ॥

পথ চলতে সঙ্গীর অভাব হয় না।

অবশ্য সঙ্গী বিচারে ভুল করলে বিভ্রাটও ঘটে।

তবুও কোনদিন বিভ্রাট সৃষ্টিকারী সঙ্গী আমি পাইনি।

আমার সঙ্গী গৌরব।

গৌরবের গৌরব করার মত কোন পরিচয় নেই। সস্ত্রীক বেরিয়েছেন পুরীর জগন্নাথ দর্শণ করতে আর কর্মক্লান্তির অবসান ঘটাতে কয়েকদিন নিরালায় সমুদ্রতীরে অবসর যাপন করতে।

পুরীর সমুদ্র কিনারায় পরিচয়।

আমার সেই পুরানো প্রশ্ন, যার আদি আছে তার অন্ত আছে

কিন্তু পৃথিবী?

নিশ্চয় পৃথিবীর আদি ছিল। তার অন্তও আসবে নিশ্চয়।

যে নেবুলা থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি, সেই নেবুলায় বিস্ফোরণ একদিন ঘটবে সেদিন পৃথিবীর অন্তিম দিন হবে। হাজার হাজার কোটি কোটি বৎসরে যেমন পৃথিবীর সৃষ্টি ও বিবর্তন ঘটেছে, তেমনি মানব সৃষ্টির হাজার হাজার কোটি কোটি বৎসর পর পৃথিবীর ধ্বংস ঘটবে প্রাকৃতিক বিবর্তনের নিয়মে।

সে দিনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। স্বাভাবিক ভাবেই ঘটবে।

পরিচয় সূত্রে গৌরবের সঙ্গে এই কঠিন প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করতে বসে পুরানো দিনের অনেক কথাই মনে পড়ছিল।

কিন্তু সেদিন আমার লক্ষ্য ছিল গৌরবের পুত্র সৌরভের দিকে।

সৌরভ চৌদ্দ-পনের বৎসরের কিশোর।

মা মহামায়া। ভুল বললাম, এই ভুল সংশোধন করেছিল গৌরব। বলেছিল মহামায়া সৌরভের বিমাতা।

বিমাতা!

হ্যাঁ, বিমাতা কিন্তু আমি না বললেও আপনিও বুঝতে পারতেন না। মা আর ছেলের আচার আচরণ থেকে কেউ ভাবতেও পারে না ওদের সম্পর্ক। এগার দিনের সন্তান রেখে সৌরভের মা মারা গেলেন। ভেবে দেখুন সেদিন আমার কি অবস্থা। এই দুর্ঘটনার জন্য আমার বাবা-মার দায়িত্ব কম নয়। তের বছরের কিশোরীর সঙ্গে বাইশ বছরের গৌরব সরকারের বিয়ে দেওয়া যে অনুচিত তা ওঁরা তৎকালে জানতেন না, জানলেও বুঝতেন না। পনর বছর বয়সেই সৌরভের মা দেহত্যাগ করলেন।

কিছুক্ষণ থেমে থেকে গৌরব বলল, আমার প্রেম ভালবাসা বুঝবার বয়স হয়েছিল কিন্তু সৌরভের মায়ের অপুষ্ট অঙ্গে ছিল যৌন তৃষ্ণা, সেখানে প্রেমের আকর্ষণ বোধ করিনি, ভালবাসার সৌধ তৈরি করতে পারিনি, যৌন পরিতৃপ্তির একটি যন্ত্ররূপেই তাকে ব্যবহার করেছি। ফলাফল হয়েছিল খুবই তিক্ত। যাক্, ওসব কথা, আমরা কোনারকের সূর্যমন্দির দেখতে যাব। একটা প্রাইভেট গাড়ি ভাড়া করেছি। আপনি যাবেন দাদা আমাদের সঙ্গে? অবশ্য জোর করছি না।

গুরুতর মনোবিজ্ঞান আলোচনা করতে করতে হঠাৎ কোনারক দর্শনের আমন্ত্রণ কেমন ছন্দপতন ঘটাল, আমিও হঠাৎ উত্তর দিতে পারলাম না।

কি ভাবছেন?

ভাবনার কি শেষ আছে! মনটা তড়িতের চেয়েও ত্বরিতগতিতে ছোটে। দূরকে নিকটে টেনে আনে স্মৃতির গহ্বর থেকে। কোনারক সূর্যমন্দির! বেশ! যেতে আপত্তি নেই। আর কোন সঙ্গী আছেন কি?

আমরা তিনজন।. আপনাকে নিয়ে চারজন। আর দুজন হলেন শ্রীমতী নয়নতারা বিশ্বাস ও তাঁর স্বামী জীবানন্দ।

হেসে বললাম, ওদের সঙ্গে আমার তো পরিচয় নেই, অসুবিধা বোধ করবেন না তো!

মোটেই না। অবশ্য জীবানন্দবাবুও অফিস থেকে ভ্রমণ ভাতা পাবেন, আমিও পাব। একটা গাড়িতে গেলে বিল দেখিয়ে উনিও পুরো টাকা পাবেন, আমিও পাব। অর্থাৎ অর্ধেক ব্যয়ে পুরো ফল প্রাপ্তি, বাকিটা এখানকার হোটেলের ব্যয় সংকুলানে দুজনকেই সাহায্য করবে।

আমি থমকে গেলাম।

গৌরবের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললাম, আপনারাই যান। আমার অসুবিধা আছে ভাই।

কোন অসুবিধা হতে দেব না।

অসুবিধাটা দৈহিক অথবা আর্থিক নয়। অসুবিধাটা মানসিক।

চমকে উঠল গৌরব।

বড় কোম্পানির বড় পদে কাজ করে। আমার কথা বুঝতে বিশেষ বিলম্ব হল না। অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি দুঃখিত। অন্য কোন সঙ্গী নেব না দাদা, আমরা চারজনেই যাব। আমি খুবই দুঃখিত।

বললাম, তাহলে কখন যাবে স্থির করে জানাবে।

এরপর গৌরব আর লাভলোকসানের কথা বলেনি।

পরের দিন।

গৌরব, সৌরভ আর মহামায়ার সঙ্গী হয়ে কোনারকের পথ ধরলাম।

অনেকের কিন্তু উন্নাসিকভাব রয়েছে উৎকলবাসীদের সম্বন্ধে। যেসব উৎকল-বাসীকে আমাদের আশেপাশে দেখে থাকি তাদের অনুসন্ধান করলে একটি বিষয়ে আমরা নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হতে পারি, সেটা হল ভারতীয় ঐতিহ্য। আমরা যতই আমাদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি আর সভ্যতার গর্ব করি না কেন ঘুনে ধরা সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। এই অবক্ষয়িতে সমাজের শিকার ভারতের শতকরা পঞ্চাশজন। কত দরিদ্র, ভূমিহীন, জাতপাতের বিষে জর্জরিত ও শোষিত বিহার, অন্ধ্র, বাংলা ইত্যাদির অধিবাসীরা যেমন ঘর ছাড়া হয়ে পেটের দায়ে ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঠিক এই ঐতিহ্যের বাহক হল উৎকলের অধিবাসীরা। সরকারী হিসাবে বিহার হল সবচেয়ে দারিদ্র পীড়িত কিন্তু হিসাবটা সন্দেহাতীত নয়। বৃটিশ রাজত্বকালে উড়িষ্যায় ছিল ছাব্বিশটি দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্য। এই সব রাজ্যের প্রজাদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা উড়িষ্যার বাহিরের লোক বিশেষ জানত না কিন্তু দেশীয় নৃপতিদের অপশাসন ও শোষণের শিকার দারিদ্রপীড়িত প্রজারা মাটির মায়া ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল। এই সব নিপীড়িত মানুষদের সঙ্গেই আমাদের পরিচয় হয়েছে, এদের আমরা দেখেছি এবং দেখে থাকি আমাদের আশেপাশে। অতীতে এদের অবহেলা করার সুযোগ ঘটেছে।

কিন্তু!

উড়িষ্যা ছিল শক্তিশালী বীরের দেশ। যখন সমগ্র উত্তর ও পূর্বভারত মুসলিম লুটেরার কুক্ষিগত হয়েছিল তখনও উড়িষ্যায় রাজত্ব করত স্বাধীন রাজারা। উড়িষ্যায় প্রভুত্ব বিস্তার করতে মুসলমান সুলতান-বাদশাহদের কয়েক শতাব্দী পেরিয়ে গিয়েছিল। উড়িষ্যার রাজাদের রাজ্য সীমানা বাংলার মেদিনীপুর ও বীরভূমের বক্রেশ্বর অবধি বিস্তৃত ছিল। মুসলমানরাও বেশিদিন উড়িষ্যাকে পদানত রাখতে পারেনি, মারাঠাগোষ্ঠীর ভোঁসলারা যাদের আমরা বর্গী নামে ভীতির কেন্দ্র মনে করে থাকি তারাই উড়িষ্যায় প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভ পর্যন্ত।

উড়িষ্যার সেই স্বাধীন গৌরবময় যুগে হিন্দু স্থাপত্য সভ্যতা ও ভাস্কর্য বিস্তার লাভ করেছিল বাংলার প্রত্যন্ত মেদিনীপুর থেকে বহরমপুর গঞ্জাম

অবধি।

আরও পেছনে তাকালে উড়িষ্যার গৌরবময় অবিস্মরণীয় ইতিহাস মনে পড়বে। উড়িষ্যার তৎকালীন নাম ছিল কলিঙ্গ। আজও কলিঙ্গ বলতে উড়িষ্যাকেই বুঝায়। কলিঙ্গ দেশ জয় করতে এসেছিলেন সম্রাট অশোক। ধউলি পাহাড়ের তলায় ভয়াবহ যুদ্ধ ঘটেছিল মগধ আর কলিঙ্গ সেনাদের। উড়িষ্যার জন প্রবাদ ঃ এই যুদ্ধে অগুণতি মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল। ধউলি নদীর জল রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল।

অশোক যুদ্ধ জয় করলেন।

কিন্তু এই যুদ্ধই তাঁকে চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে পরিণত করেছিল। আজও ধউলি পাহাড়ের শিলালিপি এই যুদ্ধের সাক্ষ্য বহন করছে। এই মহাযুদ্ধের স্মৃতি ফলক হল ধউলি পাহাড়ের শিলালিপি। উড়িষ্যার মানুষ আড়াই হাজার বৎসর যাবত ধউলির স্মৃতি বহন করছে। জাপানের বৌদ্ধ সম্প্রদায় বিরাট একটি বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণ করে দিয়েছেন ধউলি পাহাড়ের ওপর। অথচ বৌদ্ধ ধর্মের জন্মভূমি এই ভারতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধ ধর্ম জন্মভূমি থেকে হয়েছে প্রায় বিতাড়িত কিন্তু বহির্ভারতে এর প্রভাব ও প্রচার এখনও অব্যাহত। চীন ও জাপানের ধর্মভীরু বৌদ্ধরা ভারতের ধউলি পাহাড়ে ও কাশীর উপকণ্ঠে সারনাথে বৌদ্ধ বিহার নির্মান করে ভগবান তথাগতের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের কোন ত্রুটি করেনি। যা ছিল আমাদের অবশ্য করণীয় তা থেকে বিচ্যুতি অবশ্যই অমার্জনীয় অপরাধ, সেই অপরাধের মাশুল দিয়েছেন বিদেশীরা।

সারনাথের মৃগদাব, স্তুপ ও বিহার কোন শতাব্দী থেকে বিরাজ করছে তা বলা কঠিন কিন্তু যে ইঁট দিয়ে স্তুপ-বিহার নির্মিত তা দেখে দর্শকরা অবাক হয়ে ভাবে কত শতাব্দী আগের এই ইঁট আজও কেমন অক্ষত রয়েছে। আজও ভাবতে হচ্ছে কোন্ উপাদানে এই ইঁটগুলো তৈরি হয়েছে যা কালের ঝাপটায় ক্ষতবিক্ষত হয়নি। প্রযুক্তিবিদরা সহস্র বৎসর পূর্বে কতটা উন্নত বিজ্ঞান চিন্তার ধারক ছিলেন তা বিস্ময়কর।

ধউলির শিলালিপি ইতিহাসকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে তেমনি বহন করছে ভারতীয় সভ্যতার উৎকৃষ্টতা। সারনাথের স্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে যেমন বৌদ্ধ যুগের সংস্কৃতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধা সহকারে ভেবেছি তেমনি ভেবেছি ধউলি পাহাড়ের সামনে দাঁড়িয়ে।

পেঁছিলাম কোনারকে।

আমরা পান্থনিবাস হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে এগিয়ে চললাম কোনারকের সূর্য মন্দিরের দিকে। পৃথিবী বিখ্যাত এই মন্দিরের গর্ভগৃহ পাথর-সিমেন্ট ইত্যাদি দিয়ে বন্ধ করা আছে। বাংলার কোন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের আদেশে গর্ভগৃহ বন্ধ করে না দিলে যে কোন সময় এই মন্দির ভগ্নস্তুপে পরিণত হতে পারত। তৎকালে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যা একই প্রদেশ ছিল। সে সময় বাংলার

গভর্নর এই দুইটি প্রদেশেরও প্রশাসক ছিলেন। পরবর্তীকালে বিহার উড়িষ্যা আলাদা প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত আইনে উড়িষ্যা সম্পূর্ণ আলাদা প্রদেশে পরিণত হয়। সে অবস্থা আজও বিদ্যমান।

প্রবেশ পথেই প্রথম নাটমঞ্চ—এখানে দেবদাসীরা নৃত্য করতেন, রাজা পারিষদ নিয়ে সভা বসাতেন। অবশ্য এই মঞ্চের এখন ভগ্নদশা। পাথরের কোলে শিল্পীর হাতের ছোঁয়া পেয়ে যে হর্ম্য গড়েছিলেন উড়িষ্যার রাজারা, আজ তার আংশিক অবস্থান যন্ত্রণা সৃষ্টি করছে পথিকের মনে। সরকার এই ধ্বংসকে সুরক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে দর্শক ও পথিকের মনোরঞ্জনের ত্রুটি করেনি। আজও বোধহয় কান পেতে থাকলে শোনা যায় সুরাপান জড়িত রাজা মহারাজার স্খলিত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে দেবদাসীদের নূপুরের নিক্কণ। সহস্র সহস্র বৎসর ধরে নারীর কত করুণ আকুতি চাপা পড়ে আছে পৃথিবীর পথে প্রান্তরে, গিরি কন্দরে, পল্লীতে নগরে, গৃহে, সভায় তার ইতিবৃত্ত আজ খুঁজে বেড়ান বৃথা, শুধু স্মৃতিটুকু নিয়ে সমবেদনার সামান্য অনুভূতিটুকুই রয়ে গেছে উত্তরপুরুষদের চিত্তে। সামান্য এই অনুভূতি দিয়েই কল্পনার চোখে অতীতকে দেখা বিনা আর কি করতে পারি।

নেমে এলাম সূর্য মন্দিরের সামনে।

সূর্য রথের অশ্বদের অস্তিত্ব চূর্ণবিচূর্ণ। একমাত্র ছয়টি রথচক্রের ভগ্নদশার মাঝ দিয়ে অতীত উড়িষ্যার জনজীবনের ও রাজকীয় রুচির পরিচয় খুঁজে পেতে মোটেই কষ্ট হয় না। কোনারকই হল অতীতের উড়িষ্যা, বর্তমানের দুর্লভ রত্ন।

গৌরবের স্ত্রী মহামায়া সৌরভের হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল নিরাপদ দূরত্বে।

আমরা আগ্রহী হলাম দৃশ্যবস্তু সম্বন্ধে।

পুরুষের চেয়ে নারীর দৃষ্টি কত তীক্ষ্ণ তা বুঝতে পারলাম সহজেই।

রথচক্রের অধিকাংশ স্পোকের অভ্যন্তরে যা খোদাই করা আছে, তা যতটা স্পষ্ট তার চেয়ে বেশি স্পষ্ট তৎকালীন রাজকীয় রুচি। প্রায় প্রত্যেকটি স্পোকের মধ্যস্থলে নারী-পুরুষের সঙ্গমের যে চিত্র খোদাই রয়েছে, তাতে অপূর্ব শিল্পের কোন পরিচয় আছে কিনা তা আমাদের মত শিল্প জ্ঞানহীন মানুষের বোধহয় জানা নেই, এমন কি স্বামী-স্ত্রী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে এই শিল্পকলা দেখবার মত রুচিও বোধহয় অনেকের নেই। হিন্দী সিনেমার কুৎসিৎ যৌনলিপ্সা উদ্রেগকারী দৃশ্য তবুও কেউ কেউ সহ্য করতে পারলেও কোনারকের রথচক্রের এই দৃশ্য মোটেই সহ্য করা সম্ভব নয়। অথচ দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত মন্দিরের মাহাত্ম্য এবং অন্যান্য ভাস্কর্য ভারতীয় যে কোন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ভাস্কর্যের সমকক্ষ। দক্ষিণ ভারতের মন্দিরের ভাস্কর্য ও উড়িষ্যার মন্দিরের ভাস্কর্যের সমতুল্য ভাস্কর্য বলতে গেলে গোটা ভারতে বিরল।

গৌরব আমার হাত ধরে টানতে টানতে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে নিয়ে এসে বলল, যাই বলুন দাদা। ভারতীয় শিল্পীর প্রশংসা না করে উপায় নেই কিন্তু

এই শিল্পের স্রষ্টা সাধারণ মানুষ, যেটুকু যৌনতা আছে তা সাধারণ মানুষের অভিরুচি অনুসারে সৃষ্টি করা হয়নি, ওই অভিরুচির অভিভাবকত্ব মালিকানা ছিল রাজা মহারাজার। তৎকালে রাজা মহারাজারা মনে হয় মানুষের আদিম পশুবৃত্তিকে চোখের সামনে তুলে ধরে অপূর্ব আনন্দ উপভোগ করতেন। আজও অনেকের কাছে শোনা গেছে, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিরা কিছু কাল আগে এই আদিম বৃত্তি ও সুরাপাণকেই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা মনে করত।

হেসে বললাম, ঐতিহ্য বজায় রাখতে। ভোগ হল এদের মুখ্য ধর্ম, সেই ধর্ম অতীতে যেমন জনমনে প্রভাব বিস্তার করেছিল আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

মহামায়া এগিয়ে এসে বলল, এতক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কি দেখছিলে?

ভারতীয় শিল্পের গৌরবশৈলী রচনা করছিলাম।

তোমার লজ্জা করল না।

তুমি মক্ষিকা, ভাল জিনিস দেখতে জান না। ব্রণ খুঁজেছ, পেয়েছ অতৃপ্তি এবং অনীহাভরা মানসিকতা।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কোনারকের গঠন প্রণালী দেখতে দেখতে মনে হল ওই সূর্যমন্দির যে জ্যামিতিক নিয়মে গড়া হয়েছিল তার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সূর্যদেবতার উপাসনা নয়। তৎকালীন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সময় নির্ণয় এবং সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচলে দিকনির্ণয় ইত্যাদিতে এর বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল। বর্তমানের লাইট হাউসগুলো যে কার্য সমাধা করে থাকে সূর্যরথ সেই উদ্দেশ্য সাধন করতেই বিশেষ জ্যামিতিক প্রক্রিয়াতে গঠন করা হয়েছিল। তমাল তালিবনরাজিনীলা বেষ্টিত সমুদ্র উপকূলে কোনারকের সূর্যমন্দির বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করেছে নিশ্চয়ই। পরবর্তীকালে যারা উড়িষ্যা দখল করেছিল তারা শোষণ ও শাসন করতেই এসেছিল, কোনারকের এই মন্দিরের বৈজ্ঞানিক অমূল্য সম্পদ তারা বুঝবার চেষ্টা করেনি, হয়ত ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, তাই আজ কোনারকের ভগ্নদশা। রামায়ণ মহাভারত পুরাণ কাহিনীকে পাথরের বুকে জীবন্ত করার শুভ প্রচেষ্টা মূর্খ শোষকদের অবজ্ঞাই পেয়েছে। প্রাচীন ভারতের এই সব সম্পদ কালক্রমে যদি হারিয়ে যায়, লুপ্ত হয় তাহলে তার বিকল্প কোথাও পাওয়া যাবে না, নতুন করে সৃষ্টি করাও যাবে না।

ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির ভাস্কর্য শিল্পে অনবদ্য। লোভী পাণ্ডা ও পূজারীরা দেবতার নামে ভক্তদের শোষণ করলেও, এই ভাস্কর্য শিল্পকে রক্ষা করতে তারা মোটেই যত্নবান নয়।

গৌরব বলল, চলুন দাদা, দিনে দিনেই হোটেলে ফিরে যেতে চাই।

বললাম, তোমার অনুরোধই আমার কাছে আদেশ।

গৌরব লজ্জিত ভাবে বলল, ওভাবে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

গাড়িতে উঠছি এমন সময় ড্রাইভার পরিমল রাউত বলল, একটা কথা বলতে চাই বাবু।

বলুন।

উড়িষ্যায় যাঁরা আসেন তারা সমুদ্র দেখেন, দেবালয় দেখেন, পূজা দেন কিন্তু এখানে এমন একটি জিনিস দেখার রয়েছে যা খুব কম মানুষই দেখতে আসেন।

গৌরব বলল, এমম কি জিনিস ?

জিনিস নয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য, যা ভারতের অন্য কোন অংশে হয়ত দেখতে পাবেন না। আমি আপনাদের সেখানে নিয়ে যেতে চাই, যাবেন কি ?

এখান থেকে কতদূর ?

বেশি দূর নয়। তবে যেতে হবে সূর্যাস্তের অনেক আগে।

চলুন, আমাদের কোন আপত্তি নেই।

দুটি নদীর মোহনা পাশাপাশি।

ভার্গবী আর চন্দ্রভাগা।

দুটো নদী এসে সমুদ্রের বুকে গা এলিয়ে দিয়েছে।

পরিমল রাউত বলল দুটি নদীর মোহনার দূরত্ব এক কিলোমিটারও নয়, মোহনার মাঝখানে সমুদ্র তীরে একটি মন্দির।

গাড়ি দাঁড় করানো হল মন্দিরের সামনে।

পরিমল বলল, আপনারা মন্দিরের পাশ কাটিয়ে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালেই দেখতে পাবেন সূর্যাস্তের অপূর্ব শোভা।

সূর্য তখন পশ্চিমে হেলে পড়েছে। অশান্ত সমুদ্রের বুকে শেষ বেলায় সোনালি আলো এসে পড়েছে। যতদূর দৃষ্টি যায় ততদূর যেন সোনার খেলা। লালের লালিমায় মুঠি মুঠি গলিত সোনা কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে দিগন্ত অবধি। এই সোনার খেলাতেও লুকোচুরি খেলছে সাগরের অশান্ত তরঙ্গ।

উচ্ছ্বসিত ভাবে সৌরভ চিৎকার করে উঠল, ওই দেখ মা ঢেউয়ের মাথা কেমন লাল, দোল খেলা যেন চলছে, আবার ঢেউয়ের পেছনটা একেবারে সাদা।

মহামায়া বলল, সাদা নয় নীল। সামনে পড়ন্ত সূর্যের আলো বাড়িয়ে তুললেও পেছনে আলোর পরশ পাচ্ছে না। তাই পেছনটা সাদা অথবা নীল মনে হচ্ছে আর সম্মুখটা সোনালি।

আরও একটা জিনিস দেখেছ মা ? সমুদ্রের এদিকের জল কেমন ঘোলা আর ওদিকের রং সোনালি আর সাদা।

মহামায়া হেসে বলল, চন্দ্রভাগা নানা গ্রাম শহর পেরিয়ে পলি বহন করে এসে মিলেছে সমুদ্রে। চন্দ্রভাগার জলে কাদা মাটি মেশানো তাই তার অস্তিত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছে ঘোলা জল। দূরে তাকিয়ে দেখ, চন্দ্রভাগা নিজেকে হারিয়ে মিশে গেছে সমুদ্রের গভীরে। ওদিকে এগিয়ে গিয়ে দেখ ভার্গবী নদী একইভাবে নিজের অস্তিত্ব হারিয়েছে নিজেকে সমুদ্রের জলে। এই সব ছোট ছোট নদীর উৎপত্তি মহানদী থেকে।

গৌরব বলল, এইসব নদীর জননী মহানদী, আর বিলুপ্তি সমুদ্রের

মহাকোশলে। এইসব নদীই উড়িষ্যাকে শস্যশ্যামল করে রেখেছে। আর সমুদ্রের নোনা জলের প্রভাবে নারকোল আর তাল গাছের বন সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রের কিনারায়, উড়িষ্যার অর্থনীতিতে এর প্রভাব সর্বাধিক।

পরিমলের ডাক শোনা গেল।

এবার ফিরতে হবে।

বললাম, এখনও সূর্য ডোবেনি। সূর্যাস্ত পর্যন্ত এখানে বসব মনে করছি। বুঝলে গৌরব, এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পরিবেশ ছেড়ে এক পা যেতে ইচ্ছে করছে না। উড়িষ্যা ভ্রমণের সর্বাধিক আকর্ষণীয় এই সৌন্দর্যভাণ্ডার যারা দেখেনি তাদের উড়িষ্যা পরিভ্রমণ ব্যর্থ, ভ্রমণের উদ্দেশ্য অর্ধ সমাপ্ত থেকে যায়।

ফিরতি পথে গৌরব বলছিল, উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতিগত পার্থক্য নেই বললেই চলে। উৎকলী হরফ আলাদা না হলে আমরা উড়িষ্যাকে অনায়াসে আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করতে পারতাম।

বললাম, উড়িষ্যার সঙ্গে বাংলার যতটা আত্মিক যোগাযোগ রয়েছে ততটা নেই অন্যকোন রাজ্যের সঙ্গে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম অসম ও মনিপুরের। আর এটা সম্ভব হয়েছিল বৈষ্ণবকালে এই কয়টি রাজ্যকে প্রভাব বিস্তার করেছিল তারই পরিনতিতে।

গৌরব বলল, বৈষ্ণব কোন ধর্ম নয়, হিন্দুধর্মের একটি বিশেষ ধারা যার সঙ্গে রয়েছে মানবধর্মের অচ্ছেদ্য বন্ধন। মানবধর্মের বিকাশ ঘটিয়েছিল সুফী মতবাদ, এর বৈশিষ্টরূপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব। এঁর কর্মক্ষেত্র বাংলা থেকে উড়িষ্যা অতিক্রম করে সুদূর দক্ষিণাপথের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। আবার অসম প্রভাবিত হয়েছিলেন শঙ্করদেবের বৈষ্ণবীয় মানবধর্মে। বাংলা-অসম-মনিপুর-উড়িষ্যায় যে সাংস্কৃতিক অভিন্নতা গড়ে উঠেছিল তার পেছনে ছিল বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা।

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী অথবা ষষ্ঠী তিথি। দুপাশে ঘন বন মাঝ দিয়ে পীচের রাস্তা। প্রথম রাতের জ্যোৎস্নার ফিকে আলো ধীরে ধীরে বনের মাথায় রুপালি নয়নাভিরাম ছোঁয়া দেখা দিতে থাকে, পীচের রাস্তাটা চিক্ চিক্ করতে থাকে, সমুদ্রের মিঠে হাওয়া কেমন ঝিমুনি এনে দিয়েছিল। হঠাৎ ব্রেক করতেই গাড়ির গতি বাধা পেল। আমার ঝিমুনি কেটে গেল।

গৌরব প্রশ্ন করল, কি হল পরিমলবাবু।

বেড়াল।

মানে।

ওই দেখুন। আগে যে গাড়িটা গেছে সে গাড়ির ড্রাইভার লক্ষ্য করেনি। একটা বিড়ালকে চাপা দিয়ে চলে গেছে। বিড়ালটা এখনও মরেনি। একটু জল দিয়ে আসি ওর মুখে।

বলতে বলতে পরিমল রাউত গাড়ি থেকে নেমে অর্ধমৃত বিড়ালটিকে রাস্তার

পাশে সাঁড়িয়ে দিয়ে নিজের জলের বোতল থেকে বিড়ালের মুখে জল দিয়ে আবার গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল।

গৌরব একটু বিরক্ত হলেও আমি মনে মনে পরিমলের প্রশংসা করলাম। বিড়ালটা নিশ্চয়ই বাঁচবে না, তবুও সে শেষ সময়ে একটু পানীয় পেয়েছে, মানুষের সহানুভূতি পেয়েছে, এটা কি খুব ছোট কিছু!

পুরীতে এসে যে যার আস্তানায় ফিরে গেলাম।

পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের বালির গাদায় রোজকার মত বেড়াতে গিয়ে গৌরবকে দেখতে পেলাম না। রোজই তার সাথে দেখা হয় অথচ আজ ব্যতিক্রম, কেমন একটা চিন্তা চেপে ধরল।

অন্যদিন গৌরব মহামায়া আর সৌরভ সমুদ্রের বালিচড়ায় আসত, সৌরভ দৌড়াদৌড়ি করত। আমরা জলের ধারে বসে সমুদ্র দেখতাম, আজ ব্যতিক্রম ঘটেছে। অথচ কাল সন্ধ্যার পরও আমাকে অন্য কিছুর আভাস দেয়নি গৌরব, বরং বলেছিল, আবার কাল দেখা হবে সমুদ্রের কিনারায়।

ভারী মন নিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তায় উঠে গৌরবের আস্তানার দিকে রওনা হলাম।

হোটেলের দরজায় কেবলমাত্র পা দিয়েছি এমন সময় গৌরবকে দ্রুত দোতালা থেকে নামতে দেখে এগিয়ে গেলাম।

কি ব্যাপার?

আমার প্রশ্নের উত্তরে গৌরব বলল, সৌরভের খুব জ্বর, আমি ডাক্তারের খোঁজে যাচ্ছি। আপনি ওপরে গিয়ে বসুন। আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে না। আপনি থাকলে মহামায়া একটু ভরসা পাবে।

বলতে বলতে গৌরব বেরিয়ে গেল।

হোটেলে গৌরবের ঘরে ঢুকেই দেখলাম সৌরভ কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আর মহামায়া তার মাথায় জলের ধারানি দিচ্ছে।

মহামায়া একবার মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বসুন দাদা।

একটা ডেকচেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

বললাম, হঠাৎ জ্বর! কাল সন্ধ্যা অবধি তো জ্বরের কোন লক্ষণ দেখেনি।

রাত এগারটার পর খোকা বলল, মা আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। গায়ে হাত দিয়ে বুঝলাম গা গরম। রাতে মাথাটা ধুইয়ে দিলাম, বললাম, ঘুমোও। উনি ঘুমোননি, আমিও ঘুমোইনি। যতই রাত বাড়তে থাকে ততই খোকার গায়ের তাপ বাড়তে থাকে। কি বিপদ বলুন তো। উনি হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে ডাক্তার ডাকতে গেছেন।

দেখলাম। তুমি একটু এপাশে বস, আমি ওর মাথায় বাতাস দিচ্ছি, তুমি ততক্ষণ ওর জন্য কোন গরম পথ্যের ব্যবস্থা কর।

মহামায়া আমাকে বাতাস করতে দিল না, ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ওখানে কাপে গরম দুধ আছে, আর ওই দেখুন হরলিক্সের বোতল, একটু কষ্ট

করে এক কাপ হরলিক্স তৈরি করে যদি দিতেন তা হলে খুব উপকার হত। আমার কেমন ভয় করছে, খোকার মাথার কাছ থেকে উঠলে খোকা মা-মা করে চিৎকার করে নেতিয়ে পড়বে। আমি ওর পাশ থেকে এক পাও নড়তে পারব না দাদা। খোকাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। খোকাকে ছেড়ে আমি বাঁচব না।

অবাক হয়ে গেলাম মহামায়ার কথা শুনে। গৌরব বলেছিল, মহামায়া সৎমা।

কি ভাবছেন দাদা। আপনি একটু দয়া করুন।

উঠলাম।

মহামায়া সৌরভের মাথায় জলের ধারানি দিতে থাকে। হঠাৎ বলে উঠল আমি খোকার জননী নই দাদা, কিন্তু আমি ওর মা। আমার দেহ মন সব দিয়ে ওকে আজ ষোল বছর আমার স্নেহ, মায়া, মমতা, ভালবাসা দিয়ে তিল তিল করে বড় করেছি। যার গর্ভে ওর জন্ম তিনি তো ওকে ভগবানের ভরসায় ছেড়ে গেছেন, পরবর্তী অধ্যায়ের রূপকার হতে হয়েছে আমাকে।

বলতে বলতে মহামায়া থেমে গেল।

এক কাপ দুধে হরলিক্স দিয়ে আমি তুলে দিলাম মহামায়ার হাতে। নিপুণ ভাবে চামচে করে সৌরভকে খাওয়াতে থাকে মহামায়া।

গৌরব এর মধ্যেই ডাক্তারকে সঙ্গে করে এসে গেল।

নানাভাবে পরীক্ষা করে ডাক্তারবাবু বললেন, কোন ভয়ের কিছু নেই। মনে হচ্ছে হিট্ স্ট্রোকের মত হয়েছে। স্বর্গদ্বারের কাছে, কিম্বা এই হোটেলের ফ্রিজে বরফ থাকতে পারে। বরফ দিয়ে গোটা শরীর মুছিয়ে দিন আর আমার সঙ্গে আসুন, ওষুধ দিচ্ছি, খাইয়ে দিন। বিকেল নাগাদ রুগী অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি গৌরবকে বললাম, তুমি খোকার পরিচর্যা কর, আমি ওষুধ নিয়ে আসছি। বরফ হোটেলে পাও, তুমি চেষ্টা কর। আমিও বরফ খুঁজে আনছি।

ওষুধ আর বরফ নিয়ে ফিরতে কিছুটা দেরি হয়েছিল, এসে দেখলাম মহামায়া তোয়ালেতে বরফ দিয়ে খোকার সারা দেহ সমানে মুছিয়ে চলেছে। আর গৌরব চুপ করে বসে দেখছে মহামায়ার কাজ।

আমি দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। তাকিয়ে দেখছিলাম মহামায়াকে। তপস্বিনীর মত মহামায়া নীরবে সেবা করে চলেছে খোকাকে। গৌরবকে বললাম, একটা বড়ি এখুনি খোকাকে জলে গুলে খাইয়ে দাও। প্রতি ছয় ঘণ্টায় একটা করে বড়ি খাওয়াবে।

একটা চামচে জল নিয়ে গৌরব ওষুধটা গুলে মহামায়ার হাতে দিল। মুখ ফাঁক করে ওষুধটা গলায় ঢেলে দিয়ে মহামায়া খোকার মুখ মুছিয়ে দিল।

আমি আর গৌরব মাঝে মাঝে খোকার দেহের তাপ হাত দিয়ে অনুভব করছিলাম।

হোটেলের বেয়ারা ট্রেতে করে চা জলখাবার এনে সামনে রাখল।

আমরা চা খেলাম কিন্তু মহামায়া তা স্পর্শও করল না।

আমি বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সে চায়ে মুখ দিল না। গৌরব বলল, বৃথা বলছেন দাদা, যতক্ষণ খোকা মা বলে না ডাকবে ততক্ষণ জলটুকুও মায়া মুখে দেবে না।

ঘন্টাখানেক পর মহামায়া বলল, খোকা খুব ঘামছে।

বরফ বন্ধ কর। মাথায় বরফের তোয়ালেটা দিয়ে রাখ।

কিছুক্ষণের মধ্যেই খোকা বেমে নেয়ে ওঠার মত হল। গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলাম তার দেহের তাপ অনেক কমেছে।

খোকা তাকিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে ডাকল, মা।

মহামায়া ব্যাকুলভাবে বলল, এই যে আমি। শরীর ভাল লাগছে কি বাবা?

সৌরভ শুধু বলল, হুঁ।

দিন কাটল, রাতও কাটল। ধীরে ধীরে জ্বর কমতে থাকে।

মহামায়া যেমন বসেছিল খোকার পাশে তেমনি বসে রইল। দুবার মাত্র বাথরুমে যাওয়া ভিন্ন খোকার পাশ থেকে ওঠেনি। কিছু খায়নি।

গৌরব বলল, মায়া এই রকম চিরকাল। ছেলের কিছু হলে ও পাগল হয়ে ওঠে। অনেক দিন বলেছে, যারা সন্তানহীন তারা পোষ্য নিয়ে সন্তানের ক্ষুধা মেটায়। এতো তোমার সন্তান। এই সন্তানই আমার মাতৃত্বকে পূর্ণতা দান করেছে।

কদিনের মধ্যেই খোকা সুস্থ হয়েছিল। কয়েকদিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তি মহামায়ার দেহটা যেন মুসড়ে গিয়েছিল। খোকা ভাত খেয়ে চলাফেরা করতেই মহামায়া নতুন জীবন ফিরে পেল।

আমি হোটেলের নিরালা ঘরে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, মহামায়ার মাতৃত্ববোধ কি তাকে এত সংবেদনশীল, উদার করেছে। অথবা মনুষ্যত্ববোধ তাকে মাতৃত্বের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করতে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। উত্তর খুঁজে পাইনি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আনাচে কানাচে ঘুরে দেখেছি, মানুষ খুঁজেছি। আমার শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তির অন্যতম অকলঙ্কিত মায়ের মহিমাময়ীরূপে যাকে পেয়েছি সে হল মহামায়া।

পুরীর স্মৃতি ঝাপসা হলেও পেছনের মানুষগুলো আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সর্বক্ষণ। তাদের ভুলতে চেয়েও ভুলতে পারছি না।

যেবার খুব দাঙ্গা হয়েছিল সেবার চোখের সামনে নাটকীয় ঘটনাগুলো দেখতে পেলেও এমন একজন অসহায় ব্যক্তিকে দেখেছিলাম যিনি বিধর্মীর হাতে নিগৃহীত হননি কেবলমাত্র তাঁর প্রতিবেশীর উদার হৃদয়ের জন্য। এটা একটা ঘটনা নয়। উভয় ধর্মের লোকই বিপরীত ধর্মীয় অসহায় মানুষকে নানাভাবে রক্ষা করে মনুষ্যত্ববোধের কলঙ্কহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। মানুষকে

তখনই খুঁজে পেয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষকে অবিশ্বাস করা মহাপাপ।

কবিগুরুর বাণী খুবই আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক। বাস্তব জীবনে যাদের লাভ লোকসানের হিসাব থাকে তারা প্রতিবেশী, এমন কি নিজের স্বজনকেও বিশ্বাস করে না। এরা মানবদর্শন করে না, দার্শনিক তত্ত্বও বোঝে না, এরা বোঝে কোথায় কি ভাবে তাদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটতে পারে। সাধারণের ধারণা এরাই খাঁটি মানুষ এবং এরাই সমাজে বুদ্ধিমান ও সজ্জনরূপে পরিচিত।

গৌরব, মহামায়া ও সৌরভ তাদের নিজ গৃহে ফিরে গেছে, তারপর কয়েকটা যুগ কেটে গেছে, ঝাপসা হয়ে এসেছে তাদের স্মৃতি কিন্তু যখনই মহামায়ার ব্যথাতুর মুখে মাতৃত্বের ঝিলিক আমার মনে ভেসে ওঠে তখনই মনে হয় আমার মত মাতৃহারারা এই মাতৃত্বের মহিমা সঠিক অনুধাবন করতে হয়ত পারে।

আমি বন্দীজীবনে পেয়েছিলাম মহামায়ার মতই মমতাময়ী মাকে, যিনি কার্যত গোলামির তাঁবেদার হওয়ার যোগ্য অথচ মাতৃস্নেহ উজাড় করে অসহায়কে অতি আপনজন করে নিতে পেরেছিলেন, দয়া পরবশে নয়, স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, কেবলমাত্র একজন হতচ্ছাড়ার মা হবার প্রলোভনে। স্মৃতির অর্গল খুললেই যে মহিলার করুণা ঘন মুখটি আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সে মুখের অধিকারী হলেন বিবিসাহেবা।

আমার হিসাবের জাবেদা খাতায় অনেকের নামই লিপিবদ্ধ আছে সেসব নামের পুরোভাগে রয়েছে নতুনদির নাম। অনেককেই দেখেছি, অনেকেই বলেছে তাদের কথা, অনেকে জানিয়েছে নিজ পরিবারের গোপন কথা কিন্তু কেউ মানতে চায়নি আমাকে। এমন কি গোপীনাথপুরের ডাক্তারসাহেবও জানতে চাননি আমার বর্তমান ও অতীত। ব্যতিক্রম হলেন নতুনদিদি, যিনি জেনেছেন, জানিয়েছেন, মতামত দিয়েছেন, তাই নতুনদিদি অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব নিয়ে অবস্থান করছেন আমার মনে।

নতুনদিদিকে বলেছিলাম, মানুষ খুঁজতে খুঁজতে ভারত ও বহির্ভারতের নানাস্থানে ঘুরেছি শুধু মানুষ খুঁজতে।

নতুনদিদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পেয়েছ মানুষকে।

হেসে বলেছিলাম, পেয়েছি। মানুষ আছে নতুনদি। মানুষের মত মানুষ না থাকলে পৃথিবীটা অচল হয়ে যেত। আমাদের পল্লীতে একজন উন্মাদ মেয়েকে মাঝে মাঝে ঘুরতে দেখতাম। অনেকদিন তাকে দেখিনি। ভেবেছিলাম কোন সহৃদয় ব্যক্তি তাকে কোন উন্মাদ আশ্রমে পাঠিয়েছে।

না, তা নয়। প্রায় এক বছর পরে তাকে দেখলাম সদ্যজাত একটি শিশুকে কোলে নিয়ে ঘুরছে। তার চেহারা দেখেই মনে হয়, শিশুটির জননী সেই অর্ধউন্মাদ মেয়েটা॥ একটা গলির নিরালা জায়গায় রোজ এসে মাঝে মাঝে বসত আর পরনের ফ্রক উঁচু করে শিশুটির মুখ ফ্রকের মধ্যে নিয়ে দুধ খাওয়াতো।

দিনে দিনে শিশুটি বড় হতে থাকে।

আবার কয়েকদিন মেয়েটাকে দেখতে পাইনি।

হঠাৎ একদিন দেখলাম নেতিয়ে পড়া শিশুটাকে ঘাড়ে নিয়ে সে এসে বসেছে সেই নিরালা গলিতে। বার বার চেষ্টা করছে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াতে কিন্তু শিশু আর মুখ খুলছে না।

পথচারীদের অনেকেই শিশুটিকে লক্ষ্য করে বলল, এই পাগলি তোর সন্তানটা মরে গেছে।

মেয়েটিকে কোন মতেই বিশ্বাস করানো গেল না তার সন্তান মারা গেছে। সে যেখানে বসেছিল সেখানেই বসে বার বার শিশুটিকে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করছিল।

বিকেলবেলায় নিজের মনে চিৎকার করে উঠল, খুকি কাঁদছে না। দুধ খাচ্ছে না।

লোক জমায়েত হয়ে অনেক বুঝিয়ে তাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে।

ডাক্তারবাবু রুগী দেখে মত দিলেন। পেটের রোগে আর অপুষ্টির জন্য শিশু মারা গেছে।

হাসপাতালের মরাঘরে শিশুর লাশ পাঠিয়ে দেবার পর মাটিতে লুটিয়ে সেকি পাগলির কান্না।

আমি তার প্রত্যক্ষদর্শী।

আমার গৃহিনী সেই পাগলি এলেই খেতে দিত।

আমার সঙ্গে তার পরিচয় প্রথমাবধি।

জানেন নতুনদি, এই যে মা, এই মাতৃত্ব যতই অভিশপ্ত হোক, এর বিরাটত্ব আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল বহুকাল। এমন মায়ের চেহারা দেখতে আমি অভ্যস্ত, তবে যারা পাগল নয় তারাও অনভিপ্রেত সন্তানেরও মৃত্যু কামনা করে না। সবাই চায় তার সন্তান বেঁচেবর্তে থাকুক সমাজের সামনে প্রকৃত পরিচয় নিয়ে।

সব সময় তা হয়না নতুনদি। তাই মানুষ কখনও কখনও অমানুষের মত আচরণ করে, তবুও আমি এদের ঘৃণা করি না, অবহেলা করি না, অসম্মান করি না। বারবনিতাও চায় না তার মেয়ে তার মত নক্কারজনক জীবনের অংশীদার হোক। সেও চায় তার সন্তান সমাজে সুস্থজীবন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক। এটাই বোধহয় মাতৃধর্ম। অবমানিত নারীত্ব মাতৃত্বকে ছোট করে দেখে না।

মানুষ খোঁজার শেষ কবে হবে জানি না। তবে দেশ দেশান্তরে নিকটে প্রবাসে মানুষ খুঁজতে বৃথাই পরিক্রমা করেছি নতুনদি। আমার সামনেই যারা রয়েছে তারাই বিশ্বমানবের প্রতীক, তাদের মাঝেই রয়েছে প্রকৃত মানুষ, যাদের গভীরভাবে নিরীক্ষণ না করে স্থান থেকে স্থানান্তরে গেছি মানুষের সন্ধানে। এই ভ্রম ঘটেছে দম্ভে, বুদ্ধি বিপর্যয়ে।

খুনী মেয়াদী আসামীকেও কাঁদতে দেখেছি তার শিশু সন্তানকে কাছে পেতে। যে লোক নির্মমতা ও নিষ্ঠুরতার জন্য যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত সে মানুষ যখন সন্তানকে কাছে পেতে কেঁদে আকুল হয় তখন আর মানুষকে খুঁজতে হয় না নতুনদিদি। খুনীর অবচেতন মন থেকেই জেগে ওঠে তার মনুষ্যত্ববোধ।

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকরা হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়িতে প্রাণ দিয়েছে। এটা কোন আষাঢ়ে গল্প নয়। আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের দেশপ্রেমের সঙ্গে প্রখর মনুষ্যত্ববোধ ছিল এ বিষয়ে কারও কোন সন্দেহ নেই। গয়া জেলে বৈকুণ্ঠ সুকুলকে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যাওয়ার সময় বিভূতি দাশগুপ্তের সেলের সামনে দাঁড়িয়ে যেভাবে বৈকুণ্ঠ সুকুল অভিনন্দন জানিয়েছিলেন তা চিরস্মরণীয় হয়ে রইবে।

কিন্তু নতুনদি মানুষ খোঁজার নেশা আমার থিতিয়ে এসেছে। দেশ বিদেশে পরিভ্রমণ করে আজ বুঝেছি, মানুষ আমাদের চারপাশেই ছড়িয়ে আছে, আমাদের চিনতে ভুল হয়ে থাকে। আমাদের দেখার ত্রুটি থাকে বলেই সঠিককে বেঠিক মনে করে থাকি।

নতুনদি চুপ করে শুনছিলেন।

বললাম, লাহোর থেকে কলকাতা ফিরছিলাম।

একটি বাঙ্গালী দম্পতি তিন চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে আমার কামরায় ছিলেন।

প্রথমে ভাল লাগছিল তাদের আচার আচরণ হঠাৎ দেখলাম ভদ্রলোক ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন তাঁর স্ত্রীর প্রতি।

স্ত্রী জোর দিয়ে বলছেন, এই পট্‌টা ভর্তি জল তোমাকে আনতেই হবে।

ভদ্রলোক বললেন, তোমার শুচিবাই রক্ষা করতে করতে আমার জীবন যাবার জোগাড়। রেলের কামরা ধুয়ে পরিষ্কার করার কাজ কি তোমাকে কেউ দিয়েছে।

হাঁ দিয়েছে। কত জাত বেজাত বসছে আমাদের পাশে, নোংরা, এঁটো কাঁটাও ফেলেছে না।

বুঝলাম, ভদ্রলোক স্ত্রীর শুচিবাই নিয়ে বিব্রত। আমাকে স্ত্রীর হাতের দিকে নজর দিতে বললেন। দেখুন দুই হাতে কেমন হাজা হয়ে গেছে জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে।

দেখলাম। বললাম, আপনি তাও ভাগ্যবান। আমার এক সহপাঠীর বাবা ছিলেন মস্ত বড় চাষী। চাষ বাড়ি থেকে ফেরার পথে নদীতে স্নান করে ভেজা কাপড়ে ফিরে আসতেন। ঘরে ঢুকবার আগে ভদ্রলোক পরণের কাপড় খুলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে দরজায় দাঁড়াতেন, তাঁর স্ত্রী ভেতর থেকে গামছা ছুড়ে দিতেন। গামছা পড়ে ঘরে ঢুকতেন সেই ভদ্রলোক। ভেবে দেখুন। আপনি কত ভাগ্যবান। আমার সহপাঠীর বাবাকে অনাচার সহ্য করতে হত আর আপনার স্ত্রী নিজের ওপর অত্যাচার করেন। আপনার জল জোগান দেওয়া

কাজ, উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে হয় না ওঁর সামনে। এটাই তো ভাগ্য। ভদ্রলোক কি মনে করলেন জানি না, তবে ভদ্রমহিলার চোখ ফেটে আগুনের হল্কা বের হচ্ছিল তখন।

নতুদি মন্তব্য করলেন, অশিক্ষা থেকেই এই সব অসভ্যতার সৃষ্টি।

কিন্তু ভেবে দেখুন ওই দুই পরিবারের পুরুষদের কতটা সহনশীলতা ছিল, কারণ প্রয়োজন ছিল সংসারে শান্তি বজায় রাখতে। শান্তি রক্ষার দায়িত্ব বহন করে মেয়েরা। এখানে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ উল্টো। এরাও দাবী করে আমরা মানুষ। আবার নিত্যধনের চেহারাটা দেখুন। সামান্য টাকার বখরা নিয়ে বাবার সঙ্গে মনোমালিন্য থেকে নিত্যধন ক্ষিপ্ত হয়ে বাবার মাথায় লোহার রড মেরে বাবাকে হত্যা করেছিল। এরাও বলে, আমরা মানুষ। বাবা-মা তাদের সর্বস্ব দিয়ে, স্নেহ মায়া মমতা দিয়ে হাফ্ ডজন সন্তানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন, আর বার্ধক্য প্রপীড়িত পিতা-মাতাকে ওই হাফ্ ডজন সন্তান প্রতিপালন না করে পথে নামিয়ে দেয়। অজুহাত, আমাদের বউদের সঙ্গে আমাদের মা-অথবা বাবা ভাল ব্যবহার করেন না। একজন হাফ ডজনের দায় বহন করলেও, হাফ ডজন একজনের দায় বহন করে না, করতে চায় না। এরাও বলে আমরা মানুষ।

নতুনদি হাসলেন।

আপনি হাসছেন নতুনদি কিন্তু সন্তান লাভের জন্য কত বার ব্রত-ধর্ণা দেয় ভাবী মায়েরা। কেউ যায় তারকেশ্বর, কেউ যায় কালীঘাট অথবা অন্যকোথাও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হন এই সব মহিলারা। তাঁরা কখনও যান না ডাক্তারদের কাছে। ভাগ্যনির্ভর মহিলাদের কেউ কেউ সন্তান লাভ করে। এই সন্তানের মঙ্গলের জন্য মায়েরা বার মাসে তেরটা ষষ্ঠীব্রত পালন করে। তারপর সন্তান বড় হয়, উপার্জনক্ষম হয়। আর সেই মমতাময়ী মা হল অক্ষম ও জরাপীড়িত। এরপরই সন্তানের আসল রূপ দেখলেন সেই মহিলা। তবুও এরা বলে আমরা মানুষ।

নতুনদি বললেন, আর বলতে হবে না। এ ছবি অনেক দেখেছি। এদের কেউ কেউ সমাজের মাথায় বসে ছড়ি ঘোরায়। কেউ কেউ অপরকে সমাজধর্মও শেখায়। এটাই তো বাস্তব সত্য।

বাধা দিয়ে বললাম, কিন্তু একসময় কয়েক মাস বিহারের ধানবাদে ছিলাম সেখানে মাঝে মাঝে দুজন ইতালীয় পাদরীসাহেব আসতেন। অনেক আলোচনা হত। একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, আপনারা তো বলছেন ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের মহরু দুবেলা ভাতের আশায় পথে পথে কেন ঘোরে আর আপনাদের স্টুয়ার্টসাহেব রোজ ঘোড়াকে ক্ষুধার্তকে বঞ্চিত করে তিন সের করে ছোলা খাওয়ান। এরা কি দুজনই ঈশ্বরের চোখে সমান।

পাদরীসাহেবদের একজন বললেন, এর ব্যাখ্যা শুনতে চাও। শোন, তুমি

কি সাঁতার জান। কিন্তু একদিনে নিশ্চয়ই সাঁতার শেখনি। তোমার বাবা তোমাকে পুকুরে নামিয়ে ডাঙ্গায় বসে থাকতেন। যখনই তোমাকে ডুববার মত দেখতেন তখনই তিনি জলে নেমে তোমাকে টেনে তুলতেন। ঈশ্বর একই ভাবে আমাদের পরীক্ষা করেন। দুঃখ দারিদ্রের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বর নজর রাখেন, যখনই তিনি দেখেন মানুষ খুব বিপন্ন তখনই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। বুঝলে ?

বললাম, বুঝলাম। অন্যায় ও ফাঁকির সমর্থনে অনেক যুক্তি তোমাদের স্টকে আছে।

পাদরীরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সেই যে বিদায় নিলেন আর ফিরে আসেনি। ঈশ্বরের মহিমাও আমার জানার ভাগ্য হয়নি। এরা অজ্ঞাত শক্তি ঈশ্বরকে সেবা করে, মানুষকে এরা ভুলে গেছে অথচ এরাই নিজেদের মানুষ বলে দাবী জানায়।

নতুনদি বললেন, তুমি বড়ই দুষ্ট।

অবশ্যই। এটাই আমার বড় কমপ্লিমেন্ট। আপনার পায়ের ধুলো দিন নতুনদি। আমার স্বজন-পরিজন এটা বুঝতে পারেনি, পারলেও খুবই দেরিতে বুঝেছে। যারা মানুষকে ভালবাসে না। জাতকে ভালবাসে, অলৌকিক শক্তিকে ভালবাসে তাদের মানুষ হবার দাবী হাস্যকর। মানুষ খোঁজার ক্ষেত্রে এদের স্থান নেই নতুনদি। দিল্লির ঝুপড়ি, মাদ্রাজের ঝুপড়ি, কলকাতার ফুটপাতে যারা বাস করে তাদের মাঝেই মানুষ খুঁজে পাব। এরা সব হারিয়ে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এখনও যে বেঁচে আছে, এখনও যে বাঁচার জন্য লড়াইটা সেটাই হল মানুষের চিহ্ন। জীবনযুদ্ধ হল মানুষ তৈরির কারখানা।

তোমার কাছে আরও কিছু শুনতে চাই ভাই। নানা দেশে নানা অবস্থার সম্মুখীন হয়ে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ, আমরা চার দেওয়ালের মাঝে বাস করে তার কনিকাও সংগ্রহ করতে পারিনি।

বেশ কেটে গেল কটা দিন।

নির্মলবাবু ছিলেন শ্রোতা। ঝন্টু-মন্টু আমাদের বক্তব্যে মোটেই আগ্রহী নয়। একমাত্র নতুনদিদি আমাকে পেয়ে পরমলাভ করেছেন, এটাই মনে হল।

এমনি ধারাই পরমলাভ করেছিলেন আরেকটি মহিলা।

উনি বলেছিলেন, আমার বাবা নেই, আপনি আমার পিতৃতুল্য। যখনই এই পথে যাবেন তখনই পায়ের ধুলো দেবেন। আপনাকে সেবা করে আমি স্বর্গীয় সুখ অনুভব করতে পারব।

করুণা গ্রাম্য বধূ নয়।

অশিক্ষিত পরিবারের অশিক্ষা নিয়ে বড় হয়নি। লেখাপড়া শিখেছেন স্বামী পুত্র কন্যা নিয়ে সংসার করছেন। অভাব কিছু নেই বলেই জানি।

কিন্তু আমার মধ্যে পিতৃত্বের কি ছায়া করুণা পেয়েছিল। সেটাই আমি

জানি না।

করুণা আমার সন্দেহভঞ্জন করতে একটা ছোট আয়না আর ছবির অ্যালবাম হাজির করে বলল, আপনি আয়নায় আপনার চেহারা দেখুন আর অ্যালবামে আমার বাবার ছবি দেখুন। দেখুন। দেখুন।

বাধ্য হয়ে দেখলাম।

এক রকম কিনা?

বললাম, অনেকের চেহারায় সাদৃশ্য থাকে।

সেটাই বলছি, এই সাদৃশ্যই আপনাকে পিতৃপদে স্থাপন করতে আমায় অনুপ্রাণিত করেছে।

ভাবলাম, মেয়েদের চোখ ভুল করে না।

যেদিন করুণার কাছ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলাম সেদিন চোখ মুছতে মুছতে সে বলেছিল, আবার কবে আসবেন বাবা?

চমকে উঠলাম। নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, কবে আসব বলতে পারি না। তবে তোমার কাছে আবার আসব। আজকের মত দেহের গতি ও মনের ব্যাপকতা না থাকলেও আসব।

যেতে হয়েছিল অনেকদিন পর।

একজন এসে খবর দিল করুণার লিউকোমিয়া হয়েছে, আমাকে দেখতে চেয়েছে। এতদিন হাসপাতালে ছিল, বর্তমানে বাড়িতেই ফিরে এসেছে। অনেক কষ্টে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করে খবরটা দিয়ে গেলাম।

পরদিনই ট্রেনে চেপে করুণাকে দেখতে গিয়েছিলাম।

তখন তার অন্তিম অবস্থা।

আমাকে দেখেই সে কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠল। দুহাত বাড়িয়ে আমাকে কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করছিল কিন্তু তখন তার সামর্থ্য ছিল সীমাবদ্ধ। তার স্বামী অজয় মাথার কাছে বসে। তার চাহনি বড়ই করুণ। আমিও গিয়ে তার পাশে বসলাম।

আপনার পায়ের ধুলো আমার মাথায় দিন বাবা। বলেই হাত বাড়াল

আমি কি যে করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। তার দুর্বল হাতটা আমার পা ছুঁতেই সজাগ হয়ে গেলাম। সেই হাত কপালে ঠেকিয়ে করুণা বলল, পরজন্ম যদি থাকে, তাহলে আমি যেন আপনার মেয়ে হয়ে জন্মাই। পিতৃহারাও হব না। পিতার স্নেহ থেকেও বঞ্চিত হব না।

আমার মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি।

করুণা সবাইকে কাঁদিয়ে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেছিল।

তার মৃত্যুই আমার চোখের জল টেনে বের করেছিল, আমার মত নির্মম মানুষও না কেঁদে পারেনি। আচ্ছা নতুনদি এও তো মানুষ। এমন মানুষকে হারাতে কার না কষ্ট হয়।

॥ আট ॥

নতুনদি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তোমার মানুষ খোঁজা শেষ হয়েছে ভাই ?

হেসে বললাম, হয়নি, তবে খুব বেশি অগ্রসর হতে হবে না। এবার খুঁজে পাব, আমার দৃষ্টি যতদূর প্রসারিত করেছি, তাকে সীমাবদ্ধ করতে পারলেই বোধহয় আমার দেখাও শেষ হবে।

আমার বক্তব্য মোটেই স্পষ্ট নয়, কিছুটা ধোঁয়াশা সৃষ্টি করেছিল। নতুনদি বললেন, বুঝলাম না।

সব কথা সব সময় বলা যায় না দিদি। তবুও আমার দেখার যখন শেষ হবে তখন আমার বলার ক্ষমতা হয়ত থাকবে না সেজন্য আমি ছেদ টানতে চাই আমার চলার, দেখার ও বলার। তা হলেই বুঝতে অসুবিধা হবে না।

প্রথম জীবনে ভয়ঙ্কর সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়েছিল উদরান্ন সংগ্রহ করতে। কোথাও যখন স্থান পেলাম না তখন ছুটে গিয়ে ছিলাম জঙ্গলে।

জঙ্গলে ? সে আবার কি ? মনুষ্য বসবাসের অযোগ্য স্থানে নিজের বাসস্থান খুঁজতে গিয়েছিলে ?

হাঁ. নতুদদি। কোন একসময় ডুয়ার্সের গভীর বনে বিবিসাহেবার স্নেহ ভালবাসার আশ্রয়ে ছিলাম কিন্তু জমানা বদল হতেই পাহারাদারের রক্তচক্ষু আপনা থেকেই রং বদল করেছিল। সেই সময় থেকেই বনের প্রতি যেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করেছি। হঠাৎ একদিন স্ত্রী ও সন্তানের হাত ধরে অসমের অতি প্রত্যন্ত এলাকায় হাজির হলাম রুটি সংগ্রহে।

আমার আগেই অনেক কয়েকজন এসেছিল, তারা এসেছিল স্থানীয় জমিদারদের সেবা করতে, জমিদারদের জঙ্গল মহালে জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করতে।

উপস্থিত হয়েছিলাম গভীর বনের মাঝে কতকগুলো পাকা বাড়ির সামনে। সঙ্গে ছিলেন অতি অনুগত মাজেন ব্রহ্ম। ব্রহ্মরা মূলত বোড়ো উপজাতি। স্থানীয় ভাষায় ওদের অনেকে মেচ বলে থাকে। ওরা কিন্তু মেচ বললে খুবই অসন্তুষ্ট হয়। অসমের ওই অঞ্চলের আদিবাসীদের অধিকাংশই বোড়ো, জনসংখ্যায় তাদের পরেই হল রাজবংশী এবং রাভা। চেহারায় মঙ্গোলীয় ভাব। মেয়েরা নিজেদের হাতে বোনা কাপড় বুকের ওপর থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত পড়ে, বাঁধনটা থাকে বুকের ওপর। খাসি রমনীরা দুটো বড় বড় চাদর ঘাড়ের দুপাশ দিয়ে ঝুলিয়ে দিলেও নিচে থাকে সেমিজ কিন্তু বোড়ো গ্রাম্য মেয়েরা একখানাই কাপড় বুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে পড়ে থাকে। রাভাদের অধিকাংশ নিম্নাঙ্গে পেটিকোটের মত ঘাগরা পড়ে, উপরাঙ্গে পড়ে ব্লাউজ জাতীয় জামা। এরা যখন নিজেদের শ্রেণীগত পোশাক পড়ে তখন দেখতে অপূর্ব লাগে। বলাবাহুল্য এই সব পরিধেয় মেয়েরা নিজেদের ঘরে ছোট ছোট তাঁতে তৈরি করে। এদের প্রাথমিক জীবনের সমস্ত প্রয়োজন গোষ্ঠীগতভাবে নিজেরাই তৈরি করে নেয়, এমন কি নুনের জন্য কলার ঠোলা শুকিয়ে পুড়িয়ে জলে ভিজিয়ে ক্ষার তৈরি

করে, সেই ক্ষার দিয়েই লবনের প্রয়োজন মেটায়। অবশ্য সামর্থ থাকলে কেউ কেউ বাজার থেকে লবনও কিনে আনে।

এসব জঙ্গলের আম কাঁঠাল গাছে এক জাতীয় লতানো পান গাছ পাওয়া যায়। সেই পান কাঁচা সুপুরির সঙ্গে চুন দিয়ে ওরা খায়। কাঁচা সুপুড়ি তথা কোয়াই আর চুন সহ পান চিবোলে মুহূর্তে গোটা শরীর গরম হয়ে ওঠে, ঘাম ঝড়তে থাকে।

পুরুষরা বাঙ্গালীদের মতই ধুতি জামা পরিধান করে এবং নিজেদের মধ্যে আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় কথা বললেও বাইরে কেউ কেউ সহজ সরল বাংলায় কথা বলে, কেউ কেউ বাংলা ভাষা নিয়েই পড়াশোনা করে, অনেকে অসমীয়া ভাষাতেও কথা বলে থাকে।

মাজেন প্রথম এসেছিল বাংলা পড়তে। আমিও আগ্রহ সহকারে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীসহ অন্যান্য বোড়ো শিক্ষার্থীদের বাংলা পড়িয়েছিলাম। রাভাদের অনেকেই বাংলা পড়ত প্রবেশিকা পর্যন্ত।

মাজেন আমার প্রিয় ছাত্র।

তাকেই সহচর করে বন পরিক্রমায় বের হয়েছিলাম।

মাজেন বলেছিল, একটা ইতিহাসের অবহেলিত জিনিস আপনাকে দেখতে নিয়ে যাব। তবে পথ দুর্গম ও বিপদ সঙ্কুল।

বললাম, তোমার সেখানে যেতে ভয় করবে না।

মাজেন অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, তাহলে কি এই বনজঙ্গলে আমরা বাস করতাম। আপনি তো অভ্যস্ত নন, তাই যা ভাবনা।

বললাম, তোমার অনুমান নেহাৎ অযৌক্তিক নয়, তবে বনে বাস করতে আমি অভ্যস্ত।

মাজেন একটা চা বাগানের কুলিদের হাতে যেমন দা থাকে সেইরকম দা হাতে নিয়ে বলল, চলুন তাহলে দেখে আসি।

কিছুদূরে গিয়ে একটা বড় হরতুকি গাছের ডাল কেটে আমার হাতে দিয়ে বলল, অসময়ে কাজ দেবে স্যার।

বনের মাঝ দিয়ে ইঁটের খোয়া বিছানো পথ।

গভীর বন।

দুপুরে সূর্যের আলো বনের মাথা ভেদ করে মাটি ছুঁতে পারছে না। মাঝে মাঝে বনমোরগের ডাক, বাঁদরের কিচমিচ, আর হরিণের ডাক শোনা যাচ্ছে। এই নব শব্দ বনের নিস্তব্ধতাকে ভয়ঙ্কর করে তুলছিল। মাজেন আমার পাশে। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভয় পাবেন না স্যার। বাঘ ভালুক এসময় এদিকে আসেনা, তবে মাঝে মাঝে হাতির উৎপাত হয়ে থাকে। আপনি বোধহয় জানেন, এই জঙ্গল মহাল হল গৌরীপুর রাজার।

কোন্ গৌরীপুর?

রাজা বি-এন-বরুয়ার জমিদারী। এরই ছেলে প্রমথেশ বরুয়া। তাঁর নাম

তো সবাই জানে।

কথা বলতে বলতে একটা টিলার সামনে এসে বলল, এই যে সিঁড়ি পাহাড়ের গা কেটে তৈরি করেছে গৌরীপুর রাজার এই সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই গৌরীপুর রাজাদের কাচারি, ওখানেই আমরা যাব।

মাজেনের পাশাপাশি টিলার উপরে উঠলাম।

সামনে কয়েকখানা পাকা দালান। গৌরীপুর রাজাদের কাচারি।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি আছে?

আছে মীরজুমলার কবর।

মীরজুমলা! মোগল সুবেদার ও সেনাপতি মীরজুমলা। ইতিহাসের পাতায় মীরজুমলার আসাম অভিযানের কাহিনী পড়েছি। কিন্তু এত জায়গা ছেড়ে মীরজুমলার কবর এই গভীর বনে কেন?

মাজেন সব খবর বলতে পারল না।

ধীরে ধীরে কাচারির দরজায় দাঁড়াতেই রাজার পেয়াদা পরিচয় জেনে আমাদের নিয়ে গেল নায়েবের কাছে। নায়েব পূর্ববঙ্গের লোক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক। আমার পরিচয় পেয়ে সাদরে বসতে দিলেন। মাজেনও বসল আমার পাশে।

এমন সময় বাইরে গণ্ডগোল শোনা গেল।

নায়েববাবু ত্বরিতে বেরিয়ে গেলেন। যাবার সময় আমাদের বসতে অনুরোধ করে গেলেন। পনের বিশ মিনিট পরে ফিরে এসে বলল, আসুন একটা অদ্ভুত জিনিস দেখবেন।

নায়েববাবু টর্চ হাতে এগোলেন।

দিনের বেলায় টর্চ কি প্রয়োজন ছিল তা বুঝলাম না।

কয়েক মিনিট গিয়েই ভদ্রলোক বললেন, সাবধান। ওই যে লোকগুলো জটলা করছে ওখানে যেতে হবে।

গিয়ে দেখলাম একটা বিরাট পরিত্যক্ত ইঁদারা ঘিরে দশ-বারজন লোক চেঁচামেচি করছে আর ইঁদারায় উঁকি দিচ্ছেন, আর ইঁদারার ভেতর থেকে কোন পশুর গলার শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ভেসে আসছে।

হুজুর বাঘ। বলল একজন পেয়াদা।

পরিত্যক্ত ইঁদারাটা ঝোপেঝাড়ে ঢাকা ছিল। বাঘ তার কোন ভোজ্য প্রাণীকে ইঁদারার পাশে দেখে ঝাঁপ দিয়েছিল নিশ্চয়ই। সঙ্গে সঙ্গে ওই ইঁদারার গভীরে পতন এবং মৃত্যুর প্রতীক্ষা।

নায়েববাবু টর্চ জেলে ভেতরটা দেখতে দেখতে বললেন, না, চিতা। রয়েল নয়।

আমরাও উঁকি মেরে দেখে মনুষ্য সার্থক করলাম। চিতা হল ব্যাঘ্রজাতির মধ্যে সবচেয়ে চতুর ও ক্ষিপ্রগতি অথচ তারই এই পরিণতি!

নায়েববাবু বললেন, চলুন। আরেকটা দর্শনীয় বস্তু দেখবেন।

মীরজুমলার কবরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা মীরজুমলার কবর।

এখানে কি করে মীরজুমলার কবর এল ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই জানেন নেপোলিয়ন রাশিয়া জয় করতে গিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মস্কোর দরজায় এসে হাজির হলেন। অবরোধ করলেন মস্কো নগর দুর্গ। কিন্তু মস্কো দখল করা আর হল না। শেষ পর্যন্ত বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করে নেপোলিয়ন ফিরে এসেছিলেন।

বললাম, মস্কোর শৈত্য প্রবাহকে বলা হয় সেকেণ্ড দুর্ভেদ্য রাশিয়ান ফোর্ট। এবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও হিটলার মস্কোর দরজার থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছিল শীতের তাড়নায়।

আসামের তৎকালীন রাজাদের সেকেণ্ড দুর্ভেদ্য ফোর্ট হল আসামের জলবায়ু এবং ম্যালেরিয়া। মোগলরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা জয় করতে ঢাকা থেকে জলপথে সৈন্য এনেছিল। এই সব সৈন্যদের অধিকাংশ ছিল উত্তরভারতীয় অথবা আফগান। এরা আসামের জলবায়ুর সঙ্গে পরিচিত ছিল না। পেটের রোগ আর ম্যালেরিয়াতে মোগলদের বলবীর্য প্রায় নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম দেখে মীরজুমলা স্থলপথে ঢাকা ফেরার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খোদা নারাজ। এই যে কাচারি বাড়ি এখানে ছিল মোগলদের চটি। এখানে এসেই অসুস্থ মীরজুমলার ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যু ঘটে। তাকে এখানেই সমাহিত করা হয়।

কিন্তু এই কবর সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা তো হয়নি।

কে করবে বলুন, তবুও রাজাবাহাদুর এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব বুঝে এটা বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিহাস! হ্যাঁ, ইতিহাস। বিকৃত ইতিহাস নয়।

এমনি ভাবেই অবহেলিত রয়েছে রাজমহল থেকে পশ্চিম দিকে যাবার বাদশাহী সড়কের ধারে মীরণের কবর। মীরজাফরের নন্দন মীরণ খবর পেয়েছিল, দিল্লির ভবিষ্যত বাদশাহ আলি গওহর তথা দ্বিতীয় শাহ আলম তাঁবু খাটিয়েছেন বাদশাহী সড়কের ধারে।

মীরজাফর গদীতে বসলে কি হবে, বাদশাহী সনদ না পেলে তার সুবেদারী গ্রাহ্য হবে না। মীরণকে পাঠাল সনদ মঞ্জুর করতে। তারপরই দুর্ঘটনা।

রাজমহলের জঙ্গলে নারকোল বাগানে বজ্রাঘাত মীরণের মৃত্যু ঘটল, কেউ বলল মীরজাফর খবর পেয়েছিল, সুবেদারী সনদ নিজের নামে হাসিল করতে যাচ্ছিল মীরণ। পুত্রের এই তঞ্চকতা বুঝতে পেরে মীরণের পেছন পেছন মীরকাশেমের নেতৃত্বে গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছিল স্বয়ং মীরজাফর। বর্ষাকাল, আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নেমেছিল। মীরণ তার দলবল নিয়ে রাজমহলের বাদশাহী সড়কে গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল, এমন সময় ঘাতকরা লাফিয়ে পড়েছিল তার ওপর। তাকে হত্যা করে রাতারাতি সেখানে কবর দিয়েছিল।

সে কবরও আজ অবহেলিত।

মীরজুমলার কবরও তেমনি অবহেলিত, সাধারণ মানুষ প্রায় ভুলেই গেছে মীরজুমলার কথা। তার কবরের কথা তো অজানাই থেকে গেছে।

নায়েববাবু না বললে আমি জানতেও পারতাম না। মাজেন কিন্তু জানত এই অবহেলিত কবরের কথা। কবর দেখাতেই সে নিয়ে এসেছিল এই দুর্গমস্থানে।

নতুনদিকে বলেছিলাম, ইতিহাস বড়ই করুণ ও কঠোর। পরাজিতের কোন ইতিহাস থাকে না নতুনদি, জয়ীর প্রশংসায় আমরা মুখর হয়ে উঠি।

মাজেন আমার সঙ্গী।

একদিকে কোচবিহার রাজ্য আরেক দিকে আসামের আদিবাসী অধ্যুষিত বনাঞ্চল। এই বনাঞ্চলের ওপর সামগ্রিক অধিকার যাদের তাদের অধিকাংশই রাজবংশী সম্প্রদায়। এরা কোচবিহার রাজা বিশ্বসিংহের উত্তরপুরুষের দাবীদার। বিশ্বসিংহও সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতির দাবিদার। কোচবিহার রাজ্য বিভক্ত হয়ে যে সব জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজ রাজত্বের প্রথম যুগে, তারা হল বিজনী, পর্বতজোয়ার, বিলাসীপাড়া ইত্যাদির জমিদার। গৌরীপুরটা ঠিক কিভাবে গড়ে উঠেছিল তা জানা নেই, তবে ইংরেজ যখন রঙ্গপুরে ঘাঁটি করে উত্তরবঙ্গে প্রশাসন পরিচালনা করত তখন গৌরীপুর ছিল রঙ্গপুর জেলায়।

মাজেনকে সঙ্গে করে যখন ডিমাপুর স্টেশনে নামলাম তখন প্রশাসনিক পরিবর্তনটা চোখে পড়ল। মাজেন বলল, আমরা নাগাভূমিতে এসেছি স্যার।

বললাম, এবার তোমার ছুটি। এই আমার প্রথম মনিপুর গমন। মনিপুর যাব দেখতে ও জানতে।

মাজেন মনে মনে দুঃখিত হলেও মুখে কিছু বলল না। আমি বললাম, ফেরার পথে কোকড়াঝাড়ে নেমে তোমার বাড়িতে ক'দিন থাকব।

মাজেন উৎসাহের সঙ্গে বলল, ঠিক আসবেন তো স্যার।

ঠিক, ঠিক, ঠিক।

সে রাত্রে আমরা একটা হোটেলে কাটালাম। বাঁশের চাটাই দিয়ে ঘরগুলো তৈরি। তাতেই রাত কাটাতে অন্য কোন অসুবিধা না হলেও ছারপোকার দংশনে সারারাত বসেই কাটাতে হয়েছিল।

সকালবেলায় মাজেন দুঃখিত ভাবে বিদায় নিল, আমিও গিয়ে উঠলাম মনিপুর সরকারের যাত্রীবাসে।

উত্তরপূর্ব ভারত বৃষ্টিবহুল স্থান। ঘন বন, পাহাড় পর্বত। নদী ঝর্ণা ঘেরা। জনজীবনে প্রাকৃতিক এই বৈশিষ্ট বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে এসেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এই অঞ্চলেই নেফা (বর্তমান অরুণাচল), নাগাল্যাণ্ড, মনিপুর, লুসাই পার্বত্য অঞ্চল (বর্তমান মিজোরাম),

ত্রিপুরা, মেঘালয় ও আসাম। প্রত্যেক রাজ্যের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য যেমন বিভিন্ন রয়েছে তেমন রয়েছে তাদের ভাষা, আচার আচরণ, পোশাক ও সামাজিক নানা ব্যবস্থা।

মাজেনকে বিদায় দিয়েছিলাম ডিমাপুরে। যদিও এই ছোট অথচ রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ শহর নাগাল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, তবুও বিশেষভাবে নজর দিলে ভৌগলিক ভাবে আসামের সমতল অংশের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলেই মনে হবে।

ডিমাপুর থেকে বাস ছেড়ে কয়েকমাইল গিয়েই পাহাড়ের তলায় নিচু গার্ডে দাঁড়ায়।

পুলিশ সামান্য কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর যারা মনিপুরী ও নাগা নয় তাদের কাছ থেকে কিছু entry fee নিয়ে লিখিত ভাবে নাগাল্যাণ্ডের মাঝ দিয়ে মনিপুর যাবার অনুমতি দেয়।

Check post-এর অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে entry fee কি দিতে হয়?

ভদ্রলোক মৃদুস্বরে বললেন, এটা entry fee নয় আসলে এটা Protection fee। বর্তমানে নাগাল্যাণ্ডে খুবই অশান্তি চলছে, সেই কারণে যাত্রীবাহী ও মালবাহী ট্রাককে পুলিশ protection-এ convoy-এর মারফত যেতে দেওয়া হয়। সেজন্যই এই fee নেওয়া হয়।

তাহলে নিরাপত্তা ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে এই fee সরকার আদায় করে।

ভদ্রলোক মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, রাইট্।

পাহাড় কেটে রাস্তা। দক্ষিণ ভারতের মত শুষ্ক পরিবেশ নয়, বড় বড় শাল সেগুন গাছ রাস্তার দুপাশে। দিনের আলো অনেক জায়গায় সব সময় দেখাও যায় না। অতি নিপুণতার সঙ্গে ড্রাইভার উঠতে থাকে পাহাড়ে। ঘণ্টা তিনেক চলার পর অনেকটা মালভূমি দিয়ে গাড়ি চলছিল। পাহাড়ের নিচে নাগাদের গ্রাম, তাদের টেরাস ফার্মিং যেমন দেখা গেল তেমনি দেখা গেল বিচিত্র রঙ্গীন পোশাক পরিহিত নাগা পুরুষ ও রমনীদের পথ চলতে। পুরুষদের নিম্ন অঙ্গে যে পরিধেয় তা কোনরকমে লজ্জা নিবারণ যোগ্য, উর্ধাঙ্গ মোটা কম্বল ঢাকা, মাথায় পাখির পালক, জন্তুর হাড় ইত্যাদি দিয়ে তৈরি শিরস্ত্রাণ, কারও হাতে বল্লম, কারও হাতে খোলা তরোয়াল, কারও হাতে তীর ধনুক। মেয়েদের বেশভুষা মনোহারী। তারা হাড়ের, কড়ির, ঝুটা মোতি ও পলার অলঙ্কার দিয়ে দেহের উর্ধাঙ্গ ঢেকে রাখে, স্তনযুগল কারও খোলা, কারও আচ্ছাদিত। স্তনকে লোক চক্ষুর বাইরে রাখাটা যে সভ্যতার লক্ষণ এটা ওরা গ্রাহ্য করে না। আবার শহরে দেখেছি উৎকট ইউরোপীয় ধরণের পোশাক-আশাক পুরুষ ও নারীদের পরণে।

শহরে অথবা শহরমুখী যারা তাদের শিক্ষার মান বেশ উন্নত। ইউরোপীয় মিশনারীরা নাগা সম্প্রদায়কে শিক্ষা-দীক্ষায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে। ওদের

ভাষা না জানলেও ইংরেজি ভাষায় কথাবার্তা মোটামুটি চালানো যায় নাগাল্যাণ্ডে।

দক্ষিণ ভারতেও একই অবস্থা। স্থানীয় ভাষা না জানলেও ইংরেজি দিয়ে মোটামুটি কাজ চালানো যায়। পূর্বভারতের মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, অরুণাচল ও মেঘালয়ে স্থানীয় ভাষা না জানলেও ইংরেজি দিয়ে মনের ভাব আদান প্রদানে অসুবিধা হয় না।

গাড়ি এসে দাঁড়াল কোহিমার বাস স্ট্যাণ্ডে

ছোট শহর। দার্জিলিং-এর মত উঁচু নিচু টিলায় বাড়িঘর, রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এঁকে বেঁকে শহরের সবটাকে যেন ঘিরে রেখেছে।

গাড়ি কিছুক্ষণ দাঁড়াবে।

নবাগতরা নেমে পড়ল প্রাতঃরাশের জন্য।

আমিও নেমে পড়লাম।

সামনেই কবরখানা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যে সব বৃটিশ সৈন্য আজাদ হিন্দ বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিল তাদের গণকবর। সামনে ইংরেজিতে লেখা আছে, এই সব বীর সেনানী তাদের বর্তমানকে জাতির ভবিষ্যতকে রক্ষা করতে প্রাণ দিয়েছে। তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই ফলক বসানো হল।

ধীরে ধীরে কবরখানার প্রবেশ পথে উঠে তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, যারা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য আমাদের সরকার তো কোন স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা আজও করেনি। যারা পরাধীনতা কায়েম রাখতে প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা অথচ যারা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণ দিয়েছে তাদের জন্য ভাবনা চিন্তা করার লোক নেই, আশ্চর্য!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন একজন মনিপুরী ভদ্রলোক।

জিজ্ঞেস করলেন, কি দেখছেন?

দেখছি না। ভাবছি, যা দেখছি তাতে কোন আগ্রহ নেই, যা দেখছি না তাতেই আমার আগ্রহ বেশি।

ভদ্রলোক হয়ত কিছু বলতেন কিন্তু বাসের হর্ন শুনে দুজনেই নেমে এসে বাসে উঠে বসলাম।

মনিপুর আর নাগাল্যাণ্ড সীমান্ত শহর মাও।

এখানে প্রচুর হোটেল। দুপুরে খাবার জায়গা।

মাও আমার স্মৃতিপটে আজও জ্বলজ্বল করছে। নাগা মহিলা ডাক্তার এয়ামার সঙ্গে পরিচয় মাও-তে। আমার বেশভূষা দেখে বুঝতে পেরেছিল আমি এসেছি মনিপুর বেড়াতে।

জিজ্ঞেস করেছিল, তুমি বুঝি ইম্ফল যাবে?

হাঁ।

বেড়াতে বেরিয়েছ। আমাদের দেশটা দেখেছ কি ?

এই তো দেখছি।

রেলে চেপে কোথাও যাবার সময় কত স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায়। তাতে কি মনে হয় সেইসব স্টেশনের সঙ্গে যেসব শহর বা গ্রাম জড়িত তা তুমি দেখেছ। তেমনি কোহিমা আর মাও কয়েক ঘণ্টার জন্য পেরিয়ে গিয়ে তুমি কি বলতে পারবে, কোহিমা অথবা মাও কেমন জায়গা, কেমন ধারা এখানকার জীবনযাত্রা।

অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

নাগাভূমি দেখতে চাও তো আমার সঙ্গে চল।

চমকে উঠলাম। ভয়ও পেলাম, শুনেছি, নাগারা head hunter. ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাকে নিয়ে গিয়ে মাথা কেটে নিলে আহা বলার লোকও থাকবে না।

কি ভাবছ বাবু। ভয় পাচ্ছ ?

তা একটু ভয় ভয় করছে বই কি। তোমার সঙ্গে সদ্য পরিচয় পথ চলতে। তোমার সঙ্গে অজানা জায়গায় যেতে ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

ডাক্তার এরামা হেসে বলল, আমার পরিচয় হল, আমি ডাক্তার। ডিব্রুগড় থেকে পাশ করে আমাদের সরকারের হেলথ সেন্টারে কাজ করছি। ওই যে পাহাড়ের টিলায় কতকগুলো বাড়ি দেখছ, ওখানেই আমার কর্মস্থল। দু চারদিন নিরাপদে কাটিয়ে আমাদের আচার আচরণ দেখে তারপর তোমার গন্তব্যস্থলে যেও। আমি তোমাকে এখানে এসে গাড়িতে তুলে দিয়ে যাব।

আমি বুঝতে পারছিলাম না এত আন্তরিকতা কেন।

তোমার মালপত্র কিছু আছে ? একটা ব্যাগ ? দাও আমার হাতে।

একেবারে নাছোড়বান্দা। আমি হতভম্বের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এরামা আমার হাত থেকে ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে বলল, চল। এখানে অন্যকোন যানবাহন নেই। আকাশের অবস্থা ভাল নয়। দেরি কর না।

টিকটিকি যেমন পোকা মাকড়কে মুখে তুলে নেয় তেমনিভাবে আমাকে টানতে টানতে নিয়ে চলল এরামা।

কয়েকদিন কেটে গেল এরামার হেলথ সেন্টারে। আমাকে মাওতে এনে গাড়িতে তুলে দিয়ে আমার নাগাভূমি দর্শনপর্বের সাময়িকভাবে যবনিকা টেনে দিল।

একদিন অপরাহ্নে পৌঁছলাম ইম্ফল শহরে। এই শহরের সঙ্গে আগেও পরিচয় হয়েছে। এবার নতুন যেন করে দেখা।

চারিদিকে পাহাড় ঘেরা শহর, শহরের পাশ দিয়ে ছোট ইম্ফল নদী বয়ে চলেছে।

এরামার নির্দেশ মত হোটেলে উঠলাম।

মনিপুরের যে মহান ব্যক্তিটির সঙ্গে দেখা করতে পরিচয় পত্র দিয়েছিল এরামা তিনি হলেন এখানকার একজন রাজকুমার। তবে আশ্রয় নিয়েছিলাম পুরনো

শর্মাজীর হোটেলে। শর্মাজী আশা করেনি কোনদিন ফিরে তারই হোটেলে উঠবে। আমাকে দেখেই চিনতে পেরে এগিয়ে এসে হাত ধরে বলল, আমার কি ভাগ্য।

রাজকুমার শুনে মনে করেছিলাম, বিরাট অট্টালিকার অধিকারী রাজবংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি।

কিন্তু রাজকুমারের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে আমার ভুল ভাঙ্গল।

খড়ের ছাউনি, ছাঁচা বেড়ার বাড়ি হল রাজকুমারের নিজস্ব প্রাসাদ।

কিছু দূরেই মনিপুর রাজার বিশাল প্রাসাদ, প্রকাণ্ড জলাধার ও গোবিন্দজির মন্দির।

রাজকুমার অতি সাধারণ ব্যক্তি, রাজবংশে জন্ম, তাই জমিজমা হয়ত প্রচুর আছে। কিছু থাকুক আর না থাকুক আভিজাত্যবোধ যথেষ্ট। মনিপুরে রাজকুমারের ছড়াছড়ি।

রাজকুমারের কাছেই শুনেছি মনিপুরের অনেক কথা উপকথা। লোগতাক হ্রদ, থৈইবীর আত্মত্যাগ ইত্যাদি কিন্তু একবারও তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কথা বলেননি। একবার মাত্র বলেছিলেন, ইম্ফলে জাপানীরা প্রবেশ করতে পারেনি, উখরুলে প্রবেশ করেছিল।

জাপানীরা দখল করেছিল ?

হাঁ, আজাদ হিন্দ বাহিনীকে এগোতে দেয়নি জাপানীরা। তারা নেতাজীকে সামনে রেখে ভারত দখলের পরিকল্পনা করেছিল, তারা প্রতি পদক্ষেপে নেতাজীকে প্রতারণা করেছিল। এমন কি যখন বৃটিশ সৈন্য পালিয়ে যাচ্ছিল তখনও যদি তারা নেতাজীর নির্দেশমত ডিমাপুর দখল করত তাহলে উত্তর আসাম বিচ্ছিন্ন হলে অসমীয়া জনসাধারণের সহযোগিতা পেতেন নেতাজী। কিন্তু আজাদ হিন্দ বাহিনীকে কোনমতেই জাপানীরা অসমে প্রবেশ করতে দেয়নি।

নতুন কথা শুনলাম।

জানেন নতুনদি, ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস যদি কোনদিন লেখা হয় তখন প্রত্যক্ষদর্শীদের এই সব বয়ান বোধহয় লেখা হবে না, লোকে জানবেও না।

মনিপুর থেকে ভারাক্রান্ত মনে ফিরে এসেছিলাম। তবে মনিপুরের অধিবাসীদের ওপর কেমন একটা মমতা জন্মেছিল। বিশেষ করে মনিপুরী মেয়েদের স্বাধীন জীবনযাত্রা প্রণালী আমাকে অভিভূত করেছিল। আমাদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিন্তু মেঘালয়ের খাসি, মনিপুরের মৈতি সম্প্রদায়ে নারীর আসন পুরোভাগে, পুরুষ অনেকটা নারীর উপর নির্ভরশীল।

বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা কিভাবে মনিপুরে প্রভাব বিস্তার করেছিল তা গবেষণার বিষয় কিন্তু কোন এক অখ্যাত দিনে কর্ণাটকের বিজয়নগর থেকে ভাগ্যান্বেষী ব্রাহ্মণ তনয় বিজয় সেন এসে গৌড়ে আধিপত্য বিস্তার করেছিল তা সঠিক

বলা কঠিন। এরই বংশধর লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য ছিল গৌড়বঙ্গেও। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় কবি জয়দেব গীত গোবিন্দ রচনা করেছিলেন। বোধহয় এই সময় থেকেই বৈষ্ণবীয় চিন্তাধারা পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

এর পরই সুলতানী আমলে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম প্রসার লাভ করে গৌড়বঙ্গে, ওড়িষায় এবং দাক্ষিণাত্যে। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বিস্তার লাভ করে ত্রিপুরাতে। ত্রিপুরার রাজবংশ শক্তি উপাসক ছিলেন কিন্তু পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব পড়েছিল রাজবংশে।

কিন্তু মনিপুরকে মনে হয়েছিল বৈষ্ণব শাস্ত্র, বৈষ্ণব কালচার ও বৈষ্ণব সাহিত্যের খনি।

হোটেলওলা শর্মাজীকে বলেছিলাম, শোনা যায় ওয়েস্ট ইনডিজের ছেলেরা দশ বার বছর থেকেই ক্রিকেট খেলে থাকে সমুদ্রের ধারে, গ্রামের মাঠে, শহরে। ওটা ওদের ন্যাশন্যাল গেম। আমার মনে হয় মনিপুরের ন্যাশন্যাল শিল্প ও ধর্ম হল বৈষ্ণব কালচারের বিকাশ ঘটানো।

শর্মাজী আমার মন্তব্যে খুশি হয়ে বলেছিল, তা বলতে পার।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে কতদিন এই শিল্প বেঁচে থাকবে তা বলা কঠিন।

পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে আমরা অনেক কিছুই হারাই। অতীতে জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতার অনেক অমূল্য সম্পদ রক্ষা পেয়েছে। দেশীয় নৃপতিরাও অনেক মূল্যবান সম্পদ অকালে লোপ পাওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য মধ্যসত্ত্বভোগী শোষক ছিল এই দুটো শ্রেণীই তবুও তারা শোষণের কণিকাও সৎকাজে ব্যয় করত। বর্তমানে এই দায়িত্ব বর্তেছে রাষ্ট্রের ওপর। রাষ্ট্রব্যবস্থা চলেছে দলীয় রাজনীতির ভিত্তিতে। দল যা পছন্দ করে না তার প্রতি নজর দেবার চেষ্টাও করে না। কারণ এই সব শাসকদের অধিকাংশই কস্মিনকালেও দেশের জন্য সামান্য ত্যাগ স্বীকার না করে ফোকটে স্বাধীনতার মধু পান করছে জনসাধারণকে ভাঁওতা দিয়ে। আগের দিনের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আমরা ঘৃণ্য মনে করি কিন্তু ততোধিক ঘৃণ্য হল সেই সব শাসক ও তাদের তাঁবেদাররা যারা গণতন্ত্রের নামে শোষণ, ব্যক্তি স্বার্থ সিদ্ধি, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে ইতিহাসের পাতা কলঙ্কিত করছে। তারা যদি অতীতকে শ্রদ্ধা করত তাহলে দেশের চেহারাই বদলে যেত। এরা তা চায় না। তাই কিছু করে না।

মুসলমান রাজত্ব কালে হিন্দু যুগের বহু স্থাপত্য-ভাস্কর্য নষ্ট হয়েছে। আবার ইংরেজ রাজত্ব কালেও অতীতের অনেক অমূল্য সম্পদ নষ্ট হয়েছে, বহু সম্পদ জাহাজ বোঝাই দিয়ে ইংরেজ নিজের দেশে নিয়ে গেছে। এই ভাবেই ভারতীয় সম্পদ লুপ্ত হবার সম্মুখীন।

নতুনদি বলেছিলেন, এতে আপশোষ করার নেই ভাই। সমাজ ব্যবস্থার

ওপর সবটাই নির্ভর করছে। আমাদের খুশীদা সেদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, সাতাশ বছর জেলে আর আন্দামানে কাটিয়ে এসেছি কিন্তু যাদের জন্য এই দুঃসহ জীবন যাপন করেছি, মূল্যবান যৌবনকে উৎসর্গ করেছিলাম তাদের কাছে সামান্য শ্রদ্ধাটুকুও আজ পাইনা। অথচ বিশ বছর জেলখানায় বাস করার পর ম্যাণ্ডেলাকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানাতে দেশের লোক উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেয়ে দেশের সংগ্রামের জন্য আমাদের সংগ্রাম কি কম গুরুত্বপূর্ণ?

খুশীদাকে বলেছিলাম, এদের একটিই অলঙ্কারের ভূষিত করা যায়, ঘর জ্বালানি পর ভোলানি। তবু আমি জানি, কোন লাভের আশায় তো আপনারা লড়াই করেননি। গীতার ধর্ম মা ফলেষু কদাচন মেনে চলেছেন, সেটাই মেনে চলুন।

নতুনদির কথা শুনে হাসব কি কাঁদব ঠিক করতে পারছিলাম না।

বললাম, মেনে নিতেই হবে। না-মানার বিকল্প তো কিছু নেই নতুনদি।

নতুনদিকে না পেলে মন উজাড় করে কথা বলতে পারতাম না, নির্মলবাবুও আমার সম্বন্ধে আগ্রহী হতেন না।

নির্মলবাবুকে সব সময়ই মনে হয়েছে পার্থিব বিষয় সম্বন্ধে উদাসীন। বিধাতা দেখবার জন্য চোখ দিয়েছেন তাই দেখে চলেছেন। মতামত কোন সময়ই দেননি। অর্থাৎ কোন বিষয়ে কোন গুরুত্ব দেবার অভ্যাস তাঁর নেই, এটাই আমার বিশ্বাস। এই বিশ্বাস বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। নতুনদি কথায় কথায় বলেছিলেন, তোমার পূর্বপুরুষ তো শ্রীভূমি থেকে মধ্যবঙ্গে এসে বসবাস করছেন।

নির্মলবাবু বললেন, একেবারে চৈতন্য চরিতামৃতের বচন। মহাপ্রভুর পূর্বপুরুষও শ্রীভূমি থেকে এসেছিলেন, মধ্যবাংলায় শান্তির নীড় তৈরি করেছিলেন। শোনা যায় মহাপ্রভু একবার মাত্র শ্রীভূমিতে গিয়েছিলেন পিতামহীকে দেখতে, আমার বেলায় সবই স্বতন্ত্র। আমাদের আগমন কাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। কলকাতা তখনও ছিল ভারতের রাজধানী। অর্থাৎ আমাদের সঙ্গে শ্রীভূমির সম্পর্ক দেশভাগ হবার আগেই ঘনিষ্ঠ ছিল। ছোটবেলায় আমিও কয়েকবার শ্রীভূমি দর্শণ করেছি। আমার প্রথম বিদ্যাস্থানও ছিল শ্রীভূমিতে। অবশ্য মাত্র দুবছর। তারপর আর বেশিদিন থাকতে হয়নি।

কিছুক্ষণ থেমে নির্মলবাবু বললেন, শ্রীভূমি মানেই শ্রীহট্ট অর্থাৎ বর্তমান সিলেট, শুধু মহাপ্রভুর জন্যই খ্যাত এমন নয়। আরও মহাপ্রভু জন্মেছেন এই শ্রীভূমিতে। দেশ ছেড়েছি, সব হারিয়েছি তবুও শ্রীভূমির গৌরব গাথা এখনও ভুলিনি। শেষ যেবার গিয়েছিলাম সেদিনের কথাই বলব। আপনার নতুনদি এসব জানেন কিনা বলতে পারি না। আমার বয়স তখন কত?

জানিনা। তবে কিশোর আমি।

গাড়ি চলছে।

যুদ্ধের সময় গাড়ির সংখ্যা কম।

লাকসাম থেকে যাত্রা শুরু।

তারপর।

কুমিল্লা।

শ্রীমঙ্গল।

ভানুগাছ।

শুনেছিলাম ভানুগাছ ছিল আমার কোন পূর্বপুরুষের বাসস্থান।

সবই শোনা কথা হলেও কিছুটা ঐতিহাসিক ভিত্তি নিশ্চয়ই আছে।

অতীতে এই দেশের রাজা ছিলেন ভানুনারায়ণ। নিজের নামের সঙ্গে নাম মিলিয়ে রাজধানীর নাম রেখেছিলেন ভানুকচ্ছ। আজ তার অপভ্রংশ হল ভানুগাছ।

ভানুনারায়ণ ছিলেন ইটা রাজ্যের রাজা, রাজধানী ভানুকচ্ছ।

আজ এ স্মৃতি প্রায় মুছেই গেছে সাধারণ মানুষের মন থেকে।

ইটা রাজ্যের পত্তন করেন ভানুনারায়ণের বাবা শুভরাজ খাঁ। যার বনিয়াদ পত্তন হয় শুভরাজের চেষ্টায়, তাকে দৃঢ় করেছিলেন ভানুনারায়ণ।

ভানুনারায়ণের পুত্র সুবিদনারায়ণ।

সুবিদনারায়ণের কন্যা রত্নাবতী।

রাজার দুর্ভাগ্য, কন্যারও দুর্ভাগ্য, রত্নাবতী জন্মান্ধ ছিলেন।

অন্ধ রাজকন্যাকে শ্রুতিপাঠ দিয়ে নানা শাস্ত্রে দক্ষ করেছিলেন রাজার দ্বারপণ্ডিত গোবিন্দ চক্রবর্তী। গোবিন্দ পণ্ডিতের খ্যাতি ইটা রাজ্যের সর্বত্র। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত রত্নাবতীর যৌবন প্রাপ্তি ঘটলে রাজা নিবেদন করলেন গোবিন্দপণ্ডিতকে, আপনি রত্নাবতীকে সুশিক্ষিত করেছেন। এবার যেমন করে হোক্ তাকে কোন সুপাত্রে অর্পন করার তার ব্যবস্থা করুন।

গোবিন্দ চক্রবর্তী কন্যাসমা রত্নাবতীর জন্য বিশেষ চিন্তিত হলেন কিন্তু অন্ধ রাজকন্যাকে বিবাহে অনিচ্ছা জানাল বহু সুপাত্র। অবশেষে স্থির করলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুপতির সঙ্গেই রত্নাবতীর বিবাহ দেবেন। রাজসকাশে গিয়ে বললেন, হে মহারাজ আপনার কন্যার জন্য আমার জ্যেষ্ঠপুত্র রঘুপতিকে উপযুক্ত পাত্র মনে করি। আপনার সম্মতি লাভ করলে বিবাহের আয়োজন করতে পারি।

সানন্দে রাজা সম্মতি দিলেন।

বিঘ্ন ঘটালো রঘুপতির জননী। তিনি আপত্তি জানালেন, ঘোরতর আপত্তি। অন্ধ রাজকন্যাকে পুত্রবধূ করে ঘরে তুলতে রাজি নন। কিন্তু যে বিবাহের কথা স্থির তা অস্থির করার কোন চেষ্টাই করলেন না গোবিন্দ চক্রবর্তী। নির্দিষ্ট দিনে রঘুপতির সঙ্গে রত্নাবতীর বিয়ে হল। গোবিন্দ

চক্রবর্তীর স্ত্রী কনিষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনকে নিয়ে রওনা হলেন নবদ্বীপের পথে। শ্রীভূমি থেকে সোজা শ্রীধাম নবদ্বীপে।

মাতার আঁচলের তলায় বড় হতে থাকেন রঘুনন্দন।

নবদ্বীপে রঘুনন্দন স্মৃতিশাস্ত্র পাঠ করে খ্যাতি লাভ করেন। পাঠ সম্পূর্ণ করতে গেলেন কাশীধামে। সেখানে পাঠ সমাপ্ত হতেই রঘুনন্দন ফিরে এলেন নবদ্বীপে, তবে তা সহজে সম্ভব হয়নি। কাশীর পণ্ডিতবর্গ রঘুনন্দনকে কোন স্মৃতি গ্রন্থ বাংলাদেশে নিয়ে যেতে দেননি। রঘুনন্দন তার জন্য মোটেই দুঃখিত হননি। গোটা স্মৃতিশাস্ত্র তখন তাঁর কণ্ঠস্থ। উনি নবদ্বীপে ফিরে এসেই স্মৃতির দুয়ার উন্মুক্ত করে স্মৃতিশাস্ত্র লিখলেন।

সমগ্র বঙ্গ উদ্ভাসিত হল রঘুনন্দনের পাণ্ডিত্যে। স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দনকে চিনলেন সবাই, ভুলে গেলেন গোবিন্দ চক্রবর্তীকে।

মানুষ ভুলে গেছে গোবিন্দ পণ্ডিতকে।

মানুষ ভুলে গেছে সুবিদনারায়ণের দুর্ভাগ্যের কথা।

মানুষ ভুলে গেছে ভানুগাছের গৌরবময় ইতিহাস।

মানুষ ভুলে গেছে রঘুপতিকে, ভুলে গেছে সুবিদনারায়ণের পুত্রদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কথা।

কিন্তু আজও বাংলার মানুষ ভোলেনি রঘুনন্দনকে।

শ্রীভূমির সঙ্গে বাংলার এবং বাংলার সংস্কৃতির এত বড় পরিচয়টা এখনও স্পষ্ট নয়। লোককথার ওপর নির্ভর করেই আমরা ভানুগাছকে মনে করে থাকি।

বলতে বলতে থেমে গেলেন নির্মলবাবু।

নতুনদি বললেন, এত কিছু তোমার মনেও থাকে।

নির্মলবাবু বললেন, তুমি তো জান, বেদকে শ্রুতি বলে। যখন লেখার প্রচলন ছিল না তখন বেদের শ্লোক মুখস্ত করে অপরকে শোনানো হত, তাই তাকে বলে শ্রুতি। হোমারের বিরাট দুটো কাব্যও লোকে বংশ পরম্পরায় সঙ্গীতের মাধ্যমে শুনত, তখন লেখার প্রচলন ছিল না, পরবর্তী কালে সেই গান লিপিবদ্ধ হতেই দুটো মহাকাব্যের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষ পরিচিত হয়েছিল। শ্রীভূমির এই গৌরবকাহিনীও লোক মুখে প্রচারিত হয়ে আসছে তবে কিছুটা কাল্পনিক হলেও রঘুনন্দন চির সত্য।

আমি বললাম, অবশ্যই।

নির্মলবাবু বললেন। কাহিনীর শেষ এখানেই নয়। আরও আছে।

॥ নয় ॥

চিঠি পেলাম নওসের আলির।

লিখেছে : আর এক বছর সাত মাস বাইশ দিন পরে অবসর নিতে হবে। অথচ শেষ বয়সে আমাকে কক্সবাজার সার্কেলে বদলি করে চরম শাস্তি দিচ্ছে। আমার অপরাধ যে কি তা আমি নিজেও জানি না। ভাবছি প্রাপ্য ছুটি নিয়ে ফিরে যাব ঢাকায়।

তবে স্থানটি অতি মনোরম। যাতায়াতের ভয়ঙ্কর অসুবিধা। জাহাজে মাল ও মানুষ গাদাগাদি করে যাতায়াত করে। সামনে বিশাল সমুদ্র, পেছনে আমাদের দেশ। তুই যদি এখানে বেড়াতে আসিস তাহলে আনন্দ পাবি। অবশ্য এখানকার যা ভাষা তা শুনলে তোর মনে হবে না বাংলাদেশে বাস করছি। শিক্ষা ব্যবস্থা খাঁটি বাংলায় তাই শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথা বলতে কোন অসুবিধা হয় না। তুই তো আসবি বলেছিলি, একবার চলে আয়। অনেক-দিন পর বেশ গুলতানি করা যাবে। তোর পাশপোর্ট আছে তো? না থাকলে তাড়াতাড়ি করে নিবি, আমি স্পনসর করব।

মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। সে এখন সিলেটে আছে। এখানে আমি আছি বেগমসাহেবাকে নিয়ে। ছেলেরা সবাই ঢাকায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমন্ত্রণটা খুবই আন্তরিক।

যাওয়াটা এমন কিছু ব্যাপার নয় তবুও প্রস্তুতি নিতে একমাস কেটে গেল। নওসেরকে চিঠি দিলাম রওনা হবার একমাস আগে। কোনদিন কোন সময়ে বাংলাদেশ বিমানে চট্টগ্রাম পৌঁছাব তাও লিখে দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে পৌঁছে সবেমাত্র কাস্টমসের গণ্ডী পেরিয়েছি এমন সময় দেখি নওসের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে। প্রথমে চিনতে কষ্ট হয়েছিল। নওসেরের সে চেহারা আর নেই, কাঁচা-পাকা চুলে মাথা ভর্তি, বেশ কায়দা করে ফ্রেঞ্চকাট দাঁড়িতে মুখ ভর্তি, বেশ ইংরেজি কায়দার পোশাক। গলায় টাই নেই, তবে আমাকে দেখেই সে হেসেছিল, সেই হাসি তাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।

প্রথমেই নওসের বলল, শেষ পর্যন্ত এসেছিস, ভেবেছিলাম তুই বোধহয় আসবি না।

হেসে বললাম, কথার খেলাপ আমি করি না তাতো জানিস।

নওসের হেসে বলল, সেটাই আমার ভরসা। আর নয়, বাইরে গাড়ি দাঁড় করানো আছে, দেরি করলে আজ আর পৌঁছানো যাবে না। দুর্গম পথ, নদী নালা, নৌকা স্টিমার। তিনটের মধ্যে স্টিমার ছাড়বে। এটা ফেল করলে আবার কাল সকালে।

কথা বলতে বলতে আমরা গিয়ে উঠলাম বাইরে দাঁড় করানো নওসেরের

ভাড়া করা গাড়িতে।

কর্নফুলি নদীর ধারে এসে হাত তুলে চট্টগ্রামকে নমস্কার করলাম।

কাকে নমস্কার করলি? জিজ্ঞাসা করল নওসের।

বললাম, চট্টগ্রামকে। চট্টগ্রাম আমাদের কাছে তীর্থস্থান। আজ যে স্বাধীনতার বড়াই করি তার বুনিয়াদ তৈরি করতে চট্টগ্রামের তরুণ তরুণীরা যেভাবে বুকের রক্ত দিয়েছে সেটা কিন্তু আমরা ভুলতে পারি না, পারবও না কখনও। তাদের স্মৃতিভরা চট্টগ্রামকে নমস্কার করলাম।

নওসের যেন লজ্জিত হল।

বলল, সবই জানি ও শুনেছি কিন্তু ওইসব স্বাধীনতা যুদ্ধের শহীদদের বোধহয় সম্যক্ মর্যাদা আমরা দিতে পারিনি, তবে অবহেলাও করিনি।

কর্নফুলি বিরাটাকার নদী।

জাহাজ নোঙ্গর করে আছে, আছে স্টিমার লঞ্চের ভিড়, আছে সাম্পানের ছড়াছড়ি। বন্দর চট্টগ্রাম কর্নফুলির মোহনায়। বড় বড় জাহাজ এসে আশ্রয় নেয় এর পোতাশ্রয়ে। সবকিছু তাকিয়ে দেখার অবসর ছিল না। আমরা জোর কদমে চলেছি শেষ স্টিমার ধরতে।

বেশ বড় স্টিমার।

নদীর বুক কেটে ধীরে ধীরে সাগরে এসে পড়ল তবে উপকূলের কাছ দিয়েই চলছিল স্টিমার। কক্সবাজারও ছোটখাট একটা বন্দর। চট্টগ্রাম থেকে দূরত্ব খুব কম নয়। প্রথম রাতেই আমরা পৌঁছে গেলাম কক্সবাজার।

ছোট শহর কিন্তু ব্যস্ততার কোন ঘাটতি নেই।

সবাই বাঙ্গালী অথচ তাদের কথাভাষা হৃদয়ঙ্গম করা হয়েছিল অসম্ভব।

জাহাজঘাটায় নেমে কুলির মাথায় মাল দিয়ে আমরা হেঁটে পৌঁছলাম নওসেরের ডেরায়। সমুদ্রের ধারে বাংলো প্যাটার্নের বাড়ি। সামনে ছোট্ট একটা বাগান। মনে হল পরিবেশটা নেহাৎ খারাপ হবে না। পথে কুতুবদিয়ার লাইট হাউসের পাশ দিয়ে যখন স্টিমার এগিয়ে চলেছিল তখন মনে হচ্ছিল বিরাট একটা খাঁড়ির মাঝ দিয়ে চলেছি। একদিকে মূল ভূখণ্ডের গাছপালা-গুলো যেমন অন্ধকার সৃষ্টি করে দৃষ্টিপথ রুদ্ধ করছিল অপরদিকে তেমনি কতুবদিয়ার ঘন বনানী আমাদের চোখকে আর এগোতে দিচ্ছিল না।

কেবিনে বসে নওসের বলল, মগের মুল্লুক তো শুনেছিস? আমরা মগের মুল্লুকে যাচ্ছি।

মানচিত্র খুললেই দেখতে পাবি চট্টগ্রামের পূর্ব দিকে বর্মার আরাকান প্রদেশ। এই আরাকানে যারা বাস করে তাদেরই লোকে বলে মগ। তবে এই মগের দেশে খাস বর্মীদের চেয়ে বাঙ্গালী রোহিঙ্গার সংখ্যা বেশি। আরাকানের সদর আকিয়াবেও বঙ্গ সন্তান বেশি তবে চেনা কঠিন?

রোহিঙ্গা কারা?

যে সব বাঙ্গালী অতীতে আরাকানে গিয়ে বসবাস করেছে, স্থায়ীভাবে

ঘরবাড়ি করে কয়েকপুরুষ যাবত বাঙ্গালীয়ানা ছাড়তে পারেনি, অথচ ভাষার বিকৃতি ঘটিয়েছে, তাদের সবাইকে বলে মগ। তারাই রোহিঙ্গী। ধর্মে ওরা সবাই মুসলমান।

বুঝলাম।

আরও আছে ইতিহাস। অওরঙ্গজেবের কাছে পরাজিত হল বাংলার সুবেদার তথা শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শাহ সুজা, পালিয়ে এসেছিলেন চট্টগ্রামে। অওরঙ্গজেবের মোগল হার্মাদরা শাহ সুজার পেছন পেছন তাড়া করে চট্টগ্রাম অবধি আসতেই শাহ সুজা আরাকানে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল। পরের ইতিহাস তমসাবৃত। শোনা যায় সুজার অপূর্বসুন্দরী কন্যাকে বিয়ে করেছিলেন রোহিঙ্গার রাজা। তারপর থেকেই ইসলামের বিজয় পতাকা আরাকানে পত-পত করে উড়তে থাকে। যারা বর্মী তারা এটা সহ্য করতে চায়নি কোন সময়ই। প্রায়শই বাঙ্গালী উদ্বাস্তু তথা রোহিঙ্গাদের সঙ্গে বর্মীদের লড়াই হয়েছে অতি সামান্য কারণেই।

এই সব দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণ খুব সামান্য কি ?

সামান্য নয় মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। আরাকান আর চট্টগ্রাম সীমান্তে যারা বাস করে তাদের মূল পেশা হল চোরাকারবার। হিস্যায় না মিললে উভয়পক্ষ হাতিয়ার নিয়ে নেমে পড়ে। প্রশাসন বর্মীদের হাতে সেজন্য রোহিঙ্গারা বেশি অত্যাচারিত হয়। আরেকটা কারণ হল বর্মী মেয়ে। জানিস তো বর্মী মেয়েরা খুবই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করে। ওদের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের প্রাধান্য রয়েছে। রোহিঙ্গারা বর্মী মেয়েদের বিয়ে করে, তাদের সন্তানাদিও হয় কিন্তু মোল্লাদের নির্দেশ মত মিঞাসাহেবের বিবিরা ইসলামের কানুন মানে না। তাদের কানুন মানাতে গেলেই হাঙ্গামা।

মিঞাদের বিবি তালাক দিতে হয় না। বিবিরাই তালাক দিয়ে মিঞাদের হটিয়ে দেয়। রোহিঙ্গার জনসংখ্যা বৃদ্ধিও বর্মীদের ক্রোধের কারণ, বিশেষ করে বর্মীমেয়ের সন্তানরা যখন ইসলাম মেনে নেয়। এই সব সন্তানদের স্থানীয় ভাষায় বলে কাবিয়া।

কিন্তু!

এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। বর্মার কানুন ওদের স্বপক্ষে, কিছু করার উপায় নেই। তবুও এই অঞ্চলেই জন্মেছিলেন বিখ্যাত কবি আলাওয়াল। আমরা এতে গর্ববোধ করি। রোহিঙ্গা রাজার পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে আলাওয়াল তার অমর রচনা আমাদের দিতে পারতেন কি!

নওসেয়ের বিবি হালিমা খাবার নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন।

একবার নওসেরের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আবার মুখ ফিরিয়ে তার বিবিকে দেখছিলাম। আমার মাথা ঘোরানো লক্ষ্য করে নওসের জিজ্ঞেস করল, কি দেখছিস।

দেখা হয়ে গেছে। ভাবছি, তোর চেয়ে তোর বিবির মাথার চুল খুব বেশি পেকে গেছে। সেবার দেখে গিয়েছিলাম যাকে ইনি কি তিনি।

নওসের ও হালিমা হো-হো করে হেসে উঠল।

হালিমা হাসি থামিয়ে বলল, বয়স।

গল্প গুজবেই রাত কেটে গেল।

সকালবেলায় নওসেরের সরকারী জিপ এসে দাঁড়াল দরজায়।

আমি মুখ ধুয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি এমন সময় নওসের এসে বলল, তাড়াতাড়ি। আজ ছুটি। গাড়িও রেডি, তোকে নিয়ে যাব রোহিঙ্গাদের দেশে।

মানে আরাকানে। সেটা তো বিদেশ। আমার পাশপোর্ট থাকলেও ভিসা নেই।

দরকার হবে না। ওপারের সীমান্তরক্ষী থানা অফিসারের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। খবর পাঠালেই আমাদের বেড়িয়ে আনবে। তবে আমাদের গাড়ি ওপারে নিতে পারব না।

অর্থাৎ পদযুগলে সোয়ারি হতে হবে।

নো, নেভার। উ থিন টুন অতি উদার এবং ওর সিপাইদের অর্ধেক-ই হল রোহিঙ্গা। ওরা আমাকে ভালভাবে চেনে ও জানে। বারটার মধ্যেই ফিরে আসব।

চললাম অগত্যা।

বাংলাদেশ আর বর্মার সীমান্ত বলতে গেলে অচিহ্নিত বনাকীর্ণ স্থান। কক্সবাজার থেকে একটা রাস্তা গেছে সীমান্ত অবধি। রাস্তাটা ইঁটের। ওপারের রাস্তা আরও দুর্গম। সীমান্তে নামমাত্র চেকপোস্ট। বাংলাদেশীয় বর্ডার ফোর্সের কয়েকজন দিব্য আরামে দিন কাটায়। তাদের কাজ স্মাগলারদের কাছ থেকে বে-আইনিভাবে অর্থ আদায়। এই পথেই চরস জাতীয় দ্রব্য চলে আসে বাংলাদেশে, আর বাংলাদেশ থেকে পাচার হয় বিদেশী কাপড়, জামা, রেডিও, টি-ভি ইত্যাদি। একবার কোনরকমে চোরাই মালগুলো হস্তগত হলেই স্মাগলাররা জঙ্গলের গোপন পথ দিয়ে চোরাই মাল পৌঁছে দেয় রেঙ্গুনে, চট্টগ্রামে আর ঢাকায়। আবার এগুলোই নানা পথ ঘুরে প্রবেশ করে ভারতে হাজার মাইল অরক্ষিত সীমান্ত এলাকা দিয়ে। মালের সঙ্গে মানুষও আসে। স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য পারমিটও সংগ্রহ করে।

আমরা গাড়ি থেকে নেমে চেকপোস্টে পৌঁছতেই সেপাইরা জোর সেলাম ঠুকে একপাশে দাঁড়িয়ে গেল। নওসের ওদের কিছু বুঝিয়ে বলার পর আমাদের আরাকান যাবার পথ ছেড়ে দিল। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই পথে এগিয়ে এসেছিল নেতাজীর আজাদ-হিন্দ ফৌজ। তার কোন চিহ্ন কোথাও আছে কিনা জানি না, তবে এটা যে সেই ভীতিপ্রদ বনাঞ্চল সেটা বুঝতে ভুল

হয়নি।

উ থিন টুন স্টেশন অফিসার। নওসেরের পরিচিত। পুলিশ স্টেশনের অফিস সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক মাইল ভেতরে।

উ থিন টুন প্রথমেই বলল, থাইমু বা (বসুন)

বসলাম।

আবার বলল, লাফে ইয়ে তোয়াবা (চা খাবেন) ?

সম্মতি জানাবার পর চা খাবার এল।

আমরা মশগুল হলাম, তিন দেশের গালগপ্পে।

উ থিন টুন বলল, চলুন গ্রামে একটু বেরিয়ে আসি।

গ্রামের অধিবাসী সবাই রোহিঙ্গা।

কতদূর ?

পাশেই রোহিঙ্গাদের একটা মক্তব আছে সেখানে যাব। মক্তবের জমি নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া। মিটমাট করতে হবে, কে জানে, ওরা যা বদমেজাজি শেষে দাঙ্গা হওয়াও আশ্চর্য নয়।

নওসের বলল, চলুন। তবে বারটা, মানে বারটার মধ্যে ওপারে যেতে চাই।

তাই হবে বন্ধু।

সমুদ্রের কাছাকাছি একটা ছোট্ট গ্রামের মক্তব। পড়ুয়া সবাই রোহিঙ্গা। স্কুল সবে আরম্ভ হতে চলেছে। আলখাল্লা পাজামা পরিহিত দাড়ি শোভিত মুখে সবেমাত্র মক্তবের মওলবীসাহেব হাজির হয়েছেন। কিছু কিছু পড়ুয়াও এসেছে।

আমাদের দেখে মওলবীসাহেব এগিয়ে এসে বললেন, সালাম আলেকুম।

নওসের প্রত্যুত্তর দিয়ে গল্প শুরু করল। স্টেশন অফিসার জমির মামলা মেটাতে ব্যস্ত হলেন। আমি সামনে পেলাম একটা শিশু। হাতে বই শ্লেট।

পাশের সেপাইটাকে দোভাষী করে শিশুর সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করছিলাম।

কোন্ ক্লাসে পড়।

থিরি।

তোমার নাম কি ?

মজু মিঞা।

আজ কি খেয়ে এসেছ ?

খাইনি স্যার।

কেন ? পাক্ হয়নি বুঝি।

হাঁ স্যার। ঘরে চাল নেই। বাপজান গেছে সাম্পান নিয়ে ভাড়া খাটতে। ফিরে এসে চাল কিনবে।

তোমার মা ?

ফয়ার চঙ্গে গেছে (বৌদ্ধমন্দিরে)। বিনি পয়সায় ভাত দেয় সেখানে।

তাই আনতে গেছে। এখনও ফেরেনি। ফিরে এলে এখানে ভাত নিয়ে আসবে।

আমরা যখন কথা বলছিলাম তখন স্টেশনের সেপাই ডিম সেদ্ধ রুটি আর চা নিয়ে এল আমাদের জন্য। আমি নওসেরকে বললাম, ওটা ওই ছেলেটাকে দাও। ও না খেয়ে এসেছে।

আমি ডাকলাম, মজু।

উত্তর দিল, জি।

খেতে পেয়ে মজু খুব খুশি।

নওসেরকে বললাম, পেট শূন্য থাকলে বিদ্যাস্থানও শূন্য হয় ভাই।

নওসের ছেলেটাকে পাশে ডেকে নিয়ে তার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট দিয়ে বলল, আম্মাকে দিও চাল কিনতে।

মনে মনে ভাবলাম, এইভাবে মানুষকে ভিখারি যারা করে রেখেছে তাদের প্রতি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয় কিনা। সেই আদিম যুগ থেকে 'দান' নামে একটা শব্দ সব ধর্মীয় কেতাবে লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ দরিদ্রকে দান করার বিধি আছে। ধর্মের নামে শ্রেণী বিভাগকে আমরা মেনে নিয়েছি, হিন্দুরা দান করে, মুসলমানরা জাকাত দেয়, কৃশ্চানরা চ্যারিটি করে। এর জন্য দাতা পুণ্যলাভ করে। দারিদ্রকে কায়েম রেখে যারা দানের মহিমা প্রচার করে তাদের মনুষ্যপ্রেম সন্দেহাতীত নয়। ভিখারিকে দান করে ভিক্ষা বৃত্তিকে যেমন প্রশ্রয় দেওয়া হয় তেমনি তার কর্মের প্রতি অনীহা সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এটা যারা বোঝে তারা দানকে পুণ্য লাভের সেতু মনে করে না। বরং মনে করে সামাজিক অপরাধ।

নওসেরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছি অনেক কাল আগে। বিদায় কালে হালিমাভাবী চোখ মুছতে মুছতে বলেছিল, এরকম পাণ্ডববর্জিত দেশে বাস করা কত কষ্টকর তাতো বোঝেন ভাইজান। আপনার বন্ধু তো কাজ নিয়ে থাকে, আমার অবস্থা বুঝে দেখুন। দরজায় বসে থাকি ডাক পিওনের আশায়। কখন কোন ছেলে বা মেয়ের কাছ থেকে চিঠি আসবে তারই আশায়। এটা হল ম্যানশমেন্ট এরিয়া।

আরকানের শাল, সেগুন আর পাইন বনের মাঝ দিয়ে আধা কাঁচা রাস্তা দিয়ে ফিরতে ফিরতে ভাবছিলাম, যদি কেউ অসুস্থ হয় সে বিনা চিকিৎসায় মারা যাবে। বাংলাদেশ এলাকায় কোথাও কোথাও ডাক্তার আছে কিন্তু আরাকানের জঙ্গলে মশা মাছি বোলতা আর বন্যপশু বিনা অন্য কিছুর সন্ধান পাওয়াই অসম্ভব। এই জঙ্গল কেটে কোথাও কোথাও বসতি বসেছে। কোথাও কোথাও চাষও হচ্ছে কিন্তু আরাকানের বনসম্পদ বর্মা সরকারের রাজস্ব আয়ের সহজপথ তাই বন কাটতে গেলে বহু বাধা নিষেধ মেনে নিয়ে বনবিভাগের কর্মচারীদের পকেটে কিছু দান করে সে কাজ করা যায় তবে অতি গোপনে।

মগের দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করার সুযোগ পাইনি কিন্তু যাদের দেখার তাদের দেখেছি। এতেই আমার আক্কেল গুরুম, বেশি দেখার বাসনা আর

ছিল না।

হালিমাভাবীর আন্তরিকতার অভাব ছিল না, মনে ছিল চাপা ক্ষোভ। আর তার ঝাল সহ্য করতে হচ্ছিল নওসেরকে, অবশ্য হালিমার ক্ষোভ ছিল বাংলাদেশের সরকারের বিরুদ্ধে।

এরপর বহুকাল কেটে গেছে।

হয়ত এখন অবস্থার উন্নতি হয়েছে। পরিবর্তনশীল জগতে অবসর নিয়ে নওসের কোথায় হারিয়ে গেছে জানি না। পুরানো কাগজপত্র ঘাঁটতে ঘাঁটতে নওসেরের চিঠিগুলো পেয়ে পুরানো কথাগুলো সবই মনে পড়ছিল।

এত দেখেও আমি তৃপ্তি লাভ করতে পারিনি।

দার্শনিকরা বলেন, আকাঙ্খার নিবৃত্তি কখনও হয় না। চাওয়ার শেষ নেই। তাই তৃপ্তি শব্দটা অভিধানিক কিন্তু অর্থবহ নয়। অনেক দেখেও তৃপ্তিলাভ ঘটেনি এই কারণেই।

আমার চোখ খুলে দিয়েছিল ফিলিস গ্রীন্। ফিলিস তৃপ্ত কি অতৃপ্ত তার গবেষণা করতে হয়েছিল।

বাইশ তেইশ বছরের য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে। থাকত সিঙ্গাপুর শহরের উপকণ্ঠে পিতা-মাতা আর তার দু'বছরের শিশু পুত্র নিয়ে।

সিঙ্গাপুর ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীর এশিয়া ভূখণ্ডের সবচেয়ে বড় নৌঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানের বৈমানিকরা ইংরেজের এই দুর্ভেদ্য জলদুর্গকে বিধ্বস্ত করেছিল। নেতাজী সুভাষচন্দ্র আজাদ-হিন্দ বাহিনী গড়ে প্রথম পর্যায়ে সৈন্য পরিচালনা, আজাদ-হিন্দ সরকার গঠন ইত্যাদি সিঙ্গাপুর তথা সোনানে বসেই করেছিলেন।

বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল।

ইংরেজ তাদের এই উপনিবেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে স্বদেশে ফিরে গেল। সিঙ্গাপুর হল গণতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে সিঙ্গাপুর সবচেয়ে সুন্দর শহর। শাসন ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা নেই, দ্বীপরাজ্যের সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করে। দেশের আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে প্রশাসন মোটেই ত্রুটি করে না। আর্থিক দিক বিবেচনা করলে সিঙ্গাপুর বিত্তবানের দেশ। নাগরিক সংখ্যার অধিকাংশ চীনা তারপরই ভারতীয়।

এই সিঙ্গাপুরে গ্রীনের বাবা-মা ভারত থেকে এসেছিলেন সরকারী চাকরি নিয়ে যুদ্ধে পূর্ব কালে। যুদ্ধের পরবর্তীকালে আর ভারতে ফিরে যায়নি। একসময় ইহুদিরা ছিল হোমলেস নেশ্যন, ইস্রায়েল তাদের নতুন হোম কিন্তু য়্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা ভারতকে সর্বতোভাবে নিজেদের হোম মনে করতে পারেনি। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে নানাদেশে, বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াকেই তাদের হোম মনে করে সেখানেই বহু য়্যাংলো ইণ্ডিয়ান নতুন উপনিবেশ গড়ে তুলেছে। ফিলিসের বাবা সেখানে না গিয়ে সিঙ্গাপুরেই স্থায়ীভাবে বসবাস

করছে।

ফিলিসের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্রটা বলার প্রয়োজন নেই। তবে পরিচয়ের পর থেকেই ফিলিস মাঝে মাঝে ছেলে কোলে করে আমার ডেরায় আসত। নানা গল্পগুজব করে ফিরে যেত।

জিজ্ঞেস করেছিলাম, তোমরা অস্ট্রেলিয়া অথবা নিউজিল্যাণ্ডে কেন যাওনি।

ফিলিস হেসে বলেছিল, লাভ নেই। এখানেও আমরা যেমন অবাঞ্ছিত, সেখানেও তেমনি অবাঞ্ছিতভাবে বাস করতে হত। পরিচিত পরিবেশে খুঁটে খাওয়ার সুযোগ পাচ্ছি, অপরিচিত পরিবেশে দয়ার ওপর নির্ভর করে থাকতে হত।

তোমার স্বামীরও কি এই মত?

আমার স্বামী নেই।

মানে? সে কি মারা গেছে?

নো, নো, ইজ লিভিং বাট্ লিভিং উইথ য়্যানাদার গার্ল এট্ জাকার্তা।

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটবার আগেই ফিলিস বলল, সে একটা নিষ্ঠুর ভ্যাগাবণ্ড। কাজ ছিল সিঙ্গাপুর থেকে চোরাই মাল পাচার করা। পুলিশ ধরল। তখন আমি ক্যারিং স্টেজে। আমার বাবা অনেক কষ্ট করে তাকে জামিনে বের করার পর সে সিঙ্গাপুর ছেড়ে পালিয়েছিল। শুনেছিলাম কুয়ালালামপুর হয়ে জাকার্তায় গেছে। আর সেখানে গিয়ে নতুন বিবি নিয়ে ঘর করছে। ওরা নাকি চারটে করে বিয়ে করতে পারে তাই ওদের কোন দোষ নেই, তবে আমার বিয়ে হয়েছিল চার্চে তাই ডিভোর্স পেতে কষ্ট হয়নি। This is my posthumous child.

কিন্তু ওর বাবা তো বেঁচে আছে।

He is dead to me and to my family.

এখন কি করবে ঠিক করেছ?

মেয়েরা যা চায়, সংসার করব কিন্তু মনের মত পাত্র পাচ্ছি না। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে?

সোজাসুজি প্রশ্ন এবং সোজাসুজি উত্তর, নেভার।

এবার দুজনেই প্রাণ খুলে হাসতে থাকি।

হাসি থামিয়ে বললাম, তুমি কৃশ্চান, আমি হিন্দু। আমিও ধর্ম ত্যাগ করব না। তুমিও করবে না। তারপর আমাদের সন্তানের কি পরিচয় হবে?

ফিলিস হেসে বলল, তোমাদের এক মুসলমান মন্ত্রীর হিন্দু বউ ছিল। তাদের মেয়ে বিয়ে করল একজন ক্যাথলিক মন্ত্রীকে। এদের সন্তান কি হবে?

বললাম, ইণ্ডিয়ান। কোন ধর্ম বা জাত থাকবে না। কিন্তু আমাদের কি হবে? য়্যাংলো হবে না, ইণ্ডিয়ানও হবে না। হবে বাস্টার্ড।

ফিলিস হাসল।

অনেকক্ষণ পরে ফিলিস বলল, অনেক দিন পরে প্রাণ খুলে হাসলাম।

হাসতে ভুলেই গিয়েছিলাম।

যুদ্ধের সময় তোমরা কোথায় ছিলে ?

পালিয়ে গিয়ে পেনাং-এর রবার বাগানে কোনরকমে বেঁচেবর্তে ছিলাম। পরে বনপথ অবলম্বন করে থাইল্যাণ্ডে হাজির হয়েছিলাম। সেও থাইল্যাণ্ডের নো-ম্যানস্ ল্যাণ্ডে।

আজও সেই বনপথের কথা মনে হলে শিউরে উঠি।

না আছে খাবার, না আছে আশ্রয়। কখনও গাছের পাতা খেয়ে, কখনও ঘাসের শেকড় চিবিয়ে, কখনও গাছের ডালে বসে কখনও পাহাড়ের গর্তে নিজেদের প্রবেশ করিয়ে বাঁচার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে। এসব ভয়ঙ্কর দিনের কথা মনে হলে আজও আমাদের হৃদকম্পন উপস্থিত হয়। রাস্তায় মায়ের হল প্রচণ্ড জ্বর, ওষুধ সেদিন ছিল ভগবানের নামে উপাসনা। পানীয় জলের অভাবে ঝর্ণার জল খেতাম, তাতেই দেখা দিয়েছিল ভয়ঙ্কর উদরাময়। এই ভাবে পাঁচ ছয় দিন চলার পর পৌঁছলাম, থাই সীমান্তের গ্রামে। মশা-মাছি, জোঁক তার সঙ্গে ভয়ঙ্কর বন্য প্রাণীর হাত থেকে কিভাবে বেঁচে এসেছি তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না।

ফিলিস থামল।

বিয়ে করলে কোথায় ?

সিঙ্গাপুরে। যখন যুদ্ধ শেষ হল, মোটামুটি দেশ শান্ত লুটেরা বদমাইশদের আজাদ বাহিনী কিছুটা শায়েস্তা করেছিল ঠিকই, বাকিটা করেছিল নতুন প্রশাসন। সিঙ্গাপুর আসার পথে দেখা হয়েছিল মালয়ামি আহমেদের সঙ্গে। কয়েকদিন একসঙ্গে চলাচল করে ভাব জমিয়েছিল। সেটাই হল আমার জীবনের অভিশাপ। বাবা-মায়ের ইচ্ছা ছিল না। আমার জেদে বিয়েটা হয়েছিল তবে আহমেদের মত অনুযায়ী নয়, চার্চে বিয়ে হয়েছিল, ভাগ্যি সেদিন আমার দুষ্ট বুদ্ধি আমাকে কাবু করতে পারেনি, তাহলে আজ মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতাম না। মোল্লা, মওলবী নট্ য়্যালায়োড।

ফিলিস যা বলল তা আমরা হামেশাই প্রত্যক্ষ করে থাকি। নতুনত্ব শুধু তাদের বাঁচার চেষ্টায় সেই কষ্টকর পথ পরিক্রমা।

ফিলিস চাকরি করে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে।

সকালবেলায় নটার মধ্যে হাজিরা দেয়, রাত আটটায় বাড়ি ফেরে। ছুটির দিনে বেরিয়ে পরে ছেলের হাত ধরে। নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে বিকেলের দিকে হাজির হয় আমার আস্তানায়। আমিও ফিলিসের পথ চেয়ে থাকতাম। কেমন একটা মমত্ববোধ আমাকে তাড়িয়ে বেড়াত। বোধহয় ফিলিস আমার দুর্বলতা বুঝতে পেরেছিল, সঠিক সময়ে সে হাজির হত, যে কয়মাস সিঙ্গাপুরে ছিলাম সে কয়মাস এর ব্যতিক্রম হয়নি। কোনদিনই ফিলিস তার ছেলেকে রেখে বাইরে বেড়াতে আসত না। বলত, সারা সপ্তাহ কেনি তো আমার সঙ্গ পায় না, সেজন্য ছুটির দিনটা ওকে কাছ ছাড়া করি না। কেনি আজও জানে

না কে ওর বাবা ! আমার বাবাকে বাবা মনে করে, আর আমার মা ওর গ্র্যাণ্ডি। উপরন্তু বাবা-মায়ের বয়স হয়েছে, সপ্তাহে একদিন তারাও নির্বিবাদে বাস করতে পারে। কেনির ছয়দিন বয়স থেকে চার্জ ওরা বহন করছে।

এসব কথা সে আমাকে বলত যখন শহরের মাঝে ছোট সোঁতার পাশে বসতাম, কখনো কখনো সোঁতার ওপরের ব্রিজের রেলিং ধরে দাঁড়াতাম। তখন খোলা বাতাসে তার মনের দুয়ার খুলে যেত, আর হু-হু করে সে তার অতীত জীবনের কথা বাতাসের বেগে আমার ওপর ছুড়ে মারত।

ফিলিসকে সুন্দরী বললে অত্যুক্তি করা হয় না। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আবার বিয়ে করছ না কেন ?

মনের মত লোক পাচ্ছি না বাবু। পেলেই বিয়ে করব, অবশ্যই সে বিয়েতে তুমি আসতে ভুলে যেও না।

আমি ওর কথা শুনে হাসতাম।

হাসছ কেন ?

ভাবছি আমার মেয়াদ কত দিন !

মানে তুমি বুঝি ইণ্ডিয়াতে ফিরে যেতে চাও।

অবশ্যই। আমার তো দেশ আছে, সেখানেই আমার আশ্রয়। ভেসে বেড়ানো তো আমার কাজ নয়। একদিন থামতে হবে। আমার জন্য স্থান নির্দিষ্ট আছে আমার দেশে। সেখানেই যেতে হবে সুন্দরী।

ফিলিস আমার কথায় কেমন হতাশা বোধ করে বলল, আমাদের কোন দেশ নেই। আমরা য়্যাংলো হতে পারিনি, ইণ্ডিয়ান হতেও পারিনি। না ঘরকা না ঘাটকা।

বললাম, কে বলল নেই, তোমাদের শ্রেণীর সঙ্গে ইণ্ডিয়া শব্দটা তো জুড়ে আছে। সেখানে যেতে পার অবশ্য তুমি বা তোমরা সব সময় যদি নিজেদের ইণ্ডিয়ান মনে কর। জান ফিলিস, আর্যসভ্যতা যেমন উদার তেমনি আর্যাবর্তের মানুষও উদার। হাজার হাজার বছর ধরে যারা এসেছে ভারতে তারাই স্থায়ীভাবে থেকে গেছে, নিজেদের ভারতীয় করে গড়ে তুলেছে। তোমাদের anglo রক্তের অহমিকায় Indo রক্তকে যদি অবজ্ঞা কর তা হলে অবশ্য দেশ তোমরা কোনদিনই পাবে না। সর্বত্রই তোমরা করুণার পাত্র রূপেই গণ্য হবে।

ফিলিস চুপ করে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আকাশের অবস্থা ভাল নয় বাবু। চল ফিরে যাই। কেনি ডিয়ার লেট্ আস্ গো ব্যাক।

সত্যিই সেদিন চীন সাগরের টাইফুন এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সিঙ্গাপুরের মাটিতে। টাইফুনের ঝাপটা আসার আগেই ফিলিস আর কেনিকে সঙ্গে করে আমার আস্তানায় ফিরে এসেছিলাম।

ফিলিস পাকা গিন্নির মত ক্যাবার্ড থেকে রুটি জেলি বের করে হিটার

জ্বেলে চায়ের বন্দোবস্ত করে বলল, আজ যদি প্রকৃতি শান্ত না হয় তা হলে কি করব ?

টেলিফোনে তোমার বাবাকে খবর দিয়ে নিশ্চিন্তে এখানে রাত কাটাবে।

ফিলিস গম্ভীরভাবে বলল, পরিণতি ?

তোমার ভাগ্য। কলঙ্ক।

রাত নটা নাগাদ ঝড়ের ও বৃষ্টির দাপট কমলে ফিলিস উঠে দাঁড়িয়ে বলল, গুড্ নাইট।

ফিলিস, নওসের, বিবিসাহেবা আরও কতজনের কথা মাঝে মাঝে মনে হয়। মাদ্রাজ থেকে কলকাতা ফেরার গাড়িতে নতুনদি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব শুনেছিলেন। আমি উদারভাবে অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করেছিলাম।

গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঝিমুনি এসে গেছে।

নতুনদিদি এসে ডাকলেন, বললেন, মানুষ খুঁজতে তুমি ইরান থেকে ইন্দোনেশিয়া ঘুরে এসে আসমুদ্র হিমালয় চষে ফেললে, মানুষের সন্ধান পেয়েছ কি ?

বললাম, পেয়েছি নতুনদি। মানুষ যদি না থাকত তাহলে বিধাতার এই সৃষ্টি অচল হয়ে যেত।

নতুনদি বললেন, সর্বাঙ্গ সুন্দর মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর তবুও তাদের খুঁজে বেড়াতে হয় না ভাই। আমাদের আশে পাশে যারা আছে তাদের কেউ ভাল কেউ মন্দ। এই ভালমন্দের সংমিশ্রনেই মানুষ। এদের ভালটুকু যদি নিতে পারি তা হলেই মানুষের অস্তিত্ব মেনে নিতে পারি। ওরা পঙ্কজ, পাঁকে থেকেও মনুষ্যত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারায়নি। মানবাত্মার বিকাশ এতেই ঘটে থাকে। সমাজ ব্যবস্থা আমাদের সুক্ষ্মবৃত্তিগুলোকে হত্যা করে অমানুষের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেলেও খুনী তার সন্তানের জন্য কেন অশ্রুপাত করে, কেন দুর্ধর্ষ্য ডাকাত কয়েদখানা থেকে বেড়িয়ে পারিবারিক বন্ধনে নিজেকে জড়িয়ে নেয়, অত্যাচারী স্বামী কেনই বা স্ত্রী হত্যা করে অথবা স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে, অথবা গৃহ থেকে বিতাড়ন করে এই সব বিষয় তো এক কথায় ব্যাখ্যার বিষয় নয়। কেন পুত্র পিতা-মাতাকে গৃহত্যাগে বাধ্য করে, কেন মা সন্তান হত্যা করে এসব জটিল বিষয় নিয়ে যতই পর্যালোচনা কর ততই সব কিছু ঘোলাটে মনে হবে। তবে আমাদের আশেপাশেই মানুষ আছে, তাদের খুঁজতে দূরদূরান্তে যেতে হয় না ভাই।

নতুনদিদির মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা শোনার আশায় রইলাম। আমার মানুষ খোঁজার পথকে যেন তিনি আরও মসৃণ ও যুক্তিযুক্ত করলেন।

নতুনদি বললেন, কি দেখছ ? যা বললাম তা ভেবে দেখে ঘরে ফিরে চল। মানুষ খোঁজার চেয়ে আরও কিছু কর। বললাম তো খুনীও মানুষ, ক্ষেত্র

বিশেষে অত্যাচারী স্বামীও মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয় বিশেষ বিশেষক্ষেত্রে। অর্থাৎ উন্মাদ ভিন্ন সম্পূর্ণভাবে মনুষ্যত্বহীন মানুষ আজও পৃথিবীতে জন্মায়নি।

যে ইংরেজ সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নির্বিচারে সম্পদ ধ্বংস আর নরহত্যা করেছে সেই ইংরেজের ঘরেই জন্মেছিল মেজর হপকিন্‌। অত্যাচার ও ব্যভিচারকে কোন ক্রমেই মেজর হপকিন্‌ সমর্থন করতে পারেননি। যে ডাক্তার প্রভূত উপার্জন করতে পারত আজও কেবলমাত্র প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে সে কেন হিমালয়ের প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে মানুষের সেবা করতে আত্মসমর্পণ করেছিল—এসবের জবাব রয়েছে কেবলমাত্র তাদের সুপ্ত মনুষ্যত্ববোধে। রাজা-মহারাজা, বাদশাহ-সুলতান এদের উত্থান পতনের দিকে তাকিয়ে দেখলে মূল প্রশ্নটির উত্তর পাওয়া যায়, মূল প্রশ্ন হল ব্যক্তিস্বার্থ তাদের উন্মাদ করেছিল তাই তারা পাপ-পুণ্য, নীতি-দুর্নীতিকে গ্রাহ্য করেনি কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে তারপর পতন ঘটেছে, কোন সময়ই তা সুখের হয়নি। তবুও তারা স্বাভাবিক মানবধর্মে সন্তানকে ভালবেসেছে, পরিবার পরিজনের সুখ সমৃদ্ধির দিকে নজর রেখেছে। সমগ্র বিশ্বেই রয়েছে ভাল মন্দের সমাহার তা থেকেই খুঁজে নিতে হবে মানুষকে। মহামায়ার সপত্নী পুত্রের প্রতি গভীর স্নেহ-ভালবাসা মানুষের জীবনে শিক্ষণীয় ও স্মরণীয়। সেবাপরায়ণা বিমাতার ক্লান্ত চেহারাটা বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠলেই আমি কেমন আত্মহারা হয়ে সবার অজান্তে মনে মনে গভীর শ্রদ্ধা জানাই।

নতুনদির কথাগুলো অবাক হয়ে শুনছিলাম।

কয়েকদিন একসাথে চলতে চলতে যে সৌখ্য সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সময় উপস্থিত।

বিশাখাপত্তনের গাড়ি এসে দাঁড়াতেই আমি আমার পোঁটলা-পুঁটলি হাতে করে প্ল্যাটফরমে নেমে পড়লাম।

নতুনদি বুঝলেন এবার আমাকে ফেরাতে পারবেন না। তাই প্রতিবাদ, অনুরোধ, উপরোধ কিছুই করলেন না।

প্ল্যাটফরমে পোটলাপুটলি নামিয়ে আবার গাড়িতে উঠতে গিয়ে লক্ষ্য করলাম নতুনদিদি দরজায় দাঁড়িয়ে।

বললাম, আবার হয়ত দেখা হবে কিন্তু এবার এখানেই সমাপ্তি। এবার আমার ও আপনার দুজনেরই বিরাট সঞ্চয় হয়েছে।

নতুনদিদি হেসে বললেন, যেমন?

আপনি পেলেন ভাইকে। আর আমি যার সন্ধানে কয়েক যুগ ধরে অনুসন্ধান করে এসেছি তা পেয়েছি আপনার মাঝে। অনেককেই কাছে পেয়েছি ভাল-মন্দের সংমিশ্রনে কিন্তু সম্পূর্ণভাবে একটা মানুষকে খুঁজে পেয়েছি আপনার মধ্যে। ভালবাসা, প্রেম, নিঃস্বার্থ সেবা, অপরের দুঃখে দুঃখী হওয়া, অপরের সুখে সুখী হওয়া, একি কম কথা নতুনদি। এই সব

কিছুই পেয়েছি আপনার মাঝে, আপনি মা, আপনি স্ত্রী, আপনি ভগ্নী, আপনি মায়ের সন্তান এই সার্বিক কথাগুলো আপনার মাঝে পেয়েছি। আমার মানুষ খোঁজা সার্থক হয়েছে।

প্রণাম করে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠল। গাড়ি চলতে আরম্ভ করল, ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে নতুনদিদি হাত নাড়লেন, আমি হাত নাড়তে নাড়তে ভাবলাম, আমি কি হারালাম! মুখে বললাম, আবার দেখা হবে নতুনদিদি।

সেই সুন্দর করুণাময়ী আমার দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন। আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইলাম।

ধীরে ধীরে ট্রেন চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল।

আমার ভবঘুরে জীবনের নতুন আরেকটি অধ্যায় হাতছানি দিতে থাকে।

কেমন একটা অন্যমনস্কতা আমাকে গ্রাস করেছিল। এটা কাটিয়ে উঠতে বেশ কয়েক মাস পেরিয়ে গেল। যখন আমাকে আমার মধ্যে ফিরে পেলাম তখন তাকিয়ে দেখি আমি বসে আছি প্রচণ্ড শীতের রাতে ছোট্ট একটা রেল স্টেশনের পাশে গ্রাম্য একটি চায়ের দোকানে।

চা-ওলা বিহারী মুসলমান।

এই প্রচণ্ড শীতের রাতে গরম চা অবশ্যই সুখকর। বললাম মিঞাসাব, একটা চা দিন।

কাঁচের গ্লাসে চা দিয়ে মৌজ করে কাঁথা জড়িয়ে উনুনের পাশে বিড়ি টানতে টানতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবেন বাবুজি।

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, ডাউন গাড়ি কটায়?

রাত চারটেয়, কোথায় যাবেন?

যেখানে যাব ঠিক করে রওনা হয়েছিলাম সে জায়গা পেরিয়ে এসেছি। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ডাউন গাড়ি এলে তবে সে জায়গায় পৌঁছাব।

চা-ওলা আর প্রশ্ন করল না। প্রচণ্ড শীত হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়ে দিয়েছিল।

আমিও কম্বল মুড়ি দিয়ে জল গরম করার উনুনের পাশে গুটিশুটি হয়ে বসলাম।

চা-ওলা বলল, বাবুজি তকলিফ্ হোতা হ্যায়?

সে তো বটেই।

চা-ওলাকে বললাম, তুম বানাতে চলো হাম পীতে চলেগা।

আমার উৎকট হিন্দি শুনে চা-ওলাও হেসে ফেলল।

কতদিন এখানে দোকান করেছ?

নতুন লাইন যখন হয়েছিল তখনই।

বললাম, এখানে তো ন্যারো গেজের লাইন ছিল। নতুন লাইন পাততে হয়নি। পুরানো লাইন তুলে মিটার গেজের লাইন বসানো হয়েছে দেশভাগের

পর আসামের সঙ্গে গোটা দেশকে সংযুক্ত করতে।

তা ঠিক বাবুজি, মিটার গেজের টেশন তো দো তিন মাস হয়েছে, দো-তিন মাস হামি এখানে দুকান বনালো। আগে কেই ছিল না এহি টিশন মে। একদম ময়দান আর ময়দান।

এটাতো বিহার এলাকা।

হাঁ বাবু, পূর্ণিয়া জিলা।

আরেক গ্লাস চা এগিয়ে দিয়ে দোকানদার চুপ করে আগুন পোহাতে থাকে। এমন সময় শেষ রাতের গাড়ির ঘণ্টা বেজে উঠতেই চা-ওলা বলল ডাউন গাড়ি আবি আসবে। আর এন্তিজার করতে হোবে না।

আবি আসবে, কিন্তু অন্তত ঘণ্টা দেবার বিশ মিনিট পর ছোট লাইনের স্টিম ইঞ্জিনের গাড়ি ঝিক্-ঝিক্ করে এসে দাঁড়াল স্টেশনে। কোন প্ল্যাটফরম নেই, খোলা মাঠে স্টেশন, খোলা মাঠেই গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়। শেষরাতে মাত্র দুজন যাত্রী গাড়ি থেকে নামল, আর আমি একমাত্র যাত্রী পোথিয়া থেকে গাড়িতে উঠলাম। উঠলাম, তবে সহজে নয়, শেষ রাত, শীতের কনকনানিতে গাড়ির যাত্রীরা সহজে দরজা খুলতে রাজি না হওয়াতে দু তিনটে বগীতে চেষ্টা করে শেষে একটাতে কোনরকমে জায়গা পেলাম। যাত্রীরা প্রায় সবাই নিদ্রিত, যাদের চোখে ঘুম নেই তারাও শীতে জড়সর হয়ে কোণায় কোণায় কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। আর দুটো স্টেশন পেরোলেই আমার গন্তব্যস্থল। এইটুকু পথ দাঁড়িয়ে যেতে পারব। কারও ঘুমের অথবা বসার কোন অসুবিধা না ঘটিয়ে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আধ ঘণ্টার মধ্যে গন্তব্যস্থলে গাড়ি থেকে নামলেও সকাল তখনও হয়নি। শীতের রাতের দৈর্ঘ্য বেশি, সেজন্য সকালের আলো দেখতে অপেক্ষা করতে থাকি। গন্তব্যস্থলে যেতে হল পায়ে হেঁটে।

প্রাকৃতিক নিয়মে সকাল হয়েছিল, রোদ উঠেছিল, গন্তব্যস্থলেও পৌঁছেছিলাম।

অনন্তলাল আমার সহপাঠী, সরকারী চাকরে। তার আমন্ত্রণেই এসেছি। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাকে পেয়ে খুশি হলেও প্রথমে প্রশ্ন অনুযোগ করল অনন্তলাল, তোর সাহসের বলিহারি।

বললাম, ছোটবেলার কথা ভুলে গেছিস কি?

ভুলিনি, ভুলবার চেষ্টা করি কিন্তু যে দায় বহন করছি তা আমাকে ভুলতে দেয় না। স্বেচ্ছাকৃত না হলেও অনিচ্ছাকৃতও বলতে পারি না। সামান্য একটা ভুল যে আবেগে করেছিলাম তার মাশুল আজও দিচ্ছি।

তুই দুঃখিত?

মোটেই নয়। তবে মানুষ যখন কৃতজ্ঞতাবোধ হারিয়ে ফেলে উপরন্তু মনে করে তার কাছেই কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, তখন দুঃখ হয়। কিন্তু বলতে পারি

না। প্রতিবাদ নিরর্থক তাই চুপ করেই থাকি।

বললাম, অপরের ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আলোচনা করতে ভাল লাগে না। এ প্রসঙ্গ বাদ দে অনন্ত।

অনন্ত বলল, ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে চলতে পারিস কি। ব্যক্তির সমাহারই তো সমষ্টি। তোকে একটা দুর্গম জায়গায় নিয়ে যেতে চাই, যাবি।

সুগম-দুর্গম সবই আমার কাছে সমান। সাহস আমার অদম্য।

অনন্তলাল বলল, ব্রকের জিপে যেতে হবে। অনেকটা পথ।

দুপুরবেলায় আমরা যেখানে পৌঁছলাম সেটা একসময় ছিল সাধারণ মানুষের অগম্য। হিমালয়ের তরাই অঞ্চলের গভীরে অবস্থিত চা বাগান। একসময় এটা ছিল বিহারের অংশ। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দক্ষিণের যোগাযোগ রক্ষার জন্য বিহারের কিষেনগঞ্জ মহকুমার যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত করা হয়েছে তারই একটি অংশে এই চা বাগান। নতুন মহকুমা ইসলামপুরের চোপড়া থানায়। পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশের) সীমান্তে অবস্থিত।

স্থানটির রাজনৈতিক গুরুত্ব যেমন বেশি তেমনি গুরুত্ব রয়েছে সমাজ বিরোধীদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র রূপে। একদিকে দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের ফাঁসিদেওয়া থানা, আরেকদিকে বাংলাদেশ, আরেকদিকে বিহার। অসমকে ভারতের মূলখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত রাখতে যে সরু জমির ফালি এই অংশে রয়েছে, তার মাঝ দিয়ে জাতীয় সড়ক, ব্রডগেজ ও মিটার গেজের দুটো রেলপথ ভারতের অখণ্ডতা ও সংহতি রক্ষা করছে। যে কোন সময় কোন শক্তিশালী শত্রুপক্ষ এই করিডর দখল করলে অসমসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলো বিচ্ছিন্ন হতে পারে। অর্থাৎ স্থানটি যেমন স্পর্শকাতর তেমনি সমাজ-বিরোধীদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র। এ হেন স্থান দুর্গম হলেও দেশের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ চিন্তার বিষয়।

চোপড়া থানায় গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে তখনকার পাকিস্তানের দিকে এগোতে থাকি। একবার অনন্তকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আজ কি ফিরতে পারব ?

অনন্তলাল দার্শনিকের মত বলল, ভরসা নেই।

চা বাগানের মাঝ দিয়ে রাস্তা। বাগানের মূল কেন্দ্রে অথবা কারখানার আশে পাশে কুলি বস্তি। আজকাল তাদের সম্মানসূচক নামে ডাকা হয় 'চা-শ্রমিক'—'চিয়া কামিন'। এই সব কুলিদের পূর্বপুরুষদের লোভ দেখিয়ে রংরুটরা এই দুর্গম অঞ্চলে এনেছিল। এরা লড়াই করেছে বন্য জন্তুর সঙ্গে, মশা-মাছির সঙ্গে, নানাবিধ রোগের সঙ্গে। তারপর এরা ভুলে গেছে ওদের পিতৃপুরুষদের, মেয়েরা ভুলে গেছে তাদের গর্ভস্থ সন্তানের পিতার নাম ও পরিচয়।

এরা চা বাগানের শ্রমিক, শ্রম বিক্রি করে যা পায় তা দিয়ে সপরিবারের

উদরপূর্তি হয় কিনা সন্দেহ। আজ আমরা এদের অতিথি, অর্থাৎ চা বাগানের মজুরদের অতিথি। আতিথেয়তার মহান ধর্ম যাতে পালিত হয় তার ব্যবস্থা অনন্তলাল করে রেখেছিল। তার অনুগৃহীত বাদাম মাঝির গৃহে আমরা যখন পৌঁছেছিলাম তখন সাধারণ গৃহস্থের বাড়িতে দুপুরের খাবার সময়। বাদাম মাঝির স্ত্রী রুমকি অসময়ের অতিথিদের জন্য খাবার ব্যবস্থা করেছিল যথেষ্ট।

কোন এক সময় অনন্তলাল বাদাম মাঝির ভূমি সমস্যা মেটাতে সাহায্য করেছিল। বাদাম মাঝি এই উপকারটা ভুলতে পারেনি। অনন্তলালকে সেই কারণেই প্রয়োজনের অতিরিক্ত আপ্যায়ন করতে ত্রুটি করছিল না।

বাদাম মাঝির পূর্বপুরুষ বোধহয় পালামৌ জেলা থেকে চা বাগানে এসেছিল আড়কাঠির প্ররোচনায় তিন পুরুষ কাজ করে চা বাগানের পাশে কয়েক বিঘা জমি খরিদ করেছিল বাদামের বাবা লাইকু মাঝি। এটাই তাদের বড় সঞ্চয়। আরেকটি সঞ্চয় হল সামান্য লেখাপড়া শেখা।

বাদামের বউ রুমকি পোলিয়া শ্রেণীর স্থানীয় চাষীর মেয়ে। তবে চাষীর চাষযোগ্য জমি যা ছিল তা আয়ারিয়ার বিহারী ভূমিহাররা বাংলা সরকারের তহশীলদারের পকেট ভর্তি করে নিজের নামে খারিজ দাখিল করে নিয়েছে। নিজের জমি হাত ছাড়া হলেও রুমকির বাবা সেই জমির চাষী, তবে ভাগচাষী।

চাষের জমি হারানোর ব্যথা একা রুমকির বাবার নয়। তরাইয়ের ওই সব অঞ্চলের আদিবাসী সবাইয়ের। যারা চাষ করে না, যারা জাত চাষী নয় তারাই বড় বড় জোতদার এবং বহিরাগত। অসদাচারী দুর্নীতিগ্রস্থ সরকারী কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে ভূমির ওপর দখল কায়েম করে ন্যায়সম্মত ভূমির মালিককে প্রতারণা করেছে। বাদাম মাঝি কোন ব্যতিক্রম নয়। সেও দুর্ভাগ্যের শিকার কিন্তু তার লড়াই করার সাহস জুগিয়েছে রুমকি। বাদাম মাঝির নার্ভের গতি রুমকি ভাল বোঝে আর বস্তুগতভাবে বাদাম রুমকির অনুগত।

বাদামের সহকর্মীরা বলে, বাদাম জরু কা গরু।

কেউ যদি বাদামের মুখের সামনে একথা বলত তাতে বাদাম ক্রুদ্ধ হত না, হাসত। অনন্তলাল বলেছিল, রুমকি না থাকলে বাদাম অতলে ডুবত। বাদাম লেখাপড়া কিছুটা শিখেছে, দল বাঁধতে শিখেছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শিখেছে, তবে পরিণামে অশেষ দুঃখ ভোগ করতেও হয়েছে। কয়েক মাস আগে বাদাম জেল থেকে এসেছে। সরকার তাকে বিনা বিচারে আটক করেছিল। রুমকি সব কিছু সামলেছে। রুমকিও পাঠশালায় চার বছর অ-আ, ক-খ শিখলেও রাজনীতিতে পটু নয় কিন্তু বাদাম রাজনীতি বোঝে, অর্থনীতি নিয়ে মাথা ঘামায়। ভূমিহীন ভাগচাষীদের সংঘবদ্ধ করে দাবী আদায়ের আন্দোলন করে মোটামুটি গরীবদের নেতারূপে এলাকায় সুপরিচিত। নির্দোষ বাদামকে কয়েদ করায় স্থানীয় অন্ত্যজ শ্রেণীর কাছে সিধু-কানুর সমপর্যায়ের হয়ে উঠেছে বাদাম মাঝি।

সে রাতে বাদামের অতিথি হয়েই কাটাতে হল। তবে শীতের রাতে তরাই

সন্নিহিত চা বাগানের কুলি বস্তিতে আনন্দদায়ক কিছু না থাকলেও সে রাতটা গল্পের মাঝ দিয়ে কেটেছিল। তা ছিল এত pleasing যাকে স্মরণীয় নিশি যাপন বলা যায়।

কাঠের ছোট্ট একটা টেবিলের ওপর মিট্‌মিট্‌ করে লণ্ঠন জ্বলছে। পাশে খাটিয়াতে ঘুমোচ্ছে বাদামের দুটো ছেলে আর একটা মেয়ে। আমরা চারজন ছোট টুল পেতে টেবিলের চারধারে বসেছি। ঠিক যেন তাস খেলতে বসেছি কিন্তু বসার মাধুর্য ফুটে উঠল তখনই যখন বাদাম হাসতে হাসতে বলল, আজ রুমকি যেন জান কবুল করে রসুই করেছে অন্তাবাবু।

রুমকি ভ্রূকুঁচকে বলল, তোমার সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি।

বাদাম বলল, বাড়াবাড়ি না করলে তোমার রূপগুণের কথা বাবু ভেইয়ারা মানবে কি করে।

বাদাম যখন তার পূর্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ বলা প্রায় শেষ করেছে এমন সময় রুমকি বলল, বিহান বেলায় হামরা সিদ্ধবাবার মন্দিরে যাব।

অনন্ত জিজ্ঞেস করল, সে আবার কোথায়? বঙ্গে, না অ-বঙ্গে।

বাদাম বলল, অ-বঙ্গে। তবে অনেকটা দূর, সেই গলগলিয়ার মাথায়, প্রায় ছ' ক্রোশ যেতে হবে টেরাইতে, নেপালের নিচে পাহাড়ের গোড়ায়। দেখার মত কিছু নেই তবে সিদ্ধবাবা বাক্‌সিদ্ধ সাধক। তার সাধন সঙ্গীও আছে। বহুদূর থেকে লোক আসে সিদ্ধবাবার দয়া পেতে।

হেসে বললাম, দয়া আমরা পেতে চাই কি?

তারজন্য না বাবুজি। সিদ্ধবাবা বড় গুণী লোক! নানা শাস্ত্র পড়ে বিরাট পণ্ডিতও।

তাহলে কিছু জ্ঞান অর্জন করা যাবে। তবে আমাদের যেতে হবে জিপে, হাঁটতে পারব না।

অসুবিধা নেই। টিলার ওপর মন্দির। টিলা পর্যন্ত জিপ যাতে যাবে।

রুমকি যাবার জন্য রুটি আর ভাজি তৈরি করতে বসল।

আমরাও প্রস্তুত হয়ে নিলাম।

রাস্তা বলতে কিছু নেই। বাংলার মাটি ছেড়ে উত্তরে চলেছি। খানাখন্দ জঙ্গলের সরুপথ পেরিয়ে যখন পেঁছানো গেল সিদ্ধিবাবার টিলায় তখন বেলা এগারোটা বেজে গেছে। জিপ থেকে নেমে বাকি পথটা পাথরের নুড়ির ওপর পা দিয়ে ধীরে ধীরে মন্দিরের সিঁড়িতে পেঁছিলাম। মন্দির কোন হর্ম্য নয়। একটা বাঁশের বেড়া দেওয়া খড়ের ছাউনি। মন্দিরের সামনে হাড়িকাঠ। সকালবেলায় কোন প্রাণীকে স্বর্গদ্বারে বোধহয় পেঁছে দিয়েছিল মন্দিরের সন্ন্যাসী। তখনও পশুর রক্তের ছাপ রয়েছে হাড়িকাঠের পাশে।

মন্দিরের মেঝেতে বাঘের চামড়ায় বসে আছেন সিদ্ধবাবা। কয়েকজন ভক্ত বাবার সেবার ব্যবস্থা করছে। সদ্য কর্তিত ছাগ শিশুর ছাল ছাড়াতে ব্যস্ত

দুজন। বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে ভোজ্য তৈরির জন্য ছাগ মাংস নিয়ে ব্যস্ত।

সিদ্ধিবাবার মুদিত নয়ন।

আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে।

অনেকক্ষণ পর সিদ্ধিবাবার ধ্যান ভঙ্গ হল। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, কি চাই তোমাদের ?

বাদাম মাঝি বলল, অনন্তবাবু এসেছেন সঙ্গে আছে কলকাতাইয়া এক বাবু। আপনাকে দর্শন করতে এসেছেন।

বহুত খুব। আসন গ্রহণ কর।

আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বলল, তেরা ভাগ্ বহুত আচ্ছা হ্যায়।

আমি মিনতি করার ভঙ্গিতে বললাম, আপ্কা ভি।

চমকে উঠল সিদ্ধিবাবা।

বললাম, বাবাজি, আপনি এই গভীর জঙ্গলে মা কালীর মূর্তির সামনে বসে ধ্যান করছিলেন। কিসের ধ্যান ?

পরমাত্মার ধ্যান। পৃথিবীটা হল মায়া, মায়া মুক্তির জন্য পরমাত্মার ধ্যান করছি।

উদ্দেশ্য ?

মুক্তিলাভ।

কার মুক্তি ?

আপনা মুক্তি।

অনন্তকে বললাম, বাবাজিকে দেখা শেষ, এবার ফিরে চল।

সিদ্ধিবাবা, বলল, এত জলদি জলদি কাহে ?

বললাম, এসে দেখলাম আপনি অতীব স্বার্থপর।

কাহে ?

আপনি নিজের মুক্তি খুঁজছেন। আপনার সামনে কোটি কোটি মানুষের কথা একদিনও ভেবেছেন কি ?

সিদ্ধিবাবা এরকম কথা কখনোও শোনেননি। থমকে গেলেন। অবশেষে বললেন,—আপকা বাত তো সহি হ্যায় লেকিন গুরুকা নির্দেশ।

আপনার গুরু আপনাকে নিজের কথাই ভাবতে শিখিয়েছেন, এই তো। আপনি বিচার করে দেখেছেন কি ?

গুরুর নির্দেশ বিচার করার অধিকার শিষ্যের নেই।

বললাম, আমি শুনেছি, আপনি খুব পণ্ডিত লোক। পণ্ডিত লোকের মুখে একথা শোভা পায়না সিদ্ধিজি।

এহি তো সহি বাত হ্যায়। লেকিন একমাত্র গুরুই পরমাত্মার কাছে পৌঁছতে পারেন সে জন্য প্রশ্ন করা নিষেধ। আমরা তাঁর নির্দেশ অমান্য করতে পারি কি! সাধনমার্গে গুরুই সব কিছু।

বললাম, আজ অবধি পরমাত্মার কাছে কেউ পৌঁছেছে এমন কোন সাক্ষ্য

প্রমাণ পেয়েছেন কি ? এমন কি যিনি পরমাত্মার পদদর্শন করাতে চান তিনি কি পরমাত্মার পদদর্শন করতে পেরেছেন অদ্যাবিধি ! ঈশ্বরের উপসানা করার প্রত্যক্ষ অধিকার সার্বজনীন, সেই অধিকার কেউ হরণ করতে পারে না আবার দান করতেও পারে না।

তাহলে তো শাস্ত্র মিথ্যা প্রমাণিত হবে বেটা।

শাস্ত্র তো আমার আপনার মত লোকের লেখা। আমার আপনার সুবিধা কিসে হয় সেই অনুসারে শাস্ত্র রচনা করেছি। কারণ আমরা ধূর্ত স্বার্থপর আর যাদের শাস্ত্রের নামে কিছু নির্দেশ পালন করতে বাধ্য করি তারা অশিক্ষিত, অজ্ঞ এবং মূর্খ। তাদের মঙ্গল সাধন না করে তাদের আমরা শোষণ করছি। আমার ভাগ্য ভাল তাই আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি, আর আপনার ভাগ্য ভাল তাই এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পেরেছেন।

সিদ্ধিবাবা বললেন, তুমি নাস্তিক আছ।

বললাম, আমি আস্তিক, নাস্তিক নই। ব্যাকরণগত ভাবে 'অস্' ধাতু অর্থাৎ যা আছে তাতে যে বিশ্বাস করে সে আস্তিক। আর যে তা করে না সে নাস্তিক। গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, অজড়-জড় সব কিছুই আমার সম্মুখে, তাকেই আমি বিশ্বাস করি, তারই অস্তিত্ব আমি স্বীকার করি তাই আমি আস্তিক। আপনারা মায়া অলৌকিক, অপার্থিব, যার কোন অস্তিত্ব নাই তাতে বিশ্বাস করেন, তাই আপনারা নাস্তিক।

সামনে যদি বজ্রপাত হত তা হলে সিদ্ধিবাবা অতটা স্তম্ভিত হতেন না, যতটা স্তম্ভিত হলেন আমার কথা শুনে।

থামতে হল অনন্তের ইসারায়।

এখানে দেবদর্শন, সিদ্ধিবাবা দর্শনে এসেছি, এসব আলোচনা অবান্তর।

তা ঠিক। যে মানব ও প্রকৃতির সেবা করে না, যে শুধু নিজের মোক্ষের আশায় ধ্যান করে, সাধনা করে সে মনুষ্য পদবাচ্য নয়। মানুষ বলে আমি মনেই করি না তাকে। একটা পতঙ্গও বাঁচার আকাঙ্খায় ঘুরে বেড়ায়, সৃষ্টির মহিমা প্রচার করে আর এরা মানুষকে ভালবাসে না। পৃথিবীর জনসমষ্টির সুখ দুঃখের অংশীদার হয় না এবং স্বকপোল কল্পিত আচার বিচার দিয়ে অপরকে প্রতারণা করে, মুক্তির আশায় জীব হত্যা করে। এদের মানুষ মনে করা ত চরম পাপ।

রুমকি এতক্ষণ আমাদের ব্যাকালাপ শুনছিল। কিছুই সে বুঝতে পারেনি তবে নাস্তিক আর আস্তিক শব্দটা তার কানে যেতেই সে সজাগ হয়েছিল।

নতুনদিও আমার এই সব যুক্তিকে উদ্ভট যুক্তি বললেও কোন সময়ই কথা বলার মাঝে বাধা দিয়ে নিরুৎসাহ করতেন না।

নতুনদিকে বলেছিলাম, ভারতের ভণ্ডামির রাজ্যে মানুষ খুঁজতে বেরিয়েছি। কিন্তু রাজনীতির মাথায় যারা বসে আছেন তারাই সর্বাগ্রে মনুষ্যত্ববোধ

হারিয়েছে, তারাই সমাজ থেকে মনুষ্যত্ববোধকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে অর্থ ও ক্ষমতার লোভে। এই পাপের রাজ্যে মানুষ খুঁজে পাওয়া আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কাজ হলেও, নিচের তলার নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত যেসব প্রতিবাসী আমাদের আশে পাশে আছে তাদের মাঝ থেকেই খুঁজে পেয়েছি মানুষকে।

আবার জিপে চেপে ফিরে এলাম চোপড়া।

বাদাম আর রুমকি বার বার নমস্কার করে আবার তাদের চা-বাগানের কুলি বস্তির ঘরে আসার বার বার নেমতন্ন করল।

অনন্তলাল আমার পাশে। বাদাম আর রুমকির দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ওরা হল happy pair কিন্তু কতদিন সরকার আর জোতদারের নজর থেকে বেঁচে চলবে জানি না।

বললাম, বাঁচবে, শুধু বাঁচবে না, বাঁচাবে অন্যকে। অবশ্য তার জন্য রক্তপাতও ঘটতে পারে। অনেক মূল্য দিতে হবে।

জিপ চলছে।

চলতে চলতে বললাম, কাল রাতের ঘটনাগুলো মনে পড়ছে।

হাঁ, কিন্তু এই চিত্রতো পৃথিবীর সকল সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী দেশের চিত্র। এতে নতুনত্ব নেই।

তবুও এদের মধ্যে কেষ্টক্ষ্যাপাও জন্মায়।

কে কেষ্টক্ষ্যাপা ?

একটা অর্ধশিক্ষিত গাঞ্জিকাসেবী, রুগ্নদেহী বৈষ্ণবীহীন বৈষ্ণব।

কেষ্টক্ষ্যাপা সহজ সরল ভাষায় নিজের জন্মবৃত্তান্ত শোনাতে কখনোও লজ্জিত হত না।

আমার জন্ম বেশ্যালয়ে। আমার মা পেশা করত। আমি তারই সন্তান। ছোটবেলা থেকে বেশ্যালয়ের করুণ, কুৎসিত, নরকের ছবির সঙ্গে পরিচিত।

কথা শেষ করেই গাঁজার কল্কেটা দু' হাতের চেটোতে চেপে কসে দম দিল কেষ্টক্ষ্যাপা।

সামনের উঠোনে তখন কয়েক ডজন ভক্ত খোল করতাল সহযোগে সংকীর্তনে ব্যস্ত। প্রতিদিন ভক্তজনরা অষ্টপ্রহর হরিনাম করে।

কেষ্টক্ষ্যাপা কিছুক্ষণ থেমে দম নিলেন।

আবার বললেন, যৌন ভোগে পরিতৃপ্তি নেই জেনেও মানুষ এই সম্ভোগের দিকে এগোয়। উপাচার হল নারীর দেহ, আর আসব। আমার মা কোন গ্রাম্য বধু ছিলেন না। অল্প বয়সে তার দেহে যৌবনের জোয়ার দেখে পাড়ার পয়সাওলা ঘরের ছেলেরা তাকে প্রলোভন দেখাত, পয়সা দিত, তারপর করত সহবাস। মা বলতেন, প্রথমে ছিল কৌতূহল, যার মাঝে ছিল ভোগের অপার আনন্দ। সে মোহ কেটে গেল। আমি মা হলাম।

মা বলতেন, বিয়ের পিঁড়িতে বসলাম না অথচ মা হলাম। এমন মা তো

পশুজগতে সর্বত্র গিজ-গিজ করছে, তা হলে আমরা মানুষ কিসে। অত লোকের অত্যাচার সঙ্গদান অসম্ভব। এমন দিনে ঈশ্বর প্রেরিত জনের মত এল রাধাকান্ত ঠাকুর। রাধাকান্তও এসেছিল তার ভোগের লালসা মেটাতে। আমরা তো পণ্য। আমাদের কি বলার থাকতে পারে, প্রতিবাদ করার ভাষাও আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু রাধাকান্ত সব শুনে আমার কেষ্টকে নিয়ে গেল।

কেষ্টচরণ হল কেষ্টঠাকুর।

পাঠশালায় ভাল পড়ুয়া। কিন্তু রক্তে বিষ। কি করে কি হল তা বলা যায় না। কেষ্ট তৈরি করল কীর্তনের দল। শিষ্যসাবুদ জুটল। তার গানের গলা মনোহারি কিন্তু কেষ্ট ঘর মুখো হল না। তার মা মানদা কোথায় হারিয়ে গেল তা কেষ্টও জানে না।

হরিনামেই মুক্তি।

এই মহামন্ত্র শিখে কেষ্ট নেমে পড়েছিল ময়দানে।

নিজস্ব দুটো কৌপিন আর লুঙ্গি, শীতের একটা কম্বল বিনা আর কোন সম্পদ তার ছিল না কিন্তু তার আখড়ায় প্রতিদিন বিশ পঁচিশজনের আহার্যের ব্যবস্থা ছিল। ক্ষ্যাপা কেষ্ট বলতেন, আমার কিছু নয়। স্বয়ং নারায়ণ এদের ক্ষুধার অন্ন জোটায়। নরই নারায়ণ। নরের সেবাই নারায়ণের সেবা।

একটি অর্ধশিক্ষিত, নেশাখোর গণিকাপুত্রের যে উপলব্ধি আছে তা নেই ওই সিদ্ধিবাবার।

জিপে বসে গতরাতে কেষ্ট ক্ষ্যাপার কাহিনী শোনার পর সিদ্ধিবাবার সাধনার চেয়ে আমার মানুষ খোঁজার আগ্রহ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

নতুন নাম অরুণাচল প্রদেশ।

বর্মডিলা নেমেই বুঝতে পারলাম। কাজটা ভাল হয়নি। অরুণাচল তখন বিপদজনক।

লোক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। বাঁচার আশায়। নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়।

শোনা যায় বর্গীর ভয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ পালিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল পূর্ববঙ্গে।

তাদের এই নতুন উপনিবেশই বাংলাদেশ, সেদিনও তারা ছিল বাংলাদেশের অধিবাসী, পরবর্তী কালেও তারা বাংলার মানুষ বলে পরিচিত উভয় বঙ্গে।

বর্গীর চেয়েও ভীতিপ্রদ হল চীনা জুজু।

ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ বসে জওহরলাল আর চৌ-এন-লাই পঞ্চশীলের চুক্তি সই করেছিল। চুক্তির কালি শুকতে না শুকতে আরম্ভ হল সীমান্তে লড়াই।

আমরা স্বাধীনতা পেলাম।

কি করে পেলাম?

কেউ বলল, চরকা কেটে অহিংস উপায়ে, কেউ বলল, বিপ্লবীদের অবদান, কেউ বলল, নেতাজী যদি ভারত স্বাধীন করার অভিযান না করতেন তাহলে

স্বাধীনতা পেতাম না, কেউ বলল, নৌ বিদ্রোহ না ঘটলে ইংরেজের সিংহাসন টলত না। আমার মনে সবগুলোই স্বাধীনতা লাভের সঠিক আংশিক দাবীদার।

ধনীর দুলাল জওহরলাল ছিলেন তার জীবনের প্রথম ভাগে ইংরেজের দেশে, তাই তিনি ছিলেন more a British than an Indian. ভারত সম্বন্ধে তার জ্ঞান আনন্দ ভবনের চাকর-বাকর সাহিসদের সাহচর্যে ছিল সীমাবদ্ধ। আর গান্ধীজি ষোল বছর বয়সে বৃটেনে গিয়ে সামান্য কয়েক মাস ভারতে বাস করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কাল অবধি ছিলেন আফ্রিকায়। ভারত সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি আফ্রিকার প্রবাসী ভারতীয়দের পরিবেশে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল এরাই লাগাম ধরেছেন স্বাধীনতা লাভের রথের ঘোড়ার। একজন হলেন প্রধানমন্ত্রী আরেকজন জাতির জনক।

পাশেই তিব্বত।

চীন দাবী জানাল, তিব্বত চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তারা সৈন্য পাঠিয়ে দখল করল। বহুজন আপত্তি করলেও জওহরলাল তা গ্রাহ্য করল না।

তিব্বত থেকে দলাই লামা পালিয়ে এলেন ভারতবর্ষে। জওহরলাল তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানিয়ে নিরাপদ আশ্রয় দিলেন। অর্থাৎ দলাই লামা আমাদের বন্ধু হলেও তাঁর দেশকে উপহার দিলেন চীনকে। দলাই লামাকে ভারতে আশ্রয় দেওয়াটা চীন সুনজরে দেখেনি। অশান্তির বীজ রোপিত হল।

মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড় নেশা টাকার নেশা। যার হাজার আছে সে লাখ চায়। যার লাখ আছে সে কোটি চায়। টাকার নেশায় মানুষ অমানুষে পরিণত হয়। তার লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত আমাদের চারপাশে দেখা যায়। আর রাষ্ট্রের নেশা হল প্রভুত্ব করার নেশা। নিজের ভূমি ছেড়ে অপরের ভূমির ওপর নজর দেওয়া রাষ্ট্র প্রধানদের বড় নেশা। জওহরলাল এই তত্ত্ব যেমন বুঝতে চাননি তেমনি তথ্য সংগ্রহ করে সতর্কও হননি।

হঠাৎ চীন দাবী করল, নেফা (North Eastern Agency) তাদের সাম্রাজ্যের অংশ।

যুক্তি খাড়া করতেও বিলম্ব ঘটল না।

উনিশ শত আঠার সালের ইম্পিরিয়াল গেজেটের একটা মানচিত্রকে মূলধন করে চীন সরকার বলল, নেফা আমাদের।

জওহরলাল যদি বুঝতেন রক্ত স্বাদ পাওয়া হিংস্র ব্যাঘ্রের ক্ষুন্নিবৃত্তি সহজে হয় না। আরও রক্ত লাভের জন্য সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তিব্বত বিনা বাধায় লাভ করে চীনা ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হয়ে আরও রক্তের আশায় নেফার ওপর দাবী জানাল।

জওহরলালও ছেঁড়া দলিলের পাতা খুঁজে বলল, তিব্বতের সঙ্গে ইংরেজের চুক্তি অনুসারে ম্যাকমেহন লাইনই ভারতের সীমা।

চীনারা বলল, ওটা কাল্পনিক। আর তিব্বতের ওই চুক্তি পালনের

দায়িত্ব নেই বর্তমান চীন সরকারের।

শ্রীলঙ্কার কলম্বোতে নির্জোট আন্দোলনের নেতাদের সম্মেলন বসছে। জওহরলাল কলম্বো রওনা হচ্ছেন এমন সময় খবর এল চীনা সৈন্য প্রবেশ করছে নেফায়।

শুনেই জওহরলাল বললেন, Push them out.

আরম্ভ হল সীমান্তে যুদ্ধ।

ভারতীয় সৈন্যের নেতৃত্বে রইলেন জওহরলালের পরম আত্মীয় জেনারেল কাউল।

বমডিলা হল অরুণাচল তথা নেফার প্রবেশ দ্বার।

মিরি-বিশমি ইত্যাদি পার্বত্য জনজাতির দেশ এই অরুণাচল।

এই জনজাতিদের বৈশিষ্ট এবং তাদের জীবনধারা জানার আশায় বমডিলা পৌঁছেছিলাম।

পাহাড়ের সানুদেশে ছোট্ট শহর বমডিলা। এই ছোট্ট জায়গার কোন গুরুত্ব আছে তা কেউ কখনোও ভাবেনি, অথচ এই শহর হয়ে উঠল আলোচ্য বিষয়। অধিবাসীরা মিশ্রিত। অরুণাচলের অধিবাসী যেমন আছে তেমনি আছে অসমীয়া, বড়ো এবং কিছু বাঙ্গালী আর আশেপাশের চা বাগানে আছে ছোট নাগপুরের আদিবাসী শ্রমিক।

চীন এগিয়ে আসছে।

চীনা বর্গী, চীনা জুজু, চীনা ড্রাগন হাঁ করে তেড়ে আসছে ভারতকে গ্রাস করতে।

এগার বার হাজার ফুট বরফ ঘেরা পাহাড়ের মাথা অতিক্রম করে চীনা সৈন্য এগোচ্ছে। আমরা চুপ করে বসে ছিলাম না। ভারতীয় সৈন্যও তাদের বাধা দিতে আরম্ভ করেছে।

বমডিলায় বুক বেয়ে নেমে আসছে ভীত সন্ত্রস্থ মানুষের স্রোত। আর বন্দুক-কামান-ট্যাঙ্ক নিয়ে বমডিলাকে পেছনে ফেলে ভারতীয় সৈন্যরাও এগোচ্ছে চীনাদের প্রতিরোধ করতে।

বমডিলায় পা দিয়েই বুঝলাম ঘটনার গতি প্রকৃতি।

পলায়নরত নারী শিশু বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সম্মুখীন হতে হচ্ছে অকরুণ পরিবেশে। অনেকেই এসেছে একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের অধিবাসী যারা কখনো সমতল দেখেনি তারা যে কি দুর্দশাগ্রস্থ তা নিজের চোখে না দেখলে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না।

এমন একটি করুণ দৃশ্য দেখেছিলাম বাংলাদেশের যুদ্ধে।

লক্ষ লক্ষ লোক সীমান্ত পেরিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল ভারতের সন্নিহিত জেলায়। এই সব উদ্বাস্তুদের আশ্রয় করে দিয়েছিল ভারত সরকার, তাদের জন্য বিনামূল্যে খাদ্যের ব্যবস্থাও করেছিল।

কিন্তু সেদিন যে সব ভারতীয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত অঞ্চল থেকে সমতলে নেমে

এসেছিল তাদের আশ্রয় ও আহার্যের কোন ব্যবস্থাই ভারত করতে পারেনি। সে সময় কোন স্থিরতা ছিল না চীনাদের অগ্রগতির। সব সময়ই এগিয়ে আসছে বমডিলার দিকে। বমডিলার পরই তাদের লক্ষ্যস্থল নর্থলখিমপুর ও তেজপুর। সেই কারণে নেফার মানুষ কোন স্থানকে নিরাপদ মনে করছে না। তারা আরও সমতলের দিকে ছুটছে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের হাত ধরে।

অসহ্য সেই দৃশ্য।

আমি নেমে এলাম রঙ্গিয়াতে।

দু' রাতও কাটেনি।

সংবাদ পেলাম চীনারা বমডিলা দখল করেছে।

তেজপুরের ডেপুটি কমিশনার মিস্টার দাস জেলখানার দরজা খুলে কয়েদিদের মুক্ত আলোর নিচে যথেচ্ছ বিচরণ করার সুযোগ করে দিয়ে ট্রেজারির সব টাকা বাক্সবন্দী করে ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে নওগাঁতে পৌঁছেছে। বিশৃঙ্খলা চারিদিকে। নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যে যার মত ছুটছে। যারা পারছে তারা স্বজনকে সঙ্গে নিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পতি-পত্নী, মাতা-সন্তান, পিতা ও স্বজন আত্মরক্ষার তাগিদে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে।

ভারত বিভাগের সময় পানজাবের উত্তর অংশ থেকে এমনি ভাবে পালিয়ে এসেছে শিখ আর হিন্দুরা, আবার মুসলমানরাও পূর্ব পানজাব থেকে পালিয়ে গেছে পাকিস্তানে। অসংখ্য মৃতদেহ, সম্পদ লুট, নারীর অমর্যাদা, অগ্নিকাণ্ডের শিকার হয়েছে হাজার হাজার পরিবার। তখনও যেমন বিশৃঙ্খলা ছিল বাঁচার তাগিদে ঠিক সেই রকম বিশৃঙ্খলা দেখা গেল চীনের অগ্রগতিতে। একই দৃশ্য পরবর্তীকালে দেখেছি বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়।

গুজব আরও বেশি অস্থিরতা সৃষ্টি করেছিল সর্বত্র।

তাকিয়ে দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, রাজনীতি, ক্ষমতার লোভ, মিথ্যাচার সবার আগে হত্যা করেছে মনুষ্যত্ববোধ।

অসমের ট্রেন চলাচল বন্ধ।

ব্রহ্মপুত্রের ফেরি সার্ভিস বন্ধ।

সৈন্য ও সমর সম্ভার নিয়ে যে সব ট্রেন আসছে তারাই ফিরে যাচ্ছে আহত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে য়্যামবুলেন্স চেপে যাদের আনা হচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠছিলাম। সামরিক পুলিশ চারিদিক ঘিরে রেখেছে, কিছুতেই আহতদের কাছে সাধারণ মানুষকে যেতে দিচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল ওরা যেন অন্য জগতের মানুষ, আমাদের কেউ নয়।

মানুষ খোঁজার মনটা কেমন অবসাদগ্রস্ত হয়ে উঠল। তাকিয়ে দেখলাম আমার মত বহুজন বিশেষ দূরত্ব রক্ষা করে উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছিল, তাদের সবাইয়ের চোখে ভীতির ছাপ। অধিকাংশ নিরাপদ এলাকায় পালাবার চেষ্টায় ছিল তাই তাদের মানসিক অবস্থা বিশ্লেষণ করার সুযোগও ছিল না।

সাইডিং-এ সামরিক বাহিনীর ট্রেনগুলো দাঁড়িয়ে।

সেখানেই কিছুটা ব্যস্ততা।

অন্যত্র আগ্রহ থাকলেও সাধারণ মানুষ চুপি চুপি পদক্ষেপে অজানার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

আমিও আজ আশ্রয়হীন।

আমারও নিরাপদ আশ্রয় প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটাবার মত কোন স্বজন কোথাও নেই।

বমডিলা যাবার আগে অসম লিঙ্ক রোড ধরে বাসে করে এগিয়ে এসে ট্রেনের সোয়ারি হয়েছিলাম আলিপুরদুয়ার থেকে। রাস্তায় বাস থামিয়ে মিলিটারি কনভয় এগিয়ে চলছিল। জওয়ানদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে সহকর্মী এই দুরন্ত যাত্রাপথে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে। আজ তাদেরই বহুজনকে দেখলাম স্ট্রেচারে করে নিয়ে চলেছে মিলিটারি বেস হাসপাতালে।

নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় বাস্তুহীনদের পেছন পেছন পা বাড়ালাম। সারা রাত হাঁটতে হাঁটতে এসে পেঁছিলাম ব্রহ্মপুত্রের কিনারায়। খাবারের সন্ধানে বের হলাম কিন্তু আশেপাশের কোন দোকানপাট খোলা নেই, মানুষের ব্যস্ততা। ব্যস্ততা রয়েছে শুধু পলায়নরত নরনারীর।

আমিনগাঁও স্টেশনে কেটে গেল দিনটা।

পরের দিন গুজব শোনা গেল চীনা সৈন্যরা বমডিলা থেকেই ফিরে চলেছে চীনের মূল ভূখণ্ডের দিকে, তারা আর সমতলে এগিয়ে আসছে না। এক তরফা যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে তারা পেছনের পথ ধরে দ্রুতবেগে এগিয়ে চলছে নিজের দেশের দিকে।

ঘটনাটা সত্য। আকাশবাণীর ঘোষণায় সমতলের মানুষ নিশ্চিন্ত হলেও তখনও পাহাড়ে ছুটছাট গোলাবাজি চলছিল কিন্তু সে রাত পেরোতেই কিছুটা ব্যস্ততা দেখা দিল সর্বত্র।

ব্রহ্মপুত্রের বুকে ভাসমান স্টিমারগুলোর ভোঁ-ভোঁ শব্দ শোনা গেল।

অসামরিক ট্রাক ও ব্যক্তি মালিকাধীন দু চারটে গাড়ি দেখা গেল রাস্তায়।

নদী পারাপারের ফেরি স্টিমার সে দিন পাড়ি জমাবে শুনে ছুটে গেলাম স্টিমার ঘাটে। স্টিমার তখন ভোঁ দিয়ে যাত্রীদের শেষ আহ্বান জানাচ্ছিল। ছুটে গিয়ে স্টিমারে উঠতেই সিঁড়ি টেনে নিল জাহাজীরা। গত কয়েকদিন ভাল করে খেতে পাইনি। উদরের জ্বালা বিষম। স্টিমারে খেতে পাবার আশায় স্টিমারের চায়ের স্টলে গিয়ে বসলাম কিন্তু পেট ভরাবার মত খাদ্য তাদের ছিল না। শুকনো কয়েক টুকরো অখাদ্য বিস্কুট নিয়ে বসে বসে ভাবছিলাম কয়েক দিনের বিগত ঘটনা সমূহ। এরই সঙ্গে ফেলে আসা দিনের কথাও মনে উঁকি ঝুঁকি দিতে থাকে।

তখনও দেশ ভাগ হয়নি।

নেপাল থেকে সোজা পাড়ি দেবার প্রয়োজন ছিল শিলচরে। প্রয়োজন দেবদর্শন।

শুনেছিলাম শ্রীঅরবিন্দের সহকর্মী উল্লাসকর দত্ত থাকেন শিলচরে। তাকে চোখের দেখা আর শ্রদ্ধা জানানো ছিল উদ্দেশ্য।

রকসৌল থেকে মিটার গেজের পথে সমস্তিপুর এসে কয়েকদিন বিশ্রাম।

সেখান থেকে কাটিহার।

কাটিহার থেকে এক ট্রেনে আমিনগাঁও।

কলকাতা থেকে যে বড় লাইনের আসাম মেইল আসে তার সংযোগকারী এই গাড়ি পার্বতীপুর থেকে পূর্ববঙ্গ রেলের আসামের মেইল নিয়ে আমিনগাঁও যায়। এই ট্রেনের সোয়ারি আমি।

সে সময় ট্রেনে ছিল চারটি ক্লাশ। আমি ইন্টারক্লাশের যাত্রী। কাটিহারে একজন বাঙ্গালী যুবক উঠলেন গাড়িতে। রাস্তায় চলতে সহযাত্রীদের সঙ্গে পরিচয় হয় স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ করে দূরের যাত্রীদের বেশ একটা অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়। চলার পথে এরা হয় বড়ই আপন জন।

গাড়ি দিনাজপুর পৌঁছতেই যুবকটি চা-আলাকে ডাকল। নিজেও চা খেল, আমাকেও এক কাপ চা দিল। যখনই কোন বড় স্টেশনে গাড়ি দাঁড়ায় যুবকটি খাবারওলা ডাকে। খাবার কেনে আর আমাকে খেতে অনুরোধ করে। পার্বতীপুর এসে হোটেলে ফরমাস দিয়ে দুজনের খাবার আনিয়ে নেয়। যখনই পয়সা দিতে চেষ্টা করেছি তখনই আমাকে বাধা দিয়েছে।

এই ভাবে সকালবেলায় আমিনগাঁও পৌঁছে দুজনে অন্য যাত্রীদের পেছন পেছন ফেরি স্টিমারে উঠলাম। যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে ব্রেক ফাস্টের অর্ডার দিল।

খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোথায় যাবেন?

ডিব্রুগড়।

কে আছেন সেখানে?

সেখানে কেউ নেই। ডিব্রুগড় থেকে বাসে যেতে হবে কয়েক মাইল দূরের চা বাগানে।

কাল সন্ধ্যেবেলায় পৌঁছবেন সেখানে। গুয়াহাটি থেকে আবার আসামের গাড়ি ধরতে হবে। আমার কথা শুনেই যুবকের মুখ শুকিয়ে গেল।

কি ভাবছেন?

ভাবছি আজ সারা দিনরাত্রি গাড়িতে থাকতে হবে। খাওয়া দাওয়ার খরচ তো আছে। তারপর বাস ভাড়া। অনেকগুলো টাকার দরকার আমার কাছে আর তিন চারটে টাকা আছে, তাই ভাবছি শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে পারব কি না!

আমি মৃদুস্বরে বললাম, কত টাকার দরকার বলতে পারেন?

তা কম করেও দশ টাকা।

দশ টাকা!

হাঁ, রাস্তায় বেপরোয়া খরচ না করলে অসুবিধা হত না।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে দশ টাকার একখানা নোট তাকে দিয়ে বললাম, এতেই হবে আশা করি।

যুবকটি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, আপনার নাম ঠিকানাটা দিন। আমি গিয়েই আপনাকে মনিঅর্ডার করে টাকাটা পাঠিয়ে দেব।

বললাম, দিতে হবে না। আমার নাম ঠিকানা নিয়ে কোন লাভ নেই। নিজেও সব সময় এক জায়গায় থাকি না। কেন দিলাম, সেটা আপনাকে বলছি।

ঠিক এই স্টিমারে প্রায় দশ বছর আগে আমি পাণ্ডু পৌঁছে শিলং যাবার বাসে টিকিট করতে গিয়ে দেখলাম টিকিট কেনার পয়সা কম পড়েছে। তাও দুটো পয়সা মাত্র। সেদিন আমার যা মনের অবস্থা হয়েছিল আপনার অনেকটা সেই রকম মনের অবস্থা নিশ্চয়ই হয়েছে, অন্তত আমি তা অনুমান করছি।

সেদিন এক ভদ্রলোক আমাকে চার আনা পয়সা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। আমার স্ত্রী তখন ওয়েলশ মিশন হাসপাতালে যমের সঙ্গে লড়াই করছিলেন, আমি তাকে দেখতে ছুটে এসেছিলাম ধানবাদ থেকে। কতটা পথ তাতো বুঝছেন। রাস্তায় যেতে যেতে আমার পয়সা ফুরিয়ে গিয়েছিল। আমি জানতাম, বাস ভাড়া দু টাকা। সযত্নে দুটো টাকা রেখেছিলাম কিন্তু পাণ্ডুতে এসে আমার ভুল ভাঙ্গল। বাস ভাড়া দু টাকা চার আনা। রাস্তায় খাবার জন্য চোদ্দটা পয়সা রেখেছিলাম। তাতে ভাড়া সংকুলান হওয়াই কঠিন হয়ে উঠেছিল। দু পয়সার ধাক্কায় আমি একেবারে কুপোকাৎ। সেই চার আনা পয়সা ফেরত দিতে গিয়ে সেই সাহায্যকারী ভদ্রলোককে আর খুঁজে পাইনি। আজ আমার মনে হচ্ছে আপনিই হয়ত অন্য চেহারা নিয়ে আমাকে সাহায্য করেছিলেন, আজ সেই ঋণ শোধ দিলাম।

যুবকটি আর কোন কথা বলেনি।

পাণ্ডুতে দুজনে ট্রেনে চেপে গুয়াহাটি পৌঁছে যুবককে আপার আসামের গাড়িতে তুলে দিয়ে আমি শহরে গেলাম কোন হোটেলে স্নান খাওয়া করতে।

বমডিলা থেকে গুয়াহাটি যাবার ফেরিতে চড়ে পুরানো দিনের স্মৃতি আমাকে আচ্ছন্ন করলেও কোনরকমে একটা হোটেলে আশ্রয় নিলাম।

দেশরক্ষা, দেশের সংহতি, দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে হাসতে হাসতে যারা গিয়েছিল, এবার তাদের অশ্রুসজল মুখ দেখে ধিক্কার জন্মালো মনে। বিনা প্রস্তুতিতে push them out ফরমান দিয়ে বর্তমানের মোগল আজম জওহরলাল গেলেন কলম্বো। কিন্তু একবারও চিন্তা করেননি এর পরিণাম। ভারতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি আর পাপ পরিবেশন করেছিলেন স্বয়ং

জওহরলাল তার শাসন কার্যে অযোগ্যতার দরুণ তার ফসল উঠাতে হল ভারতকে।

গুয়াহাটি এসে শোনা গেল, হিমালয়ের বরফ আবৃত এলাকায় যুদ্ধের উপযোগী পোশাকও ছিল না ভারতীয় সেনাদের। ওদের পোশাকেও ছিল ভেজাল। সেই ভেজাল পোশাক পড়ে যুদ্ধ করতে যারা গিয়েছিল তাদের মৃত্যু ঘটেছিল বরফ চাপা পড়ে।

নানাভাবে প্রচার করা হয়েছিল ভারতের সামরিক শক্তির ও অস্ত্রশক্তির অথচ কার্যকালে দেখা গেল সবই ধাপ্পা। মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার এমন নজির ইতিহাসে বিরল। চীনা সৈন্য যদি স্বেচ্ছায় ফিরে না যেত তা হলে আরও কিছু গুরুতর ঘটনাও ঘটতে পারত।

স্মৃতির গুহায় বমডিলা মুখ লুকিয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু নতুনদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে চীন-ভারত যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতেই নতুনদি ক্ষোভে যেন ফেটে পড়লেন।

অতি মৃদুস্বরে বলল, আমাদের ভাগ্যকে ছেড়ে দিয়েছে এমন এক গোষ্ঠীর হাতে যারা নিজেদের স্বার্থ, সমৃদ্ধি ও ক্ষমতা ভিন্ন অন্য চিন্তা কখনও করেনি।

নতুনদি বললেন, আমরা কর্ণদ্বারা দর্শন করি। তাই কানে শোনা বিষয়কে চোখে দেখা মনে করি। তবে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার অভাব ঘটলে তা ধার করি সংবাদ পত্রের কাছে। এবং তার কতটা সত্য তা বিচার করার অবসর পাইনা। এই সময় সংবাদ যেমন সেনসর করা হত তেমনি জনসমক্ষে তুলে ধরা হত কাল্পনিক জয়ের ইতিহাস। সব চেয়ে দুঃখের হল, যুদ্ধের সময় আমরা সংহার করি সত্যকে। চীন-ভারত যুদ্ধের সময় এই ঘটনাই ঘটেছিল। কোন এক দলের মাননীয় নেতা তো বলেই বসলেন, কোথায় কোন পাহাড়ের মাথায় কয়েক কিলোমিটার দুর্গম তুষার আবৃত অঞ্চল নিয়ে ঝগড়া তাকে বেশি মূল্য দেবার কোন প্রয়োজন নেই। ম্যাকমেহন লাইন হল কল্পনা আর ইংরেজের সৃষ্টি। এ বিষয় আলাপ আলোচনায় মেটানো উচিত। কিন্তু আলাপ আলোচনার সুযোগ সৃষ্টির আগেই সীমান্তে কামান দাগতে থাকে প্রতিবেশি চীন। অর্থাৎ ওরা কোন আপোষ মীমাংসা চায় না।

কিন্তু লড়াইয়ের মরুদানে ভাঙ্গা তলোয়ার যে অকেজো তা প্রমাণ হল এই যুদ্ধে। আমাদের জওহরলাল নেহেরু দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ভাঙ্গা তলোয়ার নিয়ে সদম্ভে চিৎকার করেছিলেন, সুভাষ ভারতে প্রবেশ করলে আমিই প্রথম অস্ত্র নিয়ে বাধা দেব। জওহরলাল এই ঐতিহ্য বজায় রাখতেই বলে বসলেন, push them out.

বললাম, নতুনদি, অনাহারী মানুষের সামনে অধিক পরিমান ভোজ্যদ্রব্য এনে দিলে উদরাময়ের সম্ভাবনা থাকে। আমাদেরও এই অপ্রীতিকর ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমরা রুগ্ন, আমরা নীতিহীন তাই চীন সাহস করে

এগিয়ে এসেছিল।

নতুনদি বললেন, এসব অরাজনৈতিক রাজনীতিতে আমার আগ্রহ নেই। আমার বাবা গাঁজার দোকানে পিকেটিং করে নয় মাস বন্দী ছিলেন। তারপর তাকে সমাজে আর গ্রহণ করতে চায়নি। বলতে গেলে আমাদের গোটা পরিবার হয়েছিল বয়কটের শিকার। আজ এসব কথা মনে হলে গদীতে আসীন কারও প্রতি কোন শ্রদ্ধা থাকে না।

বললাম, গুয়াহাটির হোটেলটা অসহ্য মনে হল। অসমের এক শ্রেণীর লোক চীনা খেদাওয়ের চেয়ে বংগাল খেদাওতে বেশি আগ্রহী। আমাদের সংহতির কথা কেমন যেন গুলিয়ে গেল ওদের কথা শুনে।

নতুনদি বলল, ভারতের সর্বনাশ ডেকে আনবে জাতি দাঙ্গা, ভাষা দাঙ্গা আর ধর্ম দাঙ্গা, এ থেকে নিষ্কৃতি নেই। পথ থাকলেও তা অজানা রয়েছে, অজানা থেকেও যাবে চিরকাল।

নতুনদিদি কিছুক্ষণ দূরের কনানীর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দীর্ঘ-শ্বাস ফেললেন। আমি তার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললাম, থামলেন কেন নতুনদি।

অনেক বলার থাকলেও তা মোটেই রুচিকর হবে না।

নতুনদি বলেছিলেন, রাজনীতির কারবারীর কাছে নীতি ধর্ম হল অবান্তর বস্তু। এদের ভাল মন্দও আমাদের কাছে অবান্তর।

অথচ!

অথচ কি? তোমার কিছু সংযোজন আছে কি?

আছে। যারা লড়াইতে গিয়েছিল তাদের প্রতি কিছুটা অনুকম্পা থাকলেও যারা লড়াই করতে বাধ্য করে তাদের প্রতি অনুকম্পা থাকা উচিত নয়।

আমার সেদিনের এই উদাস বক্তব্য নতুনদির পছন্দ হয়নি কিন্তু যখন বললাম, ফিলিসের কথা তো আপনাকে বলেছি, সেই ফিলিস সম্বন্ধে আমার যে দুর্বলতা তাও বলেছি। কেন? সেটাই বলা হয়নি।

অনিচ্ছুক নতুনদি বললেন, শুনতে আগ্রহ নেই।

তবুও বলব।

নতুনদি হেসে বলল, কান বন্ধ করে তো থাকতে পারব না। শুনতেই হবে।

ফিলিস বিরাট কিছু নয় কিন্তু তার নারীত্ব যেমন সাবলীল তেমনি মাতৃত্ব তার মহিমাপূর্ণ। কোন সময়ই ফিলিস তার সন্তানকে অবহেলা করেনি, আর সে নিজেও সন্তান হিসাবে তার মায়ের ও বাবার সেবায় কুণ্ঠিত ছিল না, তেমনি আহমেদের সম্বন্ধে তার ঘৃণাও ছিল প্রখর। সে কোন মতেই নিজেকে ছোট করতে পারেনি, এটাই তাকে নারী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

নতুনদি বলল, এটা এমন কিছু বিরাট ঘটনা নয়। এরকম চরিত্র হামেশাই আমরা দেখতে পাই।

অবশ্যই। তবুও কিছু বিশেষত্ব থাকে। তার জন্যই আমি দুর্বলতা অনুভব করেছি।

দুর্বলতা নয় ভাই। ওটা সহানুভূতি যা মানুষের কাছে সবাই আশা করে। বর্মাডিলা থেকে ফিরতি পথের জওয়ানদের দেখে যে অনুভূতি তোমাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সে অনুভূতির জাত আলাদা। আবার ফিলিসের জীবনধারা যে মানসিকতা সৃষ্টি করেছিল তাও আলাদা জাতের। এই মানসিক অবস্থার প্রকৃত বিশ্লেষণ করা অতীব কঠিন।

চুপ করে গেলাম।

ট্রেন তখন দুরন্ত বেগে ছুটছে। আমার মনও দুরন্ত বেগে পেছনে হাঁটছে।

কি ভাবছ ভাই?

ভাবছি আমরা কোথায় আছি। ইংরেজ যখন এদেশ ছেড়ে চলে গেল তখন কয়েক হাজার আজাদ হিন্দ সরকারের বাহিনীর জওয়ানরা ফিরে পেয়েছিল তাদের দেশের মাটির গন্ধ কিন্তু তারা পায়নি এই মাটিতে পা রাখার জায়গা। স্বাধীনতা লাভের জন্য যারা প্রাণপণ করেছিল তারা দেশে ফিরে কোন অভ্যর্থনা পেল না স্বাধীন ভারতের প্রশাসকদের কাছ থেকে। জওহরলাল বললেন, ওরা ডেজার্টার। অর্থাৎ দলত্যাগী, ওদের বিশ্বাস নেই, ওদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে না। বাস্, সব সমস্যার সমাধান ঘটল আজাদ হিন্দ বাহিনীর বীর সৈনিকরা, নৌ বিদ্রোহের বীর সেনানীরা যথাযথ মর্যাদা পেল না, পেল না আশ্রয় ও আহার্য। কিন্তু যারা ভারতকে পরাধীন রাখতে ইংরেজের অকুণ্ঠ সেবা করেছিল তারা পেল সরকারী বদান্যতা। ভাবছি, বর্মাডিলায় যারা ফিরে এল পরাজয়ের গ্লানি মাথায় করে তারা কোথায় স্থান পাবে? জওহরলাল এর উত্তর দিয়ে যাননি। ব্যক্তিগত ভোগের চরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে নবযুগের মোগল বাদশাহ যারা ধাপ্পা দিয়েই দেশ শাসন করে গেল, রেখে গেল বংশানুক্রমিক কুশাসনের দৃষ্টান্ত।

মানুষ হবার চেয়ে অমানুষ হবার যন্ত্রটি হল খুবই শক্তিশালী। তাই মানুষ খোঁজার পথে প্রায়ই কেমন একটা হতাশা আমাকে চেপে ধরত কিন্তু যে কদিন নতুনদিকে পাশে পেয়েছি সে কদিন তিনিই আশার প্রলেপ দিয়েছেন আমার মনে। আবার চাঙ্গা হয়ে উঠি। আবার নতুন উদ্যমে আমার পরিবেশের মানুষদের আত্মার সন্ধান করি।

প্রতিদিন আমি নতুনদিদিকে নতুন ভাবে পেয়েছি। কখনও তার মাতৃভাব আমাকে আপ্লুত করেছে, কখনও ভগ্নীস্নেহ আমাকে আকুল করেছে, কখনও আমাকে পথের নির্দেশ দিয়েছে, কখনও আমাকে নীরব শাসনে সংযত করেছে।

নির্মলবাবু আর সব কিছু লক্ষ্য করে বলতেন, দাদা আপনি ভাগ্যবান। এরকম একটি দিদি পেলে বর্তে যেতাম।

জীবনটা হল দেখা আর পরীক্ষা করা। দেখার চোখটা সবার সমান নয় আর সেই দেখাকে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া আরও কঠিন কাজ।

নতুনদিকে বলেছিলাম, স্বাধীনতা যুদ্ধের বীর সৈনিক উল্লাসকর দত্তের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল একটা বিশাল প্রাসাদ যেন ভেঙে চুড়ে গুঁড়িয়ে গেছে, শুধু মাত্র তার স্মৃতিটুকু ওই জীর্ণ ভগ্নস্তূপে উঁকি দিচ্ছে।

প্রণাম করলাম।

কে তুমি? কোথা থেকে আসছ?—অতি ক্ষুদ্র কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন।

বললেন, তুমিও আমার পথের পথিক কিন্তু প্রস্তুত থেক চরম বিপর্যয়ের জন্য। তবে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি, সে স্বাধীনতার স্বাদ বড়ই তিক্ত হয়ে উঠবে বাবা।

হঠাৎ তাঁর চোখ ছলছল করে উঠল।

তাঁর দাড়ি বেয়ে চোখের জল টপ্ টপ্ করে পড়তে থাকে। এ রকম আবেগ আন্দামান ফেরত শ্রীঅরবিন্দের অনুগামীর কাছে আশা করিনি।

হঠাৎ উনি চোখ মুছে উদাস ভাবে বললেন, কর্ম কর। তার বেশি কিছু করার নেই।

অনেকক্ষণ সেই প্রবীন বিপ্লবীর দিকে তাকিয়ে মনে হল, এখনও আগুন নির্বাপিত হয়নি।

কোথায় যাবে?

যুসাই পাহাড়ে।

সাবধানে যেও। ইংরেজ ওদের মনে পাপ ঢুকিয়ে গেছে। সেই পাপের আগুন জ্বলছে কোথাও কোথাও। তবে তোমার তো নেবার কিছু নেই। দেবার মত রয়েছে প্রাণটা, তবে প্রাণ রক্ষা করলে অনেক কাজ করার সুযোগ পাবে।

বাইরে এসে সঙ্গীদের সঙ্গে কথা বলছিলাম।

ওরা বলছিল, উল্লাসকর দত্তের মাথায় গোলমাল হয়েছে।

হয়ত তাই। যে আশা আকাঙ্খা নিয়ে উনি অগ্নিযুগের সেবা করেছেন সে আশা নির্মূল হয়েছে। হতাশা ওর সত্তাকে গ্রাস করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

শিলচর থেকে ছোট্ট জিপে চেপে যুসাই পাহাড়ে যার বর্তমান নাম মিজোরাম যাচ্ছিলাম।

নতুনদি বললেন, সেখানে নতুন কিছু দেখেছ কি?

মিজোদের আমি ভালবেসেছি নতুনদি। যেখানে যাবেন সেখানেই দেখবেন একজন মিজো যুবকের সঙ্গী একটি মিজো যুবতী, তাদের হাতে বেহালা অথবা গিটার। মিজোরা সঙ্গীত ভালবাসে, আর মিজো যুবকদের কথা ভাবতে গেলে মিজো যুবতীকে বাদ দেওয়া যায় না। উভয়ে একাত্ম হয়ে চলাফেরা করে।

আইজল শহর ছোট।

দেশের রাজধানী কিন্তু বড়ই বিমর্ষ।

প্রচার চলছিল, স্বাধীন মিজো রাজ্যের। তাই কেমন চুপচাপ ভাব,

কেমন ফিস্‌ফিসানি। মন খুলে কথা বলতে চায় না কেউ-ই।

কিন্তু নতুনদি ওরা বড়ই ভাল। ওরা যেমন সুন্দর ও সবল তেমনি ওদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও শিল্পীমন। বড়ই সরল ও সহজ। যারা বিভ্রান্ত তারা মনে করে প্রশাসন ওদের প্রতি অবিচার করেছে।

স্বাধীনতা তাদেরই শ্রেয় যারা পরাধীন কিন্তু ওরা তো পরাধীন নয়। তবে ওরা চায় না ভারতের মূল স্রোতে মিশে যেতে কারণ ওদের সেই ভাবেই শিক্ষা দিয়েছে বিদেশী মিশনারীরা।

রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে নরনারীর অবাধ বিচরণ দেখছিলাম।

যার আশ্রয়ে যাব মনে করে এসেছি তাকে খুঁজে পেতে বিলম্ব ঘটে গেল।

যখন তাকে পেলাম তখন সে সবে মাত্র কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরে এসেছে।

অবশেষে আপনি এলেন। খুবই আনন্দিত হয়েছি। তবে সময়টা খুবই খারাপ। মিজো বিদ্রোহীরা ফতোয়া দিয়েছে, অমিজোকে সাতদিনের মধ্যে এই রাজ্য ছেড়ে যেতে হবে। তাই কিছু আশঙ্কা আছে। চলুন আমার ডেরায়।

কত দূর?

সামান্য ডাউনে। চলুন।

সদর রাস্তা ছেড়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে কলিন্‌সের ডেরায় পৌঁছলাম। দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে দাঁড়াল একজন মিজো মহিলা।

ইনি আমার স্ত্রী লিসিয়া।

কিন্তু! তুমি তো খাস কলকাত্তাইয়া বাঙ্গালী।

আমার স্ত্রী খাস মিজোরামের মিজো। লিসিয়া ইনি আমার বন্ধু ও অতিথি। তোমাদের দেশে এসেছে তোমাদের হাল হকিকত জানতে। থাকবেন কয়েকদিন।

আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হয়নি।

লিসিয়ার মুখেই শুনেছিলাম ওদের অনেক কথা।

মিজো পাহাড়ের কৃষি দ্রব্যের মধ্যে আদা বিশেষ স্থান নিয়ে থাকে। আদা এই রাজ্যের মানি ক্রপ্‌। আদার শত্রু হল ইঁদুর। পাহাড়ের কন্দরে কন্দরে ইঁদুরের উৎপাত। ইঁদুরের উৎপাতে অস্থির এ রাজ্যের মানুষ। আদা, জোনার, ধান কিছুই ইঁদুরের হাত থেকে রেহাই পায় না। কয়েক বছর দেখা দিল খাদ্যাভাব। সরকার ত্রাণকার্যে এগিয়ে এল। এই ত্রাণকার্যের অধিকর্তা ছিলেন লালডেঙ্গা। ত্রাণকার্য তার চোখ খুলে দিল। লালডেঙ্গা ভারত সরকারের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, উপরন্তু প্রশাসনের শীর্ষে বসেছিল বিশেষ করে অমিজো অফিসাররা, তাদের বিরাট অংশই হল অসমীয়া এবং উত্তর ভারতের অধিবাসী।

লালডেঙ্গা এ সুযোগটা ব্যবহার করে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল গোটা মিজোরামকে। জাতি পাতির সমস্যা তৎসহ প্রশাসনের অবিচার মূলধন করে

সাধারণ মিজোদের ক্ষিপ্ত করতে বিলম্ব করল না।

আরম্ভ হল রক্তপাত।

এরই পরিণতি আজ আমরা দেখছি।

মিজোরামের শেষ গ্রাম চম্পা। চম্পার পাশের গ্রামই বর্মার অংশ। অর্থাৎ অবাধে বর্মার সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে অসুবিধা নেই। এই পথে অস্ত্র আমদানী চলছে। বেশির ভাগটা আসছে বাংলাদেশের কোন কোন অংশ থেকে। মিজো অশান্ত করতে বিদেশীর প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে।

মোটামুটি সব শুনে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের পরিচয় কি করে হল?

লিসিয়া হেসে বলল, এক জায়গায় দুজনেই কাজ করি।

লোকমুখে শুনলাম, অমিজোদের এ রাজ্য ছাড়তেই হবে।

কলিনসকে ছাড়তে হবে না। ও যে মিজো মেয়ের স্বামী।

লিসিয়ার কথায় হেসে উঠলেও প্রত্যয়টা বড় গভীরে অবস্থিত।

লক্ষ্য করলাম, লিসিয়া নিজের প্রতি যতটা আগ্রহী তার চেয়ে শতগুণ আগ্রহী তার স্বামী কলিনসের প্রতি। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, লিসিয়া কলিনসের পায়ে জুতো পড়িয়ে দিচ্ছিল অফিস যাবার আগে।

রবিবারে চার্চে যাবার সময় কলিনসকে মনোমত সাজিয়ে তার হাত ধরে রওনা হত। তবে সব সময়ই লিসিয়ার প্রাধান্য লক্ষ্য করতাম।

গৃহস্থালী কোন কাজই করতে দিত না কলিনসকে। বাজার করা, রান্না করা, ঘর গোছানো সব কিছু করে দুজনে হাত ধরাধরি করে অফিস রওনা হত। বিকেলে ফিরে এসে আর রান্নার ঘরে লিসিয়া যেত না। গীটার নিয়ে বসত আর গান গাইত। বলা বাহুল্য গান ও বাক্যালাপ সবই চলত ইংরেজি ভাষায়। ইংরেজি যেন ওদের মাতৃভাষা উচ্চারণে কোন জড়তা ছিল না।

লিসিয়া আর কলিনসের কাহিনী শুনে নতুনদি বলত, তুমি ধরায় স্বর্গের সন্ধান পেয়েছিলে ভাই। তোমার মানুষের সন্ধান এখানেই তো সাফল্য লাভ করেছে। মানুষ চিরকাল মানুষ। দেশ, ভাষা, ধর্ম এ সবের বাধা কাটিয়ে তুমি মানুষ খুঁজে পেয়েছ। লিসিয়া আদর্শ প্রেমিক, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ ঘরনী আবার অতিথি সেবিকা। এত পেয়ে ও দেখেও তুমি তৃপ্ত হওনি।

হেসে বললাম, যদি আপনার সান্নিধ্য না পেতাম তা হলে দৃশ্য বস্তুগুলি শুধু লুকিয়ে থাকত আমার স্মৃতিপটে। তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার মনটা পেতাম না।

মানুষ তো মরে না ভাই। মানুষ চিরকাল ছিল ও থাকবে অন্তত যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন এর ব্যতিক্রম হবে না।

মানুষ খুঁজেছি। পেয়েছি কিনা তা আজও নিশ্চিত করে বলতে পারছি না তবে মানুষ যে চিরকাল থাকবে তার ভালমন্দ নিয়ে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মানবাত্মার সন্ধানে নানা দেশ-বিদেশে নানাভাবে মানুষকে পরখ করেছি তাতে মানুষের প্রতি জন্মেছে শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস। এটুকু হারালে আমার এই ক্ষণিকের জীবন পরিক্রমা ব্যর্থ হত বলেই মনে করি। লিসিয়া ভালবেসেছে কলিনসকে, তাদের সমাজের নানা ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ভালবাসাকে অমর করে রেখেছে। ফিলিস তেজদীপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, আবার নওসেরের বাল্যস্মৃতি আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভারত আমার মহাভারতের বাণী সব সময় আমার কানে কানে শুনিয়েছে। তারই বাণী আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে মানবাত্মার বিশালত্ব উপলব্ধি করতে।

চলছি চলার শেষ নেই।

ভালবাসার কাঙ্গাল মানুষগুলোর দিকে ঝাপসা চোখ মেলে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছি। অন্তরাত্মার বিকাশ ঘটাবার সুযোগ না পেয়ে কত মানুষ লয় পেয়ে গেছে সবার অজ্ঞাতে, অনাদরে, অবহেলায় তবুও তারা ছিল মানুষ, তাদের উত্তরপুরুষও রইবে মানুষ। এই মানুষকে বাদ দিয়ে এই জগৎ সংসার মিথ্যা হয়ে যাবে। ভালবাসা, বিশ্বাস দিয়ে বিকাশ ঘটাতে হবে সবার আত্মার। আত্মউপলব্ধিই অপরের আত্মার সন্ধান দিতে পারে। মানসিক দৈন্য জয় করতে পারলে পরিবেশেই পাওয়া যাবে মানবাত্মার পরিচয়।

নতুনদি যাবার আগে বার বার বলেছিলেন, মানুষ খুঁজতে দূরে যেতে হবে না ভাই। যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী হও তা হলে পাশের মানুষের মাঝেই ঈশ্বরকে পাবে। আর যদি বাস্তবকে আঁকড়ে ধরতে চাও তাহলে মানুষ পাবে তোমার পাশেই।

ঝুপড়িতে, ফুটপাতে, প্রাসাদে, গ্রামে, শহরে যে যেখানেই বাস করুক তাদের পরিচয় একটাই। অবয়বে মানুষ, অভ্যন্তরে তাদের আসল পরিচয়। কেউ মনুষ্যত্ব বিকাশকারী মহান। অভ্যন্তরের কথা জানা যায় না। সেখানে প্রবেশদ্বার থাকে ইন্দ্রিয়ের প্রহরায়, অর্গলবদ্ধ। দ্বার উন্মুক্ত করার দায়িত্ব যাদের তারা ঐহিক সুখ, লাভ-লোকসান ও ভোগের জন্য অপরকে প্রতারণা করে। এই প্রতারকরা ইহজন্মের পাপের গ্লানি থেকে মুক্তি পেতে যুক্তিহীন পরজন্মের চিন্তা করে। ভুলে যায় ইহজন্মের কর্মাদি মিথ্যাচার ও ভণ্ডামি প্রসূত। এরা অসদাচারী মূর্খ।

নতুনদির কাছেই অনেক জেনেছি।

যেদিন নতুনদিকে সপরিবারে ট্রেনে তুলে দিলাম সেদিন জেনেছি মানুষ খোঁজার কঠিন পরিক্রমার চেয়ে মানুষকে ভালবাসা ও বিশ্বাস করাই হল মানুষ খোঁজার শ্রেষ্ঠ পন্থা।

ট্রেন চলে গেল ধীরে ধীরে।

দৃষ্টির বাইরে চলে গেল ট্রেন কিন্তু মনের বাইরে গেল না পথপরিক্রমার

স্মৃতি।

কোনটা আত্মা!

চিন্তা করছিলাম, অদূরে প্ল্যাটফরমের এক প্রান্তে কোন যাত্রীর উচ্ছিষ্ট ফেলে গেছে শালপাতার। দুটো কুকুর সেই খাবার দখল নিতে কলহ করছে, এমন সময় একটি ছিন্নবাসধারী কিশোর কোথা থেকে একটা লাঠি হাতে করে ছুটে এসে কুকুরের কাছ থেকে শালপাতার দখল নিল।

নতুনদি আচ্ছাদন যে আত্মার সন্ধান দিয়েছিল সেটা অনুধাবন করলে আমার পরিক্রমা হয়ত সফল হবে।

কিন্তু কোন আত্মা!

কার আত্মা?

সব কিছু স্থির করার আগেই আমার ভবঘুরে জীবনের আরেকটি অধ্যায় হাতছানি দিতে থাকে।

———